

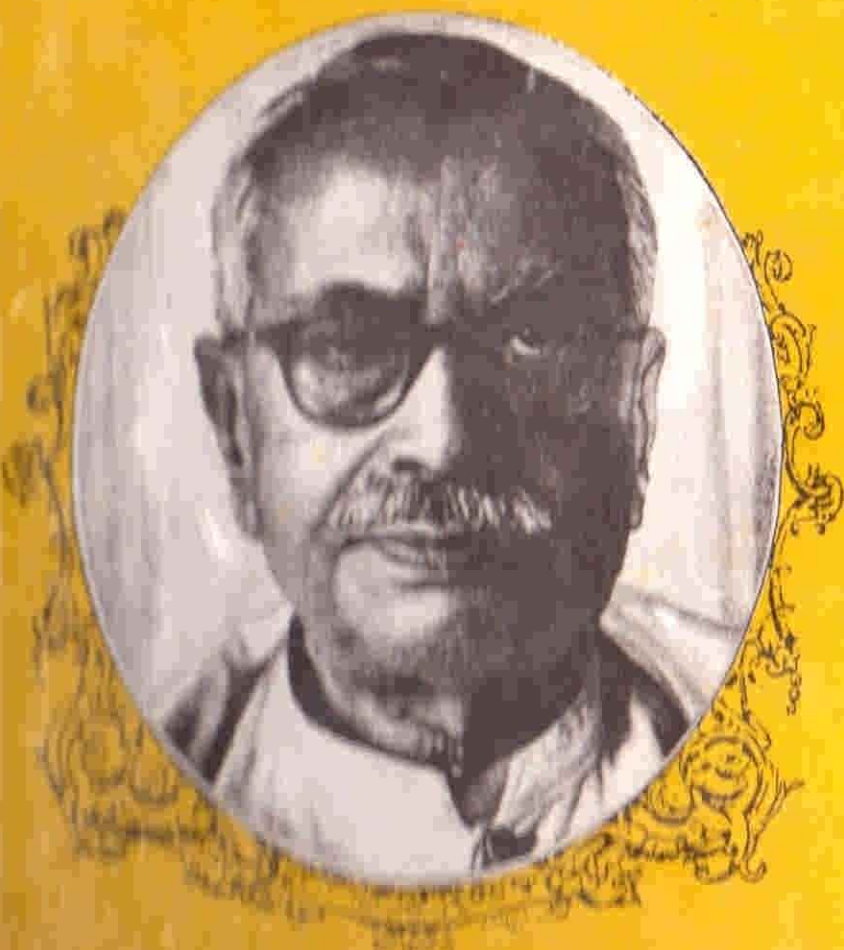
# পারশুরাম গল্পসমগ্র

স্বীকৃত পুস্তক

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স  
প্রাইভেট লিমিটেড

## পারশুরাম গল্পসমগ্র

প্রথম খণ্ড



স্বীকৃত পুস্তক



পিতৃদত্ত নামের উপর তর্ক চলে না কিন্তু স্বকৃত নামের যোগ্যতা  
বিচার করিবার অধিকার সমালোচকের আছে ।

পরন্তু অশ্রুটি রূপধ্বংসকারীর, তাহা রূপসৃষ্টিকারীর নহে ।

পরশুরাম নামটা শুনিয়া পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে যে  
লেখক বুঝি জখম করিবার কাজে প্রবৃত্ত ।

কথাটা একেবারেই সত্য নহে । বইখানি চরিত্র চিত্রশালা ।

মূর্ত্তিকারের ঘরে ঢুকিলে পাথর ভাঙার আওয়াজ শুনিয়া

যদি মনে করি ভাঙা চোরাই তাঁর কাজ

তবে সে ধারণাটা ছেলেমানুষের মত হয়,—

ঠিকভাবে দেখিলে বুঝা যায় গড়িয়া তোলাই তাহার ব্যবসা ।

মানুষের সুবুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধিকে

লেখক তাঁহার রচনায় আঘাত করিয়াছেন কিনা

সেটা তো তেমন করিয়া আমার নজরে পড়ে নাই ।

আমি দেখিলাম তিনি মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন ।

এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি ।

এমন কি, তাঁর ভূষণের মাঠের ভূতপ্রেতগুলোর ঠিকানা

যেন আমার বরাবরকার জানা ; এমন কি, যে পাঁঠাটা

কলকটওয়ালার ঢাকের চামড়া ও তাহার দশটাকার নোটগুলো

চিবাইয়া খাইয়াছে সেটাকে আমারই বাগানের বসুরাই গোলাপ গাছ

কাঁটাসুদ্ধ খাইতে দেখিয়াছি বলিয়া স্পষ্ট মনে পড়িতেছে ।

লেখক বোধকরি আধুনিক রুদ্র তেজের দিনে নিজেকে

বীরপুরুষের দলে চালাইয়া দিবার লোভ সামলাইতে পারেন নাই

কিন্তু আমরা তাঁহাকে রসশ্রষ্টার দলেই দাবী করি ।

ইহাতে বর্ত্তমানে যদি তাঁহার কিছু লোকমান হয়

শুদীর্ঘ ভাবীকালে তাহা পূর্ণ হইয়াও উদ্ভূত থাকিবে ।

শ্রী বীণেশ্বর চন্দ্র

This Book is downloaded  
From

<http://boirboi.blogspot.com>

# গজলিকা

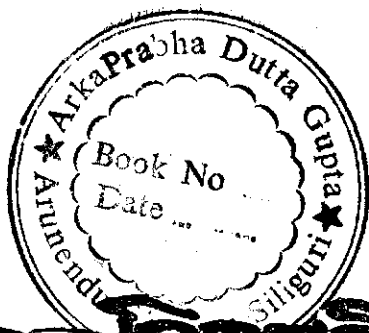
Scanned By Arka-The JOKER











# সিদ্ধেশ্বরী লাইব্রেরী



মাঘ মাস ১০২৬ সাল। এই

মাস আরমানী গির্জার ঘড়িতে

বেলা এগারটা বাজিয়াছে। শ্যাম-

বাবু চামড়ার ব্যাগ হাতে ঝুলাইয়া

জুড়াস লেনের একটি তেতলা বাড়িতে

প্রবেশ করিলেন। বাড়িটি বহু পুরাতন,

ক্রমাগত চুন ও রঙের প্রলেপে লোলচর্ম কর্ণাপত-

কেশ বৃক্ষের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। নীচের তলায় অশ্বকারময় মালের গদাম। উপরতলায় সম্মুখভাগে অনেকগুলি বাবসায়ীর আপিস, পশ্চাতে বিভিন্ন জাতীয় কয়েকটি পরিবার পৃথক পৃথক অংশে বাস করেন। প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখেই তেতলা পর্বত বিস্তৃত কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশের দেওয়াল আগাগোড়া ডাম্বুলরাগচাঁত—যদিও নিষেধের নোটিশ লিপিত আছে। কতিপয় নেংটে ইন্দুর ও আরসোলা পরস্পর অহিংসভাবে স্বচ্ছন্দে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। ইহারা আশ্রমমূগের ন্যায় নিঃশব্দ, সিঁড়ির যাত্রীগণকে গ্রাহ্য করে না। অন্তরাল-বর্তী সিম্ধী-পরিবারের রামাঘর হইতে নিগতি হিঙের তীর গন্ধের সহিত নরদমার গন্ধ মিলিত হইয়া সমস্ত স্থান আমোদিত করিয়াছে। আপিস-সমূহের মালিকগণ তুচ্ছ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া কেনা-বেচা তেজ-মন্দি আদায়-উসুল ইত্যাদি মহৎ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দিন যাপন করিতেছেন।

শ্যামবাবু তেতলার উঠিয়া একটি ঘরের তালা খুলিলেন। ঘরের দরজার পাশে কাষ্ঠকলকে লেখা আছে—ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল, জেনারল মার্চেন্টস। এই কারবারের স্বাধিকারী স্বয়ং শ্যামবাবু (শ্যামলাল গাঙ্গুলী) এবং তাহার শ্যালক বিপিন চৌধুরী, বি. এস-সি। ঘরে কয়েকটি পুরাতন টেবিল, চেয়ার, আলমারি, প্রভৃতি আপিস-সরঞ্জাম। টেবিলের উপর নানাপ্রকার খাতা, বিতরণের জন্য ছাপানো বিজ্ঞাপনের স্তূপ, একটি পুরাতন থ্যাকার্স ডিরেক্টরি, একখণ্ড ইন্ডিয়ান কম্পানিজ অ্যাক্ট, কয়েকটি বিভিন্ন কম্পানির নিয়মাবলী বা articles, এবং অন্যবিধ কাগজপত্র। দেওয়ালে সংলগ্ন তাকের উপর কতকগুলি খুলিধূসর কাগজমোড়া শিশি এবং শূন্যগভ মাদুলি। এককালে শ্যামবাবু পেটেন্ট ও স্বন্দাদ্য ঔষধের কারবার করিতেন, এগুলি তাহারই নিদর্শন।

শ্যামবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গাঢ় শ্যামবর্ণ, কাঁচা-পাকা দাড়ি, আকর্ষ্টান্বিত কেশ, স্থূল লোমশ বপু। অল্পবয়স হইতেই তাহার স্বাধীন ব্যবসায়ের ঝোঁক, কিন্তু এ পর্যন্ত নানাপ্রকার কারবার করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। ই. বি. রেলওয়ে অডিট আপিসের চাকরিই তাহার জীবিকা-নির্বাহের প্রধান উপায়। দেশে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি এবং একটি জীর্ণ কালীমন্দির আছে, কিন্তু তাহার আয় সামান্য। চাকরির অবকাশে ব্যবসায়ের চেষ্টা করেন—এ বিষয়ে শ্যালক বিপিনই তাহার প্রধান সহায়। সন্তানাদি নাই, কলিকাতার বাসায় পত্নী এবং শ্যালক সহ বাস করেন। ব্যবসায়ের কিছু উন্নতি হইলেই চাকরি ছাড়িয়া দিবেন, এইরূপ সংকল্প আছে। সম্প্রতি ছয় মাসের ছুটি লইয়া নতুন উদ্যমে ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল নামে আপিস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্যামবাবু ধর্মভীরু লোক, পঞ্জিকা দোঁধিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এবং অবসর-মত তান্ত্রিক সাধনা করিয়া থাকেন। বৃথা-অর্থিং ক্ষুধা না থাকিলে—মাংসভোজন, এবং অকারণে কারণ পান করেন না। কোন সন্ধ্যাসী সোনা করিতে পারে, বাহার নিকট দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ বা একমুখী বুদ্ধাঙ্ক আছে, কে পারদ ভস্ম করিতে জানে, এই সকল সম্বন্ধে প্রায়ই লইয়া থাকেন। কয়েক মাস হইতে বাটীতে গৈরিক বাস পরিধান করিতেছেন এবং কতকগুলি অনুরক্ত শিষ্যও সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্যামবাবু আজকাল মধ্যে মধ্যে নিজেকে 'শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী' আখ্যা দিয়া থাকেন, এবং আঁচরে এই নামে সর্বত্র পরিচিত হইবেন এরূপ আশা করেন।

শ্যামবাবু তাহার আপিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া একটি সার্থ-ত্রিপাদ ইজিচেয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ডাকিলেন—'বাঙ্কা, ওরে বাঙ্কা।' বাঙ্কা শ্যামবাবুর আপিসের বেয়ারা—এতক্ষণ পাশের গলিতে টুলে বসিয়া ঢুলিভেঁছিল—প্রভুর ডাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল। শ্যামবাবু বলিলেন—'গঙ্গাজলের বোতলটা আন, আর খাতাপত্রগুলো একটু বেড়ে-মুছে রাখ, যা ধুলো হয়েছে।' বাঙ্কা একটা তামার কুপি আনিয়া দিল। শ্যামবাবু তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক লইয়া মস্তোচ্চারণপূর্বক গৃহমধ্যে ছিটাইয়া দিলেন। তার পর টেবিলের দেওয়াল হইতে একটি সিন্দুর-চর্চিত রবার স্ট্যাম্পের সাহায্যে ১০৮ বার দুর্গানাম লিখিলেন। স্ট্যাম্পে ১২ লাইন 'শ্রীশ্রীদুর্গা' খোদিত আছে, সুতরাং ৯ বার ছাপিলেই কার্ষোন্মাদ হয়। এই শ্রমহারক যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা প্রীতান বিপিন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন—'দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ' এবং পেটেন্ট লইবার চেষ্টায় আছেন।

উক্তপ্রকার নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া শ্যামবাবু প্রসন্নচিত্তে ব্যাগ হইতে ছাপাখানার একটি ভিজা প্রুফ বাহির করিয়া লইয়া সংশোধন করিত লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জুতার মশমশ শব্দ করিতে করিতে অটলবাবু ঘরে আসিয়া বলিলেন—'এই যে শ্যাম-দা, অনেকক্ষণ এসেছেন



বুঝি? বড় দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না—হাইকোর্টে একটা মোশন ছিল। ব্রাদার-ইন-ল কোথায়?’

শ্যামবাবু। বিপিন গেছে বাগবাজারে তিনকাড়ি বাড়ুজ্যের কাছে। আজ পাকা কথা নিয়ে আসবে। এই এল বলে।

অটলবাবু চাপকান-চোগা-খারী সদ্যোজাত আর্টিন, পিতার আপিসে সম্প্রতি জুনিয়ার পার্টনার-রূপে যোগ দিয়েছেন। গৌরবর্ণ, সুন্দর, বিপিনের বাল্যবন্ধু। বয়সে নবীন হইলেও চাতুর্বে পরিপক্ব। জিজ্ঞাসা করিলেন—‘বুড়ো রাজী হ’ল? আচ্ছা, ওকে ধরলেন কি ক’রে?’

শ্যাম। আরে তিনকাড়িবাবু, হলেন গে শরতের ঋতুশব্দর। বিপিনের মাস্তুতো ভাই শরৎ। ঐ শরতের সঙ্গে গিয়ে তিনকাড়িবাবুকে ধরি। সহজে কী রাজী হয়? বুড়ো যেমন কল্পস তেমন সিদ্ধান্ত। বলে—আমি হলুম রায়সাহেব, রিটার্ড ডেপুটি, গভরনমেন্টর কাছে রুত মান। কোম্পানির ডিরেক্টর হয়ে কি শেষে পেনশন খোয়াব? তখন নিজের দিয়ে বোঝালুম—কত রিটার্ড বড় বড় অফিসার তো ডিরেক্টর করছেন, আপনার কিসের ভয়? শেষে যখন শুনলে যে, প্রতি মিটিং ৩২ টাকা ফী পাবে, তখন একটু ভিজল।

অটল। কত টাকার শেয়ার নেবে।

শ্যাম। তাতে বড় হাশিয়ায়। বলে—তোমার স্বাক্ষরকারী কোম্পানি যে লুট করবে না, তার জামিন কে? তোমরা শালা-ভুপ্তিপতি মিলে ম্যানোজিং এজেন্ট হয়ে কোম্পানিকে ফেল করলে আমার টাকা কোথায় থাকবে? বললুম—মশায় আপনার মত বিচক্ষণ সাবধানী ডিরেক্টর থাকতে কার সাধ্য লুট করে। খরচপত্র তো আপনার চোখের সামনেই হবে। ফেল হ’তে দেবেন কেন? মন্দটা যেমন ভাবছেন, ভালর দিকটাও দেখুন। কি রকম লাভের ব্যবসা! খুব কম করেও যদি ৫০ পারসেন্ট ডিভিডেন্ড পান তবে দু-বছরের মধ্যেই তো আপনার ঘরের টাকা ঘরে ফিরে এল। শেষে অনেক তর্কাতর্কির পর বললে—আচ্ছা, আমি শেয়ার নেব, কিন্তু বেশী নয়, ডিরেক্টর হ’তে হ’লে যে টাকা দেওয়া দরকার তার বেশী নেব না। আজ মত স্থির ক’রে জানাবেন, তাই বিপিনকে পাঠিয়েছি।

অটল। অমন খুঁতখুঁতে লোক নিয়ে ভাল করলেন না শ্যাম-দা। আচ্ছা মহারাজারে ধরলেন না কেন?

শ্যাম। মহারাজারে ধরতে বড়-শিকারী চাই, তোমার আমার কর্ম নয়। তা ছাড়া পাঁচ ভুতে তাঁকে শুষে নিয়েছে, কিছু আর পদার্থ রাখে নি।

অটল। খোটাটি ঠিক আছে তো? আসবে কখন?

শ্যাম। সে ঠিক আছে, এই রকম দাঁও মারতেই তো সে চায়। এতক্ষণ তার আসা উচিত ছিল। প্রসপেক্টসটা তোমাদের শুনিয়ে আজই ছাপাতে দিতে চাই। তিনকাড়িবাবুকে আসতে বলেছিলাম, বাতে ভুগছেন, আসতে পারবেন না জানিয়েছেন।

‘রাম রাম বাবুসাহেব’

আগন্তুক মহাবরক, শ্যামবর্ণ, পরিধানে সাদা ধূতি, লম্বা কাল বনাতের কোট, পায়ে শার্ল-করা জুতা, মাথায় হলদে রঙের ভাঁজ-করা মলমলের পাগড়ি, হাতে অনেকগুলি আংটি, কানে পাম্বার মাকড়ি, কপালে ফোঁটা।

শ্যামবাবু বলিলেন—‘আসুন, আসুন—ওরে বাছা, আর একটা চেয়ার দে। এই ইনি

হচ্ছেন অটলবাবু, আমাদের সলিসিটর দত্ত কোম্পানির পার্টনার। আর ইনি হলেন আমার বিশেষ বন্ধু—বাবু গণ্ডেরিরাণ্ডা বাটপারিয়া।’

গণ্ডেরি। নোমেন্স্কার, আপনার নাম শুনা আছে, জান-পহচান হয়ে বড় খুশ হ’ল।

অটল। নমস্কার, এই আপনার জন্যই আমরা ব’সে আছি। আপনার মত লোক যখন আমাদের সহায়, তখন কোম্পানির আর ভাবনা কি?

গণ্ডেরি। হেঁ হেঁ, সোকোলি ভগবানের হিষ্কা। হামি একেলা কি করতে পারি? কুছ না।



রাম রাম বাবুসাহেব

শ্যাম। ঠিক, ঠিক। যা করেন মা তারা দীনতারিণী। দেখ অটল, গণ্ডেরিবাবু যে কেবল পাকা ব্যবসাদার তা মনে করো না। ইংরেজী ভাষা না জানলেও ইনি বেশ শিক্ষিত লোক, আর শাস্ত্রও বেশ দখল আছে।

অটল। যাঃ, আপনার মত লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় বড় সুখী হলাম। আচ্ছা মশায়, আপনি এমন সুন্দর বাংলা বলতে শিখলেন কি করে?

গণ্ডেরি। বহুত বাঙালীর সঙ্গে হামি মিলা মিশা করি। বাংলা কিতাব ভি অন্হেক পঢ়েছি। বাংকমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, আউর ভি সব।

## শ্রীশ্রীসিন্ধেশ্বরী লিমিটেড

এমন সময় বিপিনবাবু আসিয়া পৌঁছিছিলেন। ইনি একটু সাহেবী মেজাজের লোক, এককালে বিলাত যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিধানে সাদা প্যাণ্ট, কাল কোট, লাল নেকটাই, হাতে সবুজ ফেস্ট হ্যাট। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ক্ষীণকায়, গোঁফের দুই প্রান্ত কামানো। শ্যামবাবু উদ্গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কি হ’ল?’

বিপিন। ডিরেক্টর হবেন বলেছেন, কিন্তু মাত্র দু-হাজার টাকার শেয়ার নেনবেন। তোমাকে অটলকে আমাকে পরশু সকালে ভাত খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। এই নাও চিঠি।

অটল। তিনকাড়িবাবু হঠাৎ এত সদয় যে?

শ্যাম। বুঝলুম না। বোধ হয় ফেলো ডিরেক্টরদের একবার বাজিয়ে যাচাই করে নিতে চান।

অটল। যাক, এবার কাজ আরম্ভ করুন। আমি মেমোরান্ডম আর আর্টিকুলসের মুসাবিদা এনেছি। শ্যাম-দা, প্রসপেক্টসটা কি রকম লিখলেন পড়ুন।

শ্যাম। হাঁ, সকলে মন দিয়ে শোন। কিছু বদলাতে হয় তো এই বেলা। দুর্গা—দুর্গা—

### জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ

১৯১৩ সালের ৭ আইন অনুসারে রেজিস্ট্রিত

### শ্রীশ্রীসিন্ধেশ্বরী লিমিটেড

মূলধন—দশ লক্ষ টাকা, ১০, হিসাবে ১০০,০০০ অংশে বিভক্ত। আবেদনের সঙ্গে অংশ-পিছদ ২, প্রদেয়। বাকী টাকা চার কিস্তিতে তিন মাসের নোটিসে প্রয়োজন-মত দিতে চাইবে।

### অনুষ্ঠানপত্র

ধর্মই হিন্দুগণের প্রাণস্বরূপ। ধর্মকে বাদ দিয়া এ জাতির কোনও কর্ম সম্পন্ন হয় না। অনেকে বলেন—ধর্মের ফল পরলোকে লভ্য। ইহা আংশিক সত্য মাত্র। বস্তুত ধর্মবৃত্তির উপযুক্ত প্রয়োগে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ উপকার হইতে পারে। এতদর্থে সদা সদা চতুর্বর্গ লাভের উপায়স্বরূপ এই বিরাট ব্যাপারে দেশবাসীকে আহ্বান করা হইতেছে।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত দেবমন্দিরগুলির কিরূপ বিপুল আয় তাহা সাধারণে জ্ঞাত নহেন। রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশের একটি দেবমন্দিরের দৈনিক যাত্রিসংখ্যা গড়ে ১৫ হাজার। যদি লোক-পিছদ চার আনা মাত্র আয় ধরা যায়, তাহা হইলে বাৎসরিক আয় প্রায় সাড়ে তের লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। খরচ যতই হউক যথেষ্ট টাকা উদ্ভূত থাকে। কিন্তু সাধারণে এই লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত।

দেশের এই বহু অভাব দূরীকরণার্থে ‘শ্রীশ্রীসিন্ধেশ্বরী লিমিটেড’ নামে একটি জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি স্থাপিত হইতেছে। ধর্মপ্রাণ শেয়ারহোল্ডারগণের অর্থে একটি মহান তীর্থ-ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে, জাগ্রত দেবী সমন্বিত সুবহু মন্দির নির্মিত হইবে। উপযুক্ত ম্যানেজিং এজেন্টের হস্তে কার্য-নির্বাহের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। কোনও প্রকার অপব্যয়ের সম্ভাবনা নাই। শেয়ারহোল্ডারগণ আশীতী দক্ষিণা বা ডিভিডেন্ড পাইবেন এবং একধারে ধর্ম অর্থ মোক্ষ লাভ করিয়া ধনা হইবেন।



### এসী গতি সন্সারমে

অটল। কুমড়োর চামড়া তো টান হবে না। আর ক'মে বাবে। কিহে বৈজ্ঞানিক, কুমড়োর খোসার একটা গতি করতে পার?

বিপিন। কস্টিক পটাস দিয়ে বয়েল করলে বোধ হয় ভেজিটেবল শূ হ'তে পারে। এক্সপেরিমেন্ট ক'রে দেখব।

গণ্ডেরি। জো খুশি করো। হমার কি আছে। হামি খোড়া রোজ বাদ আপ'না শেয়ার বিলকুল বেচে দিব।

হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে কোম্পানির বাৎসরিক লাভ অন্ততঃ ১২ লক্ষ টাকা হইবে এবং অনাগ্রাসে ১০০ পারসেন্ট ডিভিডেন্ট দেওয়া যাইবে। ৩০ হাজার শেয়ারের আবেদন পাইলে অ্যালটমেন্ট হইবে। সমস্ত শেয়ারের জন্য আবেদন করুন। বিলম্বে এই সুবর্ণসুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

গণ্ডেরি। লিখে লিন—চাই লাখ টাকার শেয়ার বিক্রি হয়ে গেছে। হামি এক লাখ লিব, বাকী দেড় লাখ শ্যামবাবু, বিপিনবাবু, অটলবাবু, সমান হিসসা লিবেন।

শ্যাম। পাগল আর কি! আমি আর বিপিন কোথা থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ হাজার বার করব? আপনারা না হয় বড়লোক আছেন।

গণ্ডেরি। হামি-শালা রূপয়া ডালবো আর তুমি লোগ মৌজ করবে? দো হোবে না। সবুজা ঝোঁখি লেনা পড়েগা। শ্যামবাবু, মন্তলব সমঝলেন না? টাকা কোই দিব না। সব হাওলাতী থাকবে। মেনেজিং এজিণ্ট মহাজন হোবে।

অটল। বুঝলেন শ্যাম-দা? আমরা সকলে যেন ম্যানেজিং এজেন্টসদের কাছ থেকে কজ' ক'রে নিজের নিজের শেয়ারের টাকা কোম্পানিকে দিচ্ছি: আবার কোম্পানি ঐ টাকা ম্যানেজিং

## শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

এজেন্টস্দের কাছে গচ্ছিত রাখছে। গাট থেকে এক পরস্যাও কেউ দিচ্ছেন না, টাকাটা কেবল খাতাপত্রে জমা থাকবে।

শ্যাম। তার পর ভাল সামলাবে কে? কোম্পানি ফেল হলে আমি মারা যাই আর কি! বাকী কলের টাকা দেব কোথা থেকে?

গণ্ডেরি। ডরেন কেনো? শেয়ার পিছ তো অভ দো টাকা দিতে হোবে। চাই লাখ টাকার শেয়ারে সফ পচাস হাজার দেনা হোর। প্রিমিয়ম মে সব বেচে দিব—সুবিধতা হোয় তো আউর ভি শেয়ার ধ'রে রাখবো। বহুত মুনোফা মিলবে। চিম্‌ড়িমল ব্রোকারসে হামি বন্দো-বন্দত কিয়েছি। দো চার দফে হম লোগ আপনা আপনি শেয়ার লেকে খেলবো, হাথ বদলাবো, দাম চাবে, বাজার গরম হোবে। তখন সব কোই শেয়ার মাংবে, দাম কা বিচার করবে না। কবীরজী কি বচন শুনিয়ে—

এসী গতি সনসারমে যো গাড়র কি ঠাট  
এক পড়া সব গাড়মে সবে যাত তেহি বাট॥

মানি হচ্ছে—সনসারের লোক সব যেন ভেড়ার পাল। এক ভেড়া যদি খান্দেমে গির পড়ে তো সব কোই উসিমে ঘুসে।

শ্যামবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—‘তারা ব্রহ্মময়ী, তুমিই জান। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তোমার কাজ তুমিই উদ্ধার করে দাও মা—অধম সন্তানকে যেন মেরো না।’

গণ্ডেরি। শ্যামবাবু, মন্দির-উন্দিরকা কোম্পানি যো করুনা হায় কিজিয়ে। উস্কি সাথ ঘই-এর কারবার ভি লাগায় দিন। টাকায় টাকা লাভ।

অটল। ঘই কি চিজ?

গণ্ডেরি। ঘই জানেন না? ঘিউ হচ্ছে আসলি চিজ—যো গায় ভ'ইস বকড়িকা দুধসে বনে। আউর নকলি যো হায় সো ঘই কহ'লাতা। চাঁবি, চীনা-বাদাম তল ওয়ায়রহ মিল্য করু বনায়্য যাতা। পর সাল হামি ঘই-এর কামে পচিশ হাজার লাগাই, সাড়ে চৌবিশ হাজার মুনোফা মিলে।

অটল। উঃ বিস্তর সাপ মেরেছিলেন বলুন!

গণ্ডেরি। আরে সাঁপ কাঁহাসে মিলবে? উ সব বড় বাত।

অটল। আচ্ছা গণ্ডারজী—

গণ্ডেরি। গণ্ডার নেহি, গণ্ডেরি।

অটল। হাঁ, হাঁ, গণ্ডেরিজী। বেগ ইওর পার্ডন। আচ্ছা, আপনি তো নিরামিষ খান, ফোটা কাটেন, ভজন-পূজনও করেন।

গণ্ডেরি। কেনো করবো না? হামি হরু রোজ গীতা আউর রামচরিতমানস পঢ়ি, গায়ভজন ভি করি।

অটল। তবে অমন পাপের ব্যবসাটা করলেন কি বলে?

গণ্ডেরি। পাপ? হামার কেনো পাপ হোবে? লেবসা তো করে কাসেম আলি। হামি হাই কলকাতা, ঘই বনে হাথরসমে। হামি ন আঁখসে দেখি, ন নাকসে শূঁখি—হলমানজী কিয়িয়া। হামি তো সফ মহাজন আছি—রুপয়া দে করু খালাস। সুদ লি, মুনোফার খাশা তিসসা ভি লি। যদি হামি টাকা না দি, কাসেম আলি দুসরা ধনীসে লিবে। পাপ হোএ তো শালা কাসেম আলিকা হোবে। হামার কি? যদি ফিন কিছু দোষ লাগে—জানে



বনছোড়জী—হমার পদুন্ডি খোড়া-বহুত জমা আছে। একাদসী, শিউরাত, রামনওমীসে উপবাস, দান-খররাত ভি কুছ করি। আট আটঠো ধরমশালা বানোআয়া—লিলুয়ামে, বালিসে, শেওড়ফুলিসে—

অটল। লিলুয়ার ধর্মশালা তো আশরাফলাল ঠুনঠুনওয়ালা করেছে।

গণ্ডেরি। কিয়েছে তো কি হইয়েছে? সন্ডি তো ওহি কিয়েছে। লেকিন বানিয়ে দিয়েছে কোন? তদারক কোন কিয়েছে? ঠিকাদার কোন লাগিরেছে? সব হামি। আশরাফ হমার চাচেরা ভাই লাগে। হামি সলাহ্ দিয়েছি তব্ না রুপয়া খরচ কিয়েছে!

অটল। মন্দ নয়, টাকা ঢাললে আশরাফ, পুণ্য হ'ল গণ্ডেরির।

গণ্ডেরি। কেনো হোবে না? দো দো লাখ রুপেয়া হব্ জগেমে খরচ দিয়া। জোড়িয়ে তো কেতনা হোয়। উস পর কম্বে কম স'য়কড়া পাঁচ রুপয়া দস্তুরি তো হিসাব কিজিয়ে। হাম তো বিলকুল ছোড় দিয়া। আশরাফলালকা পদুন্ যদি সোলহ্ লাখকা হোয়, মেরা ভি অসসি ইজার মোতাবেক হোনা চাহতা!

অটল। চমৎকার ব্যবস্থা! পুণ্যেরও দেখছি দালালি পাওয়া যায়। আমাদের শ্যাম-দা গণ্ডেরি-দা যেন মানিকজোড়।

গণ্ডেরি। অটলবাবু, আপনি দো চার অংরেজী কিতাব পড়িয়ে হামাকে ধরম কি শিখ্‌লাবেন? বংগালী ধরম জানে না। তিস রুপয়ার নোকারি করবে, পাঁচ পইসার হিরিলাউ দিবে। হামার জাত রুপয়া ভি কামায় হিসাবসে, পদুন্ ভি করে হিসাবসে। আপনেদের ববীন্দরনাথ কি লিখছেন—

বৈরাগ সাধন মুক্তি সো হমার নহি।

হামি এখন চলছি, রেস খেলনে। কোন্‌শি গেরিল ঘোড়ে পর্ আজ দো-চারশও লাগিয়ে দিব।

অটল। আমিও উঠি শ্যাম-দা। আটিকেলের মুসাবিদা রেখে যাচ্ছি, দেখে রাখবেন। প্রসপেক্টস তো দিশি হয়েছে। একটু-আধটু বদলে দেব এখন। পরশু আবার দেখা হবে। নমস্কার।

বাগবাজারে গলির ভিতর রায়সাহেব তিনকাড়িবাবুর বাড়ি। নীচের তলায় রাস্তার স্রম্মুখে নাতিবহুং বৈঠকখানা-ঘরে গৃহকর্তা এবং নিমন্ত্রিতগণ গম্পে নিরত, অন্দর হইতে কখন ভোজনের ডাক আসিবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। আজ রবিবার, তাড়া নাই, বেলা অনেক হইয়াছে।

তিনকাড়িবাবুর বয়স ষাট বৎসর, ক্ষীণ দেহ, দাড়ি কামানো। শীর্ণ গোঁফে তাম্বাকের ধোঁয়ায় পাকা থেজুরের রং ধরিয়াছে—কথা কাঁহবার সময় আরসোলার দাড়ার মত নড়ে। তিনি দৈব ব্যাপারে বড় একটা বিশ্বাস করেন না। প্রথম পরিচয়ে শ্যামবাবুকে বড়বুকে সাবাস্ত করিয়াছিলেন, কেবল লাভের আশায় কম্পানিতে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু আজ কালাঘাট হইতে প্রত্যগত সদাশ্রম্য শ্যামবাবুর অভিনব মূর্তি দেখিয়া কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্যামবাবুর পরিধানে লাল চেলী, গেরুয়া রঙের আলোয়ান, পায়ে বাঘের চামড়ার শিং-তোলা জুতা। দাড়ি এবং চুল সাজিমাটি দ্বারা যথাসম্ভব ফাঁপানো, এবং কপালে মস্ত একটি সিদ্‌রের ফোঁটা।

তিনকড়িবাৰু তামাক-টানার অন্তরালে বলিভেছিলেন—‘দেখুন স্বামীজী, হিসেবই হ’ল বাবসার সব। ডেবিট ক্রেডিট যদি ঠিক থাকে, আর ব্যালান্স যদি মেলে, তবে সে বিজনেসের কোনও ভয় নেই।’

শ্যামবাৰু। আজ্ঞে, বড় যথার্থ কথা বলেছেন। সেইজন্যই তো আমরা আপনাকে চাই। আপনাকে আমরা মধ্যে মধ্যে এসে বিরক্ত করব, হিসেব সম্বন্ধে পরামর্শ নেব—

তিনকড়ি। বিলক্ষণ, বিরক্ত হব কেন। আমি সমস্ত হিসেব ঠিক ক’রে দেব। মিটিংগুলো একটু ঘন ঘন করবেন। না হয় ডিরেক্টর্স্ ফাঁ বাবদ কিছু বেশী খরচ হবে। দেখুন, ডাউটার-ফাউটার আমি বুঝি না। আরে বাপু, নিজের জমাখরচ যদি নিজে না বুঝলি তবে বাইরের একটা অর্বাচীন ছোকরা এসে তার কি বুঝবে? ভারী আজকাল সব বুক-কিপিং শিখেছেন! সে কি জানেন—একটা গোলকধাঁধা, কেউ যাতে না বোঝে তারই চেষ্টা। আমি বুঝি—রোজ কত টাকা এল, কত খরচ হ’ল, আর আমার মজুদ রইল কত। আমি যখন আমড়াগাছ সর্বাভিজনের ট্রেজারার চার্জে, তখন এক নতুন কলেজ-পাস গোর্ফকামানো ডেপুটি এলেন আমার কাছে কাজ শিখতে। সে ছোকরা কিছুই বোঝে না, অথচ অহংকারে ভরা। আমার কাজে গলদ ধরবার আশ্পর্শ। শেষে লিখলুম কোল্ডহাম সাহেবকে, যে হুজুর, তোমরা রাজার জাত, দু-ঘা দাও তাও সহ্য হয়, কিন্তু দেশী ব্যাঙাচির লাথি বরদাস্ত করব না। তখন সাহেব নিজে এসে সমস্ত বুঝে নিয়ে আড়ালে ছেঁকরাগাছ ধমকালেন। আমাকে পিঠ চাপড়ে হেসে বললেন—ওয়েল তিনকড়িবাৰু, তুমি হ’লে কতকালের সিনিয়র অফিসর, একজন ইয়ং চ্যাপ তোমার কদর কি বুঝবে? তার পর দিলেন আমাকে নওগাঁয়ে গাজা-গোলার চার্জে বদলি ক’রে। যাক সে কথা। দেখুন, আমি বড় কড়া লোক। জবরদস্ত হাকিম ব’লে আমার নাম ছিল। মন্দির টান্দির আমি বুঝি না, কিন্তু একটি আধলাও কেউ আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। রক্ত জল করা টাকা আপনার জিম্মায় দিচ্ছি, দেখবেন যেন—

শ্যাম। সে কি কথা! আপনার টাকা আপনারই থাকবে আর শতগুণ বাড়বে। এই দেখুন না—আমি আমার যথাসর্বস্ব পৈতৃক পণ্ডাশ হাজার টাকা এতে ফেলেছি। আমি না হয় সর্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী, অর্থে প্রয়োজন নেই, লাভ যা হবে মায়ের সেবাতেই ব্যয় করব। বিপিন আর এই অটল ভায়াও প্রত্যেকে পণ্ডাশ হাজার ফেলেছেন। গণ্ডেৰি এক লাখ টাকার শেয়ার নিয়েছে। সে মহা হিসেবী লোক—লাভ নিশ্চিত না জানলে কি নিত?

তিনকড়ি। বটে, বটে? শুনেন আশ্বাস হচ্ছে। আচ্ছা, একবার কোল্ডহাম সাহেবকে কনসল্ট করলে হয় না? অমন সাহেব আর হয় না।

‘ঠাই হয়েছে’—চাকর আসিয়া খবর দিল।

‘উঠতে আজ্ঞা হ’ক ব্রহ্মচারী মশায়, আসুন অটলবাৰু, চল হে বিপিন।’ তিনকড়িবাৰু সকলকে অন্তরের বরান্দায় আনিলেন।

শ্যামবাৰু বলিলেন—‘করেছেন কি রায়সাহেব, এ যে রাজসূয় যজ্ঞ। কই আপনি বসলেন না।’

তিনকড়ি। বাতে ভুগছি, ভাত খাইনে দু-খানা সূজির রুটি বরাদ্দ।

শ্যাম। আমি একটি ফেংবারগী-ভস্ত্রান্ত কবচ পাঠিয়ে দেব, ধারণ ক’রে দেখবেন। শাক-ডাড়া, কড়াইয়ের ডাল—এটা কি দিয়েছ ঠাকুর, এঁচাডের ঘণ্ট? বেশ, বেশ? শোধন করে নিতে হবে। সুপক কদলী আর গব্যঘাত বাড়িতে হবে কি? আরবুর্বেদে আছে—পনসে কদলং কদলে ঘৃতম্। কদলীভক্ষণে পনসের দোষ নষ্ট হয়, আবার ঘৃতের দ্বারা কদলীর শৈত্যগুণ দূর হয়। পুটিমোছ ভাজা—বাঃ। রোহিতাদপি রোচকাঃ পুষ্টিকাঃ সদাভিজ্ঞাতাঃ। ওটা কিসের অবল বললে—কামরাঙা? সর্বনাশ, তুলে নিয়ে যাও। গত বৎসর শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে ঐ ফলটি

জগন্নাথ প্রভুকে দান করছি। অম্বল জিনিসটা আমার সয়ও না—শ্লেষ্মার ধাত কি না। উস্প্. উস্প্. উস্প্. প্রাণায় আপনায় সোপানায় স্বাহা। শয়নে পশ্মনাভণ্ড ভোজনে তু জনাদনম্। আরম্ভ কর হে অটল।

অটল। (জনান্তিকে) আরম্ভের ব্যবস্থা যা দেখছি তাতে বাড়ি গিয়ে ক্ষুদ্রবৃত্তি করতে হবে।

তিনকাড়ি। আচ্ছা ঠাকুরমশায়, আপনাদের তন্ত্রশাস্ত্রে এমন কোন প্রক্রিয়া নেই যার দ্বারা লোকের—ইরে—মানমর্যাদা বর্ধিত পেতে পারে?

শ্যাম। অবশ্য আছে। যথা কুলার্ণবে—অমানিনা মানদেন। অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হ'লে অমানী ব্যক্তিকেও মান দেন। কেন বলুন তো?

তিনকাড়ি। হাঃ হাঃ সে একটা তুচ্ছ কথা। কি জানেন, কোন্ডহাম সাহেব বলেছিলেন, সুবিধা পেলেই লাট সাহেবকে ধরে আমার বড় খেতাব দেওয়াবেন। বার বার তো রিমাইন্ড করা ভাল দেখায় না তাই ভাবছিলাম যদি তন্ত্রে-মন্ত্রে কিছু হয়। মানিনে যদিও, তবুও—

শ্যাম। মানতেই হবে। শাস্ত্র মিথ্যা হতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ বিষয়ে আমার সমস্ত সাধনা নিয়োজিত করব। তবে সদ্‌গুরু প্রয়োজন, দীক্ষা ভিন্ন এসব কাজ হয় না। গুরুও আবার যে সে হ'লে চলবে না। খরচ—তা আমি যথা সম্ভব অস্পেই নির্বাহ করতে পারব।

তিনকাড়ি। হুঁ দেখা যাবে এখন। আচ্ছা, আপনাদের আঁপসে তো বিস্তর লোকজন দরকার হবে, তা—আমার একটি শালীপো আছে, তার একটা হিল্লো লাগিয়ে দিতে পারেন না? বেকার ব'সে ব'সে আমার অন্ন ধ্বংস করছে, লেখাপড়া শিখলে না, কুসঙ্গে মিশে বিগড়ে গেছে। একটা চাকরি জুটলে বড় ভাল হয়। ছোকরা বেশ চটপটে আর স্বভাব-চরিত্রও বড় ভাল।

শ্যাম। আপনার শালীপো? কিছু বলতে হবে না। আমি তাকে মন্দিরের হেড-পাণ্ডা ক'রে দেব। এখনি গোটা-পনর দরখাস্ত এসেছে—তার মধ্যে পাঁচজন গ্রাজুয়েট। তা আপনার আত্মীয়ের ক্রেম সবার ওপর।

তিনকাড়ি। আর একটি অনুরোধ। আমার বাড়িতে একটি পুরনো কাঁসর আছে—একটু ফেটে গেছে, কিন্তু আদত খাটী কাঁসা। এ জিনিসটা মন্দিরের কাজে লাগানো যায় না? সস্তায় দেব।

শ্যাম। নিশ্চয়ই নেব। ওসব সেকলে জিনিস কি এখন সহজে মেলে?

...

...

...

...

গণ্ডেরির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের জোরে এবং প্রতিষ্ঠাতৃগণের চেষ্টায় সন্ন্যাস শৈয়ারই বিলি হইয়া গিয়াছে। লোকে শৈয়ার লইবার জন্য অস্থির, বাজারে চড়া দামে বেচা-কেনা হইতেছে।

অটলবাবু বলিলেন—‘আর কেন শ্যাম-দা, এইবার নিজের শৈয়ার সব বেড়ে দেওয়া যাক। গণ্ডেরি তো খুব একচোট মারলে। আজকে ডবল দর। দু-দিন পরে কেউ ছোঁবেও না।’

শ্যাম। বেচতে হয় বেচ, মোন্দা কিছু তো হাতে রাখতেই হবে, নইলে ডিরেক্টর হবে কি ক'রে?

অটল। ডিরেক্টর আপনি করুন গে। আমি আর হাঙ্গামার থাকতে চাইনে। সিন্ধেশ্বরীর কুপার আপনার তো কার্বাসিদ্ধি হয়েছে।

শ্যাম। এই তো সবে আরম্ভ। মন্দির, ঘরদোর, হাট-বাজার সবই তো বাকি। তোমাকে কি এখন ছাড়া যায়?

অটল। থেকে আমার লাভ? পেটে খেলে পিঠে সয়। এখন তো ব্রাদার-ইন-ল কোম্পানির মরসুম চলল। আমাদের এইখানে শেষ।

শ্যাম। আরে ব্যস্ত হও কেন, এক যাত্রায় কি পৃথক ফল হয়? সম্ভবেলা যাব এখন তোমাদের বাড়িতে,—গণ্ডেরিকেও নিয়ে যাব।

...

...

...

...

দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল কোম্পানীর আপসে ডিরেক্টরগণের সভা বসিয়াছে। সভাপতি তিনকড়িবাবু টেবিলে ঘুমি মারিয়া বলিতেছিলেন—‘আ—আ—আমি জানতে চাই, টাকা সব গেল কোথা। আমার তো বাড়িতেই টাকা ভার—সবাই এসে তাড়া দিচ্ছে। কয়লাওয়ালা বলে তার পঁচিশ হাজার টাকা পাওনা, ইটখোলার ঠিকাদার বলে বারো হাজার, তার পর ছাপাখানাওলা, শাপার কোম্পানী, কুন্ড, মৃদ্ধজো, আরও কত কে আছে। বলে আদালতে যাব। মন্দিরের কোথা কি তার ঠিক নেই—এর মধ্যে



আ—আ—আমি জানতে চাই

দু-লাখ টাকা ফুঁকে গেল? সে ভণ্ড জোচোরটা গেল কোথা? শুনতে পাই ডুব মেরে আছে, আপসে বড় একটা আসে না।’

অটল। ব্রহ্মচারী বলেন, মা তাঁকে অন্য কাজে ডাকছেন—এদিকে আর তেমন মন নেই। আজ তো মিটিংএ আসবেন বলেছেন।

বিপিন বলিলেন—‘বাস্তব হচ্ছেন কেন সার, এই তো ফর্দ রয়েছে, দেখুন না — জমি-কেনা, শেয়ারের দালালি, preliminary expense, ইট-তৈরী, establishment, বিজ্ঞাপন, আপস-খরচ—’

তিনকড়ি। চোপ রও ছোকরা। চোরের সাক্ষী গটিকটা।

এমন সময় শ্যামবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—‘ব্যাপার কি?’

তিনকড়ি। ব্যাপার আমার মাথা। আমি হিসেব চাই।

শ্যাম। বেশ তো, দেখুন না হিসেব। বরঞ্চ একদিন গোবিন্দপুরে নিজে গিয়ে কাজকর্ম তদারক ক'রে আসুন।

তিনকড়ি। হ্যাঁ, আমি এই বাতের শরীর নিয়ে তোমার ধ্যাধোড়ে গোবিন্দপুরে গিয়ে মরি আর কি। সে হবে না—আমার টাকা ফেরত দাও। কোম্পানি তো যেতে বসেছে। শেয়ার-হোল্ডাররা মার-মার কাট-কাট করছে।

শ্যামবাবু কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিলেন—‘সকলই জগন্মাতার ইচ্ছা। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। এতদিন তো মন্দির শেষ হওয়ারই কথা। কতকগুলো অজ্ঞাতপূর্ব কারণে খরচ বেশী হয়ে গিয়ে টাকার অনটন হয়ে পড়ল, তাতে আমাদের আর অপরাধ কি? কিন্তু চিন্তার কোনও কারণ নেই, ক্রমশ সব ঠিক হয়ে যাবে। আর একটা call-এর টাকা তুললেই সমস্ত দেনা শোধ হয়ে যাবে, কাজও এগোবে।’

গণ্ডেরি বলিলেন—‘আউর টাকা কোই দিবে না, আপকো থোড়াই বিশোআস করবে।’

শ্যাম। বিশ্বাস না করে, নাচার। আমি দায়মুক্ত, মা যেমন ক'রে পারেন নিজের কাজ চালিয়ে নিন। আমাকে বাবা বিশ্বনাথ কাশীতে টানছেন, সেখানেই আশ্রয় নেব।

তিনকড়ি। তবে বলতে চাও, কোম্পানি ডুবল?

গণ্ডেরি। বিশ হাঁথ পানি।

শ্যাম। অচ্ছা তিনকড়িবাবু, আমাদের ওপর যখন লোকের এতই আশ্বিনাস, বেশ তো, আমরা না হয় ম্যানেজিং এজেন্সি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার নাম আছে, সন্দ্রম আছে, লোকেও শ্রদ্ধা করে, আপনিনই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে কোম্পানি চালান না?

অটল। এইবার পাকা কথা বলেছেন।

তিনকড়ি। হ্যাঁ, আমি বদনামের বোঝা ঘাড়ে নিই, আর ঘরের খেয়ে বুনো মোষ তাড়াই।

শ্যাম। বেগার খাটবেন কেন? আমিই এই মিটিংএ প্রস্তাব করছি যে রায়সাহেব গ্রীষ্মক তিনকড়ি ব্যানার্জি মহাশয়কে মাসিক ১০০০ টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে কোম্পানি চালাবার ভার অর্পণ করা হোক। এমন উপযুক্ত কর্মদক্ষ লোক আর কোথা? আর, আমরা যদি ভুল-চুক করেই থাকি, তার দায়ী তো আর আপনি হবেন না।

তিনকড়ি। তা—তা—আমি চট্ ক'রে কথা দিতে পারিনে। ভেবে-চিন্তে দেব।

অটল। আর স্থিধা করবেন না রায়সাহেব। আপনিই এখন ভরসা।

শ্যাম। যদি অভয় দেন তো আর একটি নিবেদন করি। আমি বেশ বুঝেছি, অঞ্চ হচ্চে সাধনের অন্তরায়। আমার সমস্ত সম্পত্তিই বিলিয়ে দিয়েছি, কেবল এই কোম্পানির ষোল শ খানেক শেয়ার আমার হাতে আছে। তাও সংপাতে অর্পণ করতে চাই। আপনিই সেটা নিয়ে নিন। প্রিমিয়ম চাই না—আপনি কেনা-দাম ৩২০০, টাকা মাত্র দিন।

তিনকড়ি। হ্যাঁ, ভাল ক'রে আমার ঘাড় ভাঙবার মতলব।

শ্যাম। ছি ছি। আপনার ভালই হবে। না হয় কিছু কম দিন,—চব্বিশ শ—দু-হাজার—হাজার—

তিনকড়ি। এক কড়াও নয়।

শ্যাম। দেখুন, ব্রাহ্মণ হ'তে ব্রাহ্মণের দান-প্রতিগ্রহ নিষেধ, নইলে আপনার মত লোককে আমার অর্মানিই দেবার কথা। আপনি ষংকিণ্ড মূল্য ধ'রে দিন! ধরুন—পাঁচ শ টাকা। ট্রান্সফার ফর্ম আমার প্রস্তুতই আছে—নিয়ে এস তো বিপিন।

তিনকড়ি। আমি এ—এ—আশি টাকা দিতে পারি।

শ্যাম। তথ্যস্তু। বড়ই লোকসান হ'ল, কিন্তু সকলই মায়ের ইচ্ছা।

গণ্ডেরি। বাহবা তিনকড়িবাবু, বহুত কিফায়ত হুয়া!





কুছ'ডি নহি

তিনকড়িবাবু পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া সদ্যপ্রাপ্ত পেনশনের টাকা হইতে আটখানা আনকোরা দশ টাকার নোট সন্তপণে গনিয়া দিলেন। শ্যামবাবু পকেটস্থ করিয়া বলিলেন—‘তবে এখন আমি আসি। বাড়িতে সত্যনারায়ণের পূজা আছে। আপনিই কোম্পানির ভার নিলেন এই কথা স্থির। শুভমস্তু—মা-দশভুজা আপনার মঙ্গল করুন।’

শ্যামবাবু প্রস্থান করিলে তিনকড়িবাবু ইমং হাসিয়া বলিলেন—‘লোকটা দোষে গুণে মানুষ। এদিকে যদিও হামবগ, কিন্তু মেজাজটা দিলদরিয়া। কোম্পানির ঝিক্টা তো এখন আমার ঘাড় পড়ল। ক-মাস বাতে পণ্ড হইয়ে পড়েছিলুম, কিছুই দেখতে পারি নি, নইলে কি কোম্পানির অবস্থা এমন হয়? যা হোক উঠে-প’ড়ে লাগতে হ’ল—আমি লেফাফা-দুরস্ত কাজ চাই, আমার কাছে কারও চালাকি চলেবে না।’

গণ্ডেরি। অপ্নের কুছ, তর্কলফ করতে হোবে না। কোম্পানি তো ডুব গিয়া। অপ্‌কোডি ছুটি।

তিনকড়ি। তা হ’লে কি বলতে চাও আমার মাসহারাটা—

গণ্ডেরি। হাঃ, হাঃ, তুমতি রূপয়া লেওগে? কাঁহাসে মিলবে বাতলাও। তিনকড়ি-বাবু, শ্যামবাবুকা কারবারই নহি সমঝা? নম্ব হজার রূপয়া কম্পনিকা দেনা। দো রোছ ব্যদ লিকুইডেশন। লিকুইডেটর সিকিণ্ড কল আদার করবে, তব্ দেনা শূদ্রবে।

তিনকড়ি। আঁ, বল কি? আমি আর এক পরসোও দিচ্ছি না।

গণ্ডেরি। আলবত দিবেন। গবরমিস্ট কান পকড়কে আদায় করবে। আইন এইসি হয়।

তিনকড়ি। আরও টাকা যাবে। সে কত?

অটল। আপনার একলার নয়। প্রত্যেক অংশীদারকেই শেয়ার পিছ ফের দ-টাকা দিতে হবে। আপনার পূর্বের ২০০ শেয়ার ছিল, আর শ্যামদার ১৬০০ আজ নিয়েছেন। এই ১৮০০ শেয়ারের ওপর আপনাকে ছত্রিশ টাকা দিতে হবে। দেনা শোধ, লিকুইডেশনের খরচা—সমস্ত চুকে গেলে শেষে সামান্য কিছু ফেরত পেতে পারেন।

তিনকড়ি। তোমাদের কত গেল?

গণ্ডেরি ব্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—‘কুছ্‌ভি নহি, কুছ্‌ভি নহি। আরে হামাদের বড়তি-পড়তি শেয়ার তো সব শ্যামবাবু লিয়েছিল—আজ আপনাকে বিক্‌কিরি কিয়েছে।’

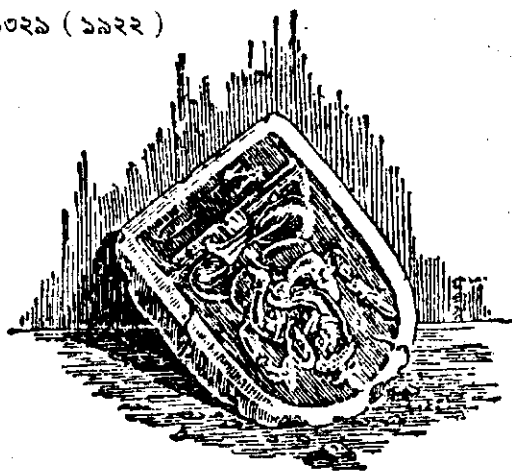
তিনকড়ি। চোর—চোর—চোর! আমি এখন বিলেতে কোন্ডহাম সাহেবকে চিঠি লিখছি—

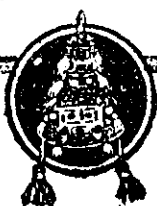
অটল। তবে আমরা এখন উঠি। আমাদের তো আর শেয়ার নেই, কাজেই আমরা এখন ডিরেক্টর নই। আপনি কাজ করুন। চল গণ্ডেরি।

তিনকড়ি। আঁ—

গণ্ডেরি। রাম রাম!

ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩২৯ (১৯২২)





সন্ধ্যা হব হব। নন্দবাবু হগ সাহেবের বাজার হইতে ট্রামে বাড়ি ফিরাতেছেন। বীডন স্ট্রীট পার হইয়া গাড়ি আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। সম্মুখে গরুর গাড়ি। আর একটু গেলেই নন্দবাবুর বাড়ির মোড়। এমন সময় দেখিলেন পাশের একটি গলি হইতে তাঁর বন্ধু বঙ্কু বাহির হইতেছেন। নন্দবাবু উৎফুল্ল হইয়া ডাকিলেন—‘দাঁড়াও হে বঙ্কু, আমি নাবাছি।’ নন্দর দৃ-বগলে দুই বাগ্‌ডল, বাস্ত হইয়া চলন্ত গাড়ি হইতে যেমন নামিবেন অর্মানি কৌচায় পা বাধিয়া নীচে পড়িয়া গেলেন।

গাড়িতে একটা শোরগোল উঠিল এবং ঘ্যাচাং করিয়া গাড়ি থামিল। জনকতক যাত্রী নামিয়া নন্দকে ধরিয়া তুলিলেন। যারা গাড়ির মধ্যে ছিলেন তাঁরা গলা বাড়াইয়া নানাপ্রকারের সমবেদনা জানাইতে লাগিলেন। ‘—আহা হা বন্ধু লেগেছে—থোড়া গরম দুধ পিলা দোও—দুটো পা-ই কি কাটা গেছে?’ একজন সিংহাস্ত করিল মৃগ। আর একজন বলিল ভির্ম। কেউ বলিল মাতাল, কেউ বলিল বাঙাল, কেউ বলিল পাড়াগায়ে ভৃত।

বাস্তবিক নন্দবাবুর মোটেই আঘাত লাগে নাই। কিন্তু কে তা শোনে। ‘লাগে নি কি ঘশায়, খুব লেগেছে—দু-মাসের ধাক্কা—বাড়ি গিয়ে টের পাবেন।’ নন্দ বার বার করজোড়ে নিবেদন করিলেন যে প্রকৃতই কিছুমাত্র চোট লাগে নাই। একজন বন্ধু ভদ্রলোক বলিলেন—‘আরে মোলো, ভাল করলে মন্দ হয়। পণ্ট দেখলুম লেগেছে তবু বলে লাগে নি।’

এমন সময় বঙ্কুবাবু আসিয়া পড়ায় নন্দবাবু পরিচায় পাইলেন, মনঃস্ক্লু যাত্রীগণসহ ট্রাম গাড়িও ছাড়িয়া গেল।

বঙ্কু বলিলেন—মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল আর কি। যা হোক, বাড়ির পথটুকু আর হেঁটে গিয়ে কাজ নেই। এই রিক্‌শ—’

রিক্‌শ নন্দবাবুকে আস্তে আস্তে লইয়া গেল, বঙ্কু পিছনে হাঁটিয়া চলিলেন।

নন্দবাবুর বয়স চাঁশ, শ্যামবর্ণ, বেঁটে গোলগাল চেহারা। তাঁহার পিতা পশ্চিমে কমিসারিয়েটে চাকরি করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে একমাত্র সন্তান নন্দর জন্য কলিকাতায় একটি বড় বাড়ি, বিস্তর আসবাব এবং মস্ত একগোছা কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া যান। নন্দর বিবাহ অপব্যয়সেই হইয়াছিল, কিন্তু এক বৎসর পরেই তিনি বিপত্তীক হন এবং তারপর আর বিবাহ করেন নাই। মাতা বহুদিন মৃত্যু, বাড়িতে একমাত্র স্ত্রীলোক এক বৃদ্ধা পিসী। তিনি ঠাকুরসেবা লইয়া বিব্রত, সংসারের কাজ ষি চাকরুরাই দেখে। নন্দবাবুর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু এ পর্যন্ত তাহা হইয়া উঠে নাই। প্রধান কারণ—আলস্য। থিয়েটার, সিনেমা, ফুটবল মাচ, রেস এবং বন্ধু-বর্গের সংসর্গ—ইহাতে নির্বিবাদে দিন কাটিয়া যায়, বিবাহের ফরসত কোথা? তার পর ক্রমেই বয়স বাড়িয়া যাইতেছে, আর এখন না করাই ভাল। মোটেই উপর নন্দ নিরীহ গোবেচারায় অপ্সরাস্বামী উদ্যমহীন আরামপ্রিয় লোক।

নন্দবাবুর বাড়ির নীচে সুবৃহৎ ঘরে সান্ধ্য আড্ডা বসিয়াছে। নন্দ আজ কিছু ক্রান্ত বোধ করিতেছেন, স্নেহন্য বাল্যপোশ গায়ে দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া আছেন। বন্ধুগণের চা ও পানিভাজা শেষ হইয়াছে, এখন পান সিগারেট ও গল্প চলিতেছে।

গুপীবাবু বলিতোছিলেন—‘উঁহু। শরীরের ওপর এত অমর করো না নন্দ। এই শীত-কালে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া ভাল লক্ষণ নয়।’

নন্দ। মাথা ঠিক ঘোরে নি, কেবল কৌটার কাপড় বেধে—

গুপী। আরে, না না। ঘুরেছিল বই কি। শরীরটা কাহিল হয়েছে। এই তো কাছাকাছি ডাক্তার তফাদার রয়েছেন। অত বড় ফিজিশিয়ান আর শহরে পাবে কোথা? হাও না কাল সকালে একবার তাঁর কাছে।

বন্ধু বলিলেন—‘আমার মতে একবার নেপালবাবুকে দেখালেই ভাল হয়। অমন বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথ আর দুটি নেই। মেজাজটা একটু তিরিকি বটে কিন্তু বৃদ্ধের বিদ্যে অসাধারণ।’

বৃষ্ঠীবাবু মুড়িমুড়ি দিয়া এক কোণে বসিয়াছিলেন। তাঁর মাথায় বাল্যক্রান্ত টুপি, গলায় দাড়ি এবং তার উপর কমফটার। বলিলেন—‘বাগ, এত শীতে অবেলায় কখনও ট্রামে চড়ে? শরীর অসাড় হ’লে আছাড় খেতেই হবে। নন্দর শরীর একটু গরম রাখা দরকার।’

নিধু বলিল—‘নন্-দা, মোটা চাল ছাড়। সেই এক বিরিঞ্জির আমলের ফরাস তাকিয়া, লকড় পালকি গাড়ি আর পক্ষিরাজ ঘোড়া, এতে গায়ে গাঁও লাগবে কিসে? তোমার পরহার অভাব কি বাওআ? একটু ফুর্তি করতে শেখ।’

সাবাস্ত হইল কাল সকালে নন্দবাবু ডাক্তার তফাদারের বাড়ি যাইবেন।

**ড**াক্তার তফাদার M.D M.R.A.S. গ্রে স্ট্রীটে থাকেন। প্রকাণ্ড বাড়ি, দু-খানা মোটর, একটা ল্যান্ড। খুব পসার, রোগীরা ডাকিয়া সহজে পায় না। দেড় ঘণ্টা পাশের কাছারায় অপেক্ষা করার পর নন্দবাবুর ডাক পড়িল। ডাক্তারসাহেবের ঘরে গিয়া দেখিলেন এখনও একটি রোগীর পরীক্ষা চলিতেছে। একজন স্থূলকায় মারোয়াড়ী নন্দগায়ে দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তার ফিতা দিয়া তাহার ভাঁড়ির পরিধি মাপিয়া বলিলেন—‘বস, সওয়া ইঞ্চি বড় গিয়া।’ রোগী খুশী হইয়া বলিল—‘নবজ্ তো দেখিয়ে।’ ডাক্তার রোগীর মণিবন্ধে নাড়ীর উপর একটি মোটর-কারের স্পার্কিং প্লাগ ঠেকাইয়া বলিলেন—‘বহুত মজেসে চল্ রহা।’ রোগী বলিল—‘জবান তো দেখিয়ে। রোগী হাঁ করিল, ডাক্তার ঘরের অপর দিকে দাঁড়াইয়া অপেরা প্লাস দ্বারা তাহার জিব দেখিয়া বলিলেন—‘থোডেসি কসর হায়া। কল্ ফিন আনা।’

রোগী চলিয়া গেলে তফাদার নন্দর দিকে চাহিয়া বলিলেন—‘ওয়েল?’

নন্দ বলিলেন—‘আজ্ঞে বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। কাল হঠাৎ ট্রাম থেকে—

তফাদার। কম্পাউন্ড ফ্রাকচার? হাড় ভেঙেছে?’

নন্দবাবু আনুপূর্বিক তাঁর অবস্থার বর্ণনা করিলেন। বেদনা নাই, জ্বর হয় না, পেটের অসুখ, সর্দি, হাঁপানি নাই। ক্ষুধা কাল হইতে একটু কমিয়াছে। রাগে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন। মনে বড় আতঙ্ক।

ডাক্তার তাঁহার বুক পেট মাথা হাত পা নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—‘জিব দেখি।’ নন্দবাবু জিভ বাহির করিলেন।

ডাক্তার ক্ষণকাল মুখ বাঁকাইয়া কলম ধরিলেন। প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ হইলে নন্দর দিকে চাহিয়া বলিলেন—‘আপনি এখন জিব টেনে নিতে পারেন। এই ওষুধ রোজ তিনবার খাবেন।’



এখন জিব টেনে নিতে পারেন

নন্দ। কি রকম বুঝলেন?

তফাদার। ডেরি ব্যাড।

নন্দ সবুয়ে বলিলেন—‘কি হয়েছে?’

তফাদার। আরও দিন কতক ওয়াচ না করলে ঠিক বলা যায় না। তবে সন্দেহ করছি cerebral tumour with strangulated ganglia। ট্রিফাইন ক’রে মাথার খুঁলি ফুটো ক’রে অস্ত্র করতে হবে, আর ঘাড় চিরে নার্ভের জট ছাড়াতে হবে। শর্ট-সার্কিট হয়ে গেছে।

নন্দ। বাঁচব তো?



তফাদার। দ'মে যাবেন না, তা হ'লে সারাতে পারব না। সাত দিন পরে ফের আসবেন।  
মাই ফ্রেন্ড মেজর গোসাইএর সঙ্গে একটা কন্সল্টেশনের ব্যবস্থা করা যাবে। ভাত-ডাল  
বড় একটা খাবেন না। এগ-ফ্লিপ, বোনম্যারো সুপ, চিকেন-স্টু, এইসব। বিকেলে একটু  
ধারণ্ড খেতে পারেন। বরফ-জল খুব খাবেন। হাঁ, বর্নিশ টাকা। থ্যাংক ইউ।

নন্দবাবু কম্পত পদে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যাবেলা বন্ধুবাবু বলিলেন—আরে তখনি আমি বারণ করেছিলুম ওর কাছে যেয়ে  
না। ব্যাটা মেডোর পেটে হাত বুলিয়ে খায়। এং, খুলির ওপর ভুরপদন চালাবেন।'

বণ্ঠীবাবু। আমাদের পাড়ার তারিণী কবিবরাজকে দেখালে হয় না?

গুপীবাবু। না না, যদি বাস্তবিক নন্দর মাথার ভেতর ওলট-পালট হয়ে গিয়ে থাকে  
তবে হাতুড়ে বন্দির কম নয়। হোমিওপ্যাথিই ভাল।

নিধু। আমার কথা তো শুনবে না বাওআ। ডাক্তারি তোমার ধাতে না সয় তো একটু  
কোবরেনজি করতে শেখ। দরওয়ানজী দিব্ব একলোটো বানিয়েছে। বল তো একটু চেয়ে  
আনি।

হোমিওপ্যাথিই স্থির হইল।

পরিদিন খুব ভোরে নন্দবাবু নেপাল ডাক্তারের বাড়ি আসিলেন। রোগীর ভিড় এখনও  
আরম্ভ হয় নাই, অস্পক্ষণ পরেই তাঁর ডাক পড়িল। একাট প্রকাণ্ড ঘরের মেঝেতে ফরাশ  
পাতা। চারিদিকে স্তূপাকারে বাঁহ সাজানো। বাঁহর দেওয়ালের মধ্যে গল্পবর্ণিত শৈয়ালের  
মত বৃন্দ নেপালবাবু বসিয়া আছেন। মুখে গড়গড়ার নল, ঘরটি ধোঁয়ায় ঝাপসা হইয়া  
গিয়াছে।

নন্দবাবু নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নেপাল ডাক্তার কটমট দৃষ্টিতে চাহিয়া  
বলিলেন—বসবার জায়গা আছে।' নন্দ বসিলেন।

নেপাল। স্বাস উঠেছে?

নন্দ। আজ্ঞে?

নেপাল। রোগীর শেষ অবস্থা না হ'লে তো আমার ডাকা হয় না, তাই জিজ্ঞেস করছি।

নন্দ সর্বিনয়ে জানাইলেন তিনিই রোগী।

নেপাল। আলোপ্যাথ ডাকাত ব্যাটারা ছেড়ে দিলে যে বড়? তোমার হয়েছে কি?

নন্দবাবু তাঁহার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিলেন।

নেপাল। তফাদার কি বলেছে?

নন্দ। বললেন আমার মাথার টিউমার আছে।

নেপাল। তফাদারের মাথার কি আছে জান? গোবর। আর টুপি'র ভেতর শিং, জুতোর  
ভেতর খুব পাতলুনের ভেতর ল্যাজ। খিদে হয়?

নন্দ। দু-দিন থেকে একেবারে হয় না।

নেপাল। খুম হয়?

নন্দ। না।

নেপাল। মাথা ধরে?

নন্দ। কাল সন্ধ্যাবেলা ধরেছিল।

নেপাল। বাঁ দিক?

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

নেপাল। না ডান দিক?

## চিকিৎসা-সঙ্কট

নন্দ। আজে হাঁ।

নেপাল ধমক দিয়া বলিলেন—‘ঠিক ক’রে বল।’

নন্দ। আজে ঠিক মধ্যস্থানে।

নেপাল। পেট কামড়ায়?

নন্দ। সেদিন কামড়েছিল। নিধে কাবলী মটরভাজা এনেছিল তাই খেয়ে—

নেপাল। পেট কামড়ায় না মোচড় দেয় তাই বল।

নন্দ বিব্রত হইয়া বলিলেন—‘হাঁচোড়-পাঁচোড় করে।’



হাঁচোড়-পাঁচোড় করে

ডাক্তার করেকটি মোটা-মোটা বহি দেখালেন, তার পর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—‘হুঁ। একটা ওষুধ দিচ্ছি নিয়ে যাও। আগে শরীর থেকে অ্যালোপ্যাথিক বিষ ত্যাগ হবে। পাঁচ বছর বয়সে আমায় খুঁনে বাটায়া দু-গেন কুইনীন দিয়েছিল, এখনও বিকেলে মাথা টিপ টিপ করে। সাতদিন পরে ফের এসো। তখন আসল চিকিৎসা শুরু হবে।’

নন্দ। ব্যারামটা কি আন্দাজ করছেন?

ডাক্তার ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন—‘তা জেনে তোমার চারটে হাত বেরবে নাকি? যদি

দলি তোমার পেটে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস হয়েছে, কিছু বুঝবে? ভাত খাবে না, দু-বেলা রুটি, মাছ-মাংস বারণ, শুধু দুগের ডালের গুণ, স্নান বন্ধ, গরম জল একটু খেতে পার, তামাক খাবে না, ধোঁয়া লাগলে ওষুধের গুণ নষ্ট হবে। ভাবছো আমার আলমারির ওষুধ নষ্ট হয়ে গেছে? সে ভয় নেই, আমার তামাকে সালফার-থার্মিট্রিশ্মেনো থাকে। ফী কত তাও বলে দিতে হবে নাকি? দেখছো না দেওয়ালে নোটিস লটকানো রয়েছে ব্রিটিশ টাকা? আর ওষুধের দাম চার টাকা।

নন্দবাবু টাকা দিয়া বিদায় লইলেন।

নিধু বলিল—কেন বাওআ কাঁচা গরহা নষ্ট করছ? থাকলে পাঁচ রাত বস্ত্রে ব'সে টিয়াটার দেখা চলত। ও নেপাল-বুড়ো মস্ত ঘুঘু, নন্দ-দাকে ভালমানুষ পেয়ে জেরা ক'রে থ ক'রে দিয়েছে। পড়ত আমার পাল্লায় বাছাধন, কত বড় হোমিওপ্যাথি দেখে নিতুম। এক চুমুকে তার আলমারি-সুন্দ ওষুধ সাবড়ে না দিতে পারি তো আমার নাক কেটে দিও।

গুপী। আজ আপিসে শুনছিলুম কে একজন বড় হাকিম ফরক্কাবাদ থেকে এখানে এসেছে। খুব নামডাক, রাজা-মহারাজারা সব চিকিৎসা করাতেন। একবার দেখালে হয় না?

শুষ্ঠী। এই শীতে হাকিমী ওষুধ? বাপ, শরবত খাইয়েই মারবে। তার চেয়ে ভারিণী কোবরেজ ভাল।

প্রঃপর কবিরাজী চিকিৎসাই সাব্যস্ত হইল।

পরিদিন সকালে নন্দবাবু ভারিণী কবিরাজের বাড়ি উপস্থিত হইলেন। কবিরাজ মহাশয়ের বয়স ষাট, ক্ষীণ শরীর, দাঁড়ি-গোঁফ কামানো। তেল মাখিয়া আটহাতী ধূতি পরিয়া একটি চেয়ারের উপর উবু হইয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন। এই অবস্থাতেই ইনি প্রত্যহ রোগী দেখেন। ঘরে একটি তক্তাপোশ, তাহার উপর তেলচিটে পাটি এবং কয়েকটি মালিন তাকিয়া। দেওয়ালের কোলে দুটি ওষুধের আলমারি।

নন্দবাবু নমস্কার করিয়া তক্তাপোশে বসিলে কবিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবু, কন্থে আসা হচ্ছে? নন্দবাবু নিজের নাম ও ঠিকানা বলিলেন।

ভারিণী। রুগীর ব্যামোডা কি?

নন্দবাবু জানাইলেন তিনিই রোগী এবং সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিলেন।

ভারিণী। মাথার খুলি ছেঁদা করে নিচ্ছে নাকি?

নন্দ। আস্তে না, নেপালবাবু বললেন পাখুরি, তাই আর মাথায় হস্তের করাই নি।

ভারিণী। নেপাল! সে আবার কেডা?

নন্দ। জানেন না? চোরবাগানের নেপালচন্দ্র রায় M.B.F.T.S —মস্ত হোমিওপ্যাথ।

ভারিণী। অং, ন্যাপলা, তাই কও। সেডা আবার ডাগনের হ'ল কবে? বলি, পাড়ায় এমন বিচক্ষণ কোবরেজ থাকতি ছেলেছোকরার কাছে যাও কেন?

নন্দ। আস্তে, বন্ধু-বান্ধবরা বললে ডাক্তারের মতটা আগে নেওয়া দরকার, যদিই অস্ত্র-চিকিৎসা করতে হয়।

ভারিণী। যন্তবাবু-রি চেন? খুলনের উঁকল যন্তবাবু?

নন্দ ঘাড় নাড়িলেন।

ভারিণী। তরি মামার হয় উরুসন্ত। সিভিল সার্জন পা কাটলে। তিন দিন অটুতনি। জ্ঞান হ'ল পর কইলেন, আমার ঠ্যাং কই? ডাক ভারিণী স্যানরে। দেলাম ঠুকে এক দলা চাবনপ্রাশ। তারপর কি হ'ল কও দিকি?

## চিকিৎসা-সংকট

নন্দ আবার পা গজিয়েছে বুঝি?

‘ওরে অ ক্যাব্‌লা, দেখ্‌ দেখ্‌ বিড়লে সব্‌ডা ছাগলাদ্য ঘেত খেয়ে গেল’—বলিতে বলিতে কবিরাজ মহাশয় পাশের ঘরে ছুটিলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া যথাস্থানে বসিয়া বলিলেন—‘দ্যাও নাড়ীডা একবার দেখি। হঃ, যা ভাবছিলাম তাই। ভারী ব্যামো হয়েছিল কখনও?’

নন্দ। অনেক দিন আগে টাইফয়েড হয়েছিল।

তারিণী। ঠিক ঠাউরেছি। পাচ বছর আগে?

নন্দ। প্রায় সাড়ে সাত বছর হ’ল।

তারিণী। একই কথা, পাচ দেৱা সারে সাত। প্রতিজ্ঞা লে বোমি হয়?

নন্দ। আজ্ঞে না।



হয়, ঘনতি পার না

তারিণী। হয়, ঘনতি পার না। নিদ্রা হয়?

নন্দ। ভাল হয় না।

তারিণী। হবেই না তো। উৰ্ধ্ব হয়েছে কি না। দাত কনকন করে?

নন্দ। আজ্ঞে না।

তারিণী। করে, ঘনতি পার না। যা হোক, তুমি চিন্তা কেরো নি বাবা। আরাম হয়ে যাবানে। আমি ওষুধ দিচ্ছি।

কবিরাজ মহাশয় আলমারি হইতে একটি শিশি বাহির করিলেন, এবং তাহার মধ্যস্থিত

বড়ির উদ্দেশ্যে বলিলেন—‘লাফাস নে, থাম্ থাম্। আমার সব জীবন্ত ওষুধ, ডাকলি ডাক শোনে। এই বড়ি সকাল-সন্ধ্যা একটা করি খাবা। আবার তিনদিন পরে আস্‌বা। বৃজেচ?’

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

তারিণী। ছাই বৃজেচ। অনুপান দিতি হবে না? টাণ্ডা লেবুর রস আর মধুর সাগি মাড়ি খাবা। ভাত খাবা না। ওলসিদ্ধ, কচুসিদ্ধ এইসব খাবা। নুদন ছোঁবা না। মাগুর মাহের কোল একটু চ্যানি দিয়া রাঁধি খাতি পার। গরম জল ঠাণ্ডা করি খাবা।

নন্দ। ব্যারামটা কি?

তারিণী। যারে কয় উদ্‌রি। উদ্‌শ্লেষ্মাও কইতি পার।

নন্দবাবু কবিরাজের দর্শনী ও ঔষধের মূল্য দিয়া বিমর্ষাচিন্তে বিদায় লইলেন।

নিধু বলিল—‘কি দাদা, বোকারেজির সাধ মিটল?’

গুপী। নাঃ এ-সব বাজে চিকিৎসার কাজ নয়। কোথাও চেজে চল।

বঙ্কু। আমি বলি কি, নন্দ বে-থা করে ঘরে পরিবার আনুক। এ-রকম দামড়া হয়ে থাকা কিছু নয়।

নন্দ চিঁ চিঁ স্বরে বলিলেন—‘আর পরিবার। কোন দিন আছি, কোন দিন নেই। এই বয়সে একটা কাঁচ বউ এনে মিথ্যে জঞ্জাল জেটানো।’

নিধু বলিল—‘নন্দ-দা, একটা মোটর কেন মাইরি! দু-দিন হাওয়া খেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। সেভেন সিটার হড্‌সন; যেটের কোলে আমরা তো পাঁচজন আছি।’

ষষ্ঠী। তা যদি বললে, তবে আমার মতে মোটর-কারও যা, পরিবারও তা। ঘরে আনা সোজা; কিন্তু মেরামতী খরচ যোগাতে প্রাণান্ত। আজ টায়ার ফাটল কাল গিল্লীর অম্বল-শুল, পরশু বাটারি খারাপ, তরশু ছেলেটার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর। অমন কাজ ক’রো না নন্দ! কেরবার হবে। এই শীতকালে কোথা দু-দুন্ড লেপের মধ্যে ঘুমাব মশায়, তা নয়, সারারাত প্যান প্যান টাঁ টাঁ।

নিধু। ষষ্ঠী খুড়ো যে রকম হিসেবী লোক, একটি মোটা-সোটা রোঁ-ওলা ভাল্লুকের মেয়ে বে করলে ভাল করতেন। লেপ-কম্বলের খরচা বাঁচত!

গুপী। যাঁহা বাহান তাঁহা তিপাহা। কাল সকালে নন্দ একবার হাকিম সাহেবের কাছে যাও। তার পর যা হয় করা যাবে।

নন্দবাবু অগত্যা রাজী হইলেন।

হাজিক-উল-মুল্ক বিন লোকমান নুরুল্লা গজন ফরুল্লা অল হাকিম য়ুনানী লোয়ার চিংপরে রোডে বাসা লইয়াছেন। নন্দবাবু তেতলায় উঠিলে একজন লুৎগিপরা ফেজ-ধারী লোক তাঁহাকে বলিল—‘আসেন বাবু, মশায়। হামি হাকিম সাহেবের মীরমুনসী। কি বেমারি বোলেন, হামি লিখে হাজুবকে ইতলা ভেজিয়ে দিব।’

নন্দ। বেমারি কি সেটা জানতেই তো আসা বাপু।

মুনসী। তবু ভি কিছু, তো বোলেন। না-তাক্তি, বখার, পিল্লি, চেচক, ঘেঘ, বাওআসির, রাত-অন্ধ—

নন্দ। ও-সব কিছু বুবলুম না বাপু। আমার প্রাণটা ধড়ফড় করছে।

মুনসী। সো হি বোলেন। দিল তড়পনা। মোহর এনেছেন?

নন্দ। মোহর?

মুনসী। হাকিম সাহেব চাঁদি ছোন না। নজরানা দো মোহর। না থাকে আমি দিচ্ছি।

পর্যতালিশ টাকা, আর বাট্টা দো টাকা, আর রেশমী রুমাল দো টাকা। দরবারে যেয়ে আগে হুজুরকে বন্দাগি জনাব বোলবেন, তার পর রুমালের ওপর মোহর রেখে সামনে ধরবেন।

মুন্সী নন্দবাবুকে তালিম দিয়া দরবারে লইয়া গেল। একটি বৃহৎ ঘরে গালিচা পাতা, একপার্শ্বে মসনদের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া হাকিম সাহেব ফরসিতে ধূমপান করিতেছেন। বয়স পঞ্চাশ, বাবরী চুল, গোঁফ খুব ছোট করিয়া ছাটা। আবক্ষলম্বিত দাড়ির গোড়ার দিক সাদা, মধো লাল, ডগায় নীল। পরিধান সাটিনের চুড়িদার ইজার, কিংখাপের জোম্বা, জরির তাজ। সম্মুখে ধূপদানে মুসব্বর এবং রুমী মস্তাগি জ্বলিতেছে, পাশে পিকদান, পানদান, আতরদান ইত্যাদি। চার-পাঁচজন পারিষদ হাঁটু মূড়িয়া বাসিয়া আছে এবং হাকিমের প্রতি কথায় 'কেরামত' বলিতেছে। ঘরের কোণে একজন ঝাঁকড়া-চুলো চাপ-দেড়ে লোক সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং এবং বিকট অঙ্গভঙ্গী করিতেছে।



হুজুরি পিল্পিলায় গয়া

নন্দবাবু অভিবাদন করিয়া মোহর নজর দিলেন। হাকিম ঈষৎ হাসিয়া আতরদান হইতে কিঞ্চিৎ তুলা লইয়া নন্দর কানে গুঁজিয়া দিলেন। মুন্সী বলিল—‘আপনি বাংলায় বাতচিৎ বোলেন। আমি হুজুরকে সম্মুখে দিব।’

নন্দবাবুর ইতিবৃত্ত শেষ হইলে হাকিম ঋষভকণ্ঠে বলিলেন—‘সব্ লাও!’

নন্দ শিহরিয়া উঠিলেন। মুনসী আশ্বাস দিয়া বলিল—‘ডরবেন না মশয়। জনাবকে আপনার শির দেখুন।’

নন্দর মাথা টিপিয়া হাকিম বলিলেন—‘হাউ পিল্পিলায় গয়া।’

মুনসী। শুনছেন? মাথার হাড় বিলকুল লরম হয়ে গেছে।

হাকিম তিনরঙা দাড়িতে আঙুল চালাইয়া বলিলেন—‘সুখী সুখী’।

একজন একটা লাল গুড়া নন্দর চোখের পল্লবে লাগাইয়া দিল। মুনসী বুঝাইল—‘আঁখ ঠান্ডা থাকবে, নিদ হোবে।’ হাকিম আবার বলিলেন—‘রোগন বন্দর।’ মুনসী হাঁকিল—‘এ জী বালবর, অস্তুরা লাও।’

নন্দবাবু—‘হাঁ-হাঁ আরে তুম করো কি’—বলিতে বলিতে নাপিত চট্ করিয়া তাহার বক্ষতালুর উপর দু-ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ কামাইয়া দিল, আর একজন তাহার উপর একটা দুর্গন্ধ প্রলেপ লাগাইল। মুনসী বলিল—‘ঘব্‌ডান কেন মশয়, এ হচ্ছে বন্দরী সিংগির মাথার ঘি। বহুত কিম্মত। মাথার হাউ সক্ত হোবে।’

নন্দবাবু কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব অবস্থায় রহিলেন। তার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া বেগে ঘর হইতে পলায়ন করিলেন। মুনসী পিছনে ছুটিতে ছুটিতে বলিল—‘হামার দস্তুরি? নন্দ একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া তিন লাফে নীচে নামিয়া গাড়িতে উঠিয়া কোচমানকে বলিলেন—‘হাকীও!’

সন্ধ্যাকালে বন্ধুগণ আসিয়া দেখিলেন বৈঠকখানার দরজা বন্ধ। চাকর বলিল, বাবুর বড় অসুখ, দেখা হইবে না। সকলে বিষম্ভ্রান্তে ফিরিয়া গেলেন।

সমস্ত রাত বিছানায় ছটফট করিয়া ভোর চারটার সময় নন্দবাবু ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর বন্ধুগণের পরামর্শ শুনবেন না, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিবেন।

বেলা আটটার সময় নন্দ বাড়ি হইতে বাহির হইলেন এবং বড় রাস্তায় ট্যাক্সি ধরিয়া বলিলেন—‘সিধা চলো।’ সংকল্প করিয়াছেন, মিটারে এক টাকা উঠিলেই ট্যাক্সি হইতে নামিয়া পড়িবেন, এবং কাছাকাছি যে চিকিৎসক পান তাহারই মতে চলিবেন—তা সে আলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ, হাতুড়ে, অবধূত, মাদ্রাজী বা চাঁদসীর ডাক্তার যেই হউক।

বউবাজারে নামিয়া একটি গলিতে ঢুকিতেই সাইনবোর্ড নজরে পড়িল—‘ডাক্তার মিস বি, মল্লিক।’ নন্দবাবু ‘মিস’ শব্দটি লক্ষ্য করেন নাই, নতুবা হয়তো ইতস্ততঃ করিতেন। একেবারে সোজা পরদা ঠেলিয়া একটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

মিস বিপূলা মল্লিক তখন বাহিরে বাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া কাঁধের উপর সেফটি-পিন আঁটতেছিলেন। নন্দকে দেখিয়া মুনসীবরে বলিলেন—‘কি চাই আপনার?’

নন্দবাবু প্রথমটা অপ্রস্তুত হইলেন, তার পর মরিয়া হইয়া ভাবিলেন—‘দূর হ’ক, না-হয় লেডি ডাক্তারের পরামর্শই নেব। বলিলেন—‘বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।’

মিস মল্লিক। পেন আরন্ড হয়েছে?

নন্দ। পেন তো কিছু টের পাচ্ছি না।

মিস। ফাস্ট কনফাইনমেন্ট?

নন্দ। আঙ্কে?

মিস। প্রথম পোয়াতী?

নন্দ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—‘আমি নিজের চিকিৎসার জন্যই এসেছি।’

মিস মল্লিক আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—‘নিজের জন্যে? ব্যাপার কি?’



সমগ্র ইতিহাস বর্ণনা শেষ হইলে মিস মল্লিক নন্দবাবুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দু-চারটি প্রশ্ন করিয়া কহিলেন—‘আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?’

নন্দ। শ্রীনন্দদুলাল মিত্র।

মিস। বাড়িতে কে আছেন?

নন্দ জানাইলেন তিনি বহুদিন বিপন্নীক, বাড়িতে এক বৃদ্ধা পিসী ছাড়া কেউ নাই।

মিস। কাজকর্ম কি করা হয়?

নন্দ। তা কিছু করি না। পৈতৃক সম্পত্তি আছে।

মিস। মোটর-কার আছে?

নন্দ। নেই তবে কেনবার ইচ্ছে আছে।

মিস মল্লিক আরও নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া কিছুক্ষণ ঠোঁটে হাত দিয়া চিন্তা করিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বামে দক্ষিণে ঘাড় নাড়িলেন।

নন্দ ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—‘দোহাই আপনার, সত্যি ক’রে বলুন আমার কি হয়েছে। টিউমার, না পাথুরি, না উদরী, না কালাজ্বর, না হাইড্রোফেবিয়া?’



দি আইডিয়া!

মিস মল্লিক হাসিয়া বলিলেন—‘কেন আপনি ভাবছেন? ও-সব কিছুই হয় নি। আপনার শব্দে একজন অভিভাবক দরকার।’

নন্দ অধিকতর কাতরকণ্ঠে বলিলেন—‘তবে কি আমি পাগল হয়েছি?’

মিস মল্লিক মৃদুবে রুমাল দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিলেন—‘ও ডিয়ার ডিয়ার

নো। পাগল হবেন কেন? আমি বলাঁছলুম, আপনার যত্ন নেবার জন্যে বাড়িতে উপযুক্ত লোক খাকা দরকার।

নন্দ। কেন পিসীমা তো আছেন।

মিস মল্লিক পদনরায় হাসিয়া বলিলেন—দি আইডিয়া! মাসীপিসীর কাজ নয়। যাক, আপাতত একটা ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে দেখবেন। বেশ মিষ্টি, এলাচের গন্ধ। এক হস্তা পরে আবার আসবেন।

...

...

...

নন্দাবদু সাত দিন পরে পদনরায় মিস বিপদলা মল্লিকের কাছে গেলেন। তার পর দু-দিন পরে আবার গেলেন। তার পর প্রত্যহ।



বিপদলানন্দ

তার পর একদিন নন্দাবদু পিসীমাতাকে 'কাশীধামে রওনা করাইয়া দিয়া মস্ত ঋজার করিলেন। এক ঝড়ি গল্‌দা চিংড়ি, এক ঝড়ি মটন, তদনুযায়ী ঘি, ময়দা, দই, সন্দেশ ইত্যাদি। বন্ধুদ্বগ' খুব খাইলেন। নন্দাবদু জরিপাড় স্কন্ধু ধুতির উপর সিলেকের পীজাবি পরিয়া সলজ্জ সস্মিতমুখে সকলকে আপ্যায়িত করিলেন।

মিসেস বিপদলা মিত্র এখন আর স্বামী ভিন্ন অপর রোগীর চিকিৎসা করেন না। তবে নন্দাবদু ভালই আছেন। মোটর-কার কেনা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, সান্থা আন্ডারটি ভাঙিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩৩০ (১৯২৩)



বক্তৃতা-গৃহ। উচ্চ বেদীর উপর আচার্যের আসন। বেদীর নীচে ছাত্রদের জন্য শ্রেণীবদ্ধ  
চেয়ার ও বেঞ্চ।  
প্রথম শ্রেণীতে আছেন—

হোমরাও সিং  
চোমরাও আলি  
খুদীন্দনারায়ণ  
মিস্টার গ্র্যাব  
মিস্টার হাউলার  
ইত্যাদি

মহারাজা  
নবাব  
জমিদার  
বণিক  
সম্পাদক

দ্বিতীয় শ্রেণীতে—

মিস্টার গুহা  
নিতাইবাবু  
প্রফেসর গুই  
রূপচাঁদ  
লুটবেহারী

রাজনীতিজ্ঞ  
সম্পাদক  
অধ্যাপক  
বণিক  
ইনসলভেন্ট

গট্টালাল  
ভেওয়ারী  
ইত্যাদি

গেঁড়াভলার সদার  
জমাদার

তৃতীয় শ্রেণীতে—

মিস্টার গুস্তা  
সরেশচন্দ্র  
নিরেশচন্দ্র  
দীনেশচন্দ্র  
ইত্যাদি

বিশেষজ্ঞ  
নতুন প্রাক্কুরেট  
এ  
কোরানী

চতুর্থ শ্রেণীতে—

পাঁচুমিয়া  
গবেশ্বর  
কাঙালীচরণ

মজুর  
মাস্টার  
নিষ্কর্মা

আরও অনেক লোক

প্রথম শ্রেণীর কথা

মিস্টার গ্র্যাব। হ্যাঙ্গো মহারাজা, আপনিও দেখছি ক্লাসে জয়েন করেছেন।

হোমরাও সিং। হাঁ, ব্যাপারটা জানবার জন্য বড়ই কৌতূহল হয়েছে। আচ্ছা, এই জগদগুরু লোকটি কে?

গ্র্যাব। কিছুই জানি না। কেউ বলে, এ'র নাম ভ্যান্ডারলুট, আমেরিকা থেকে এসেছেন; আবার কেউ বলে, ইনিই প্রফেসার ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। ফাদার ওরায়েন সেদিন বলছিলেন, লোকটি devil himself—শয়তান স্বয়ং। অথচ রেভারেন্ড ফিগ্‌স বলেন, ইনি পৃথিবীর বিজ্ঞতম ব্যক্তি, একজন সুপারম্যান। একটা কমপ্লিমেন্টারি টিকিট পেয়েছি, তাই মজা দেখতে এলাম।

মিস্টার হাউলার। আমিও একথানা পেয়েছি।

হোমরাও। বটে? আমরা তো টাকা দিয়ে কিনেছি, তাও অতি কষ্টে। হয়তো জগদগুরু জানেন যে আপনাদের শেখবার কিছু নেই, তাই কমপ্লিমেন্টারি টিকিট দিয়েছেন।

খুদীন্দ্রনারায়ণ। শুনছি লোকটি নাকি বাঙালী, বিলাত থেকে ভোল ফিরিয়ে এসেছে। আচ্ছা, বলশেভিক নয় তো?

চোমরাও আলি। না না, তা হ'লে গভর্নমেন্ট এ লেকচার বন্ধ করে দিতেন। আমার মনে হয়, জগদগুরু তুর্কি থেকে এসেছেন।

হাউলার। দেখাই যাবে লোকটি কে!

## মহাবিদ্যা

### দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা

নিতাইবাবু। জগদগুরু কোথায় উঠেছেন জানেন কি? একবার ইন্টারভিউ করতে যাব।  
মিস্টার গুহা। শুনছি, বেঙ্গল ক্লাবে আছেন।

রূপচাঁদ। না—না, আমি জানি, পগেরাপটিতে বাসা নিয়েছেন।

লুটেবেহারী। আচ্ছা উনি যে মহাবিদ্যার ক্লাস খুলেছেন, সেটা কি? ছেলেবেলায় তো  
পড়েছিলুম—কালী, তারা, মহাবিদ্যা—

প্রফেসার গুহা। আরে, সে বিদ্যা নয়। মহাবিদ্যা—কিনা সকল বিদ্যার সেরা বিদ্যা, যা  
আয়ত্ত হ'লে মানুষের অসীম ক্ষমতা হয়, সকলের উপর প্রভুত্ব লাভ হয়।

রূপচাঁদ। এখানে তো দেখছি হাজারো লোক লেকচার শুনতে এসেছে। সকলেরই যদি  
প্রভুত্ব লাভ হয় তবে ফরমাশ খাটবে কে?

গাট্টালাল। এইজন্যে ভাবছেন? আপনি হুকুম দিন, আমি আর তেওয়ারী দুই দোস্ত  
মিলে সবাইকে হাঁকিয়ে দিচ্ছি। কিছু পান খেতে দেন—

তেওয়ারী। না—না, এখন গন্ডগোল বাধিও না,—সাহেবরা রয়েছেন।

### তৃতীয় শ্রেণীর কথা

সরেশ। আপনিও বড়ি এই বৎসর পাস করেছেন? কোন লাইনে যাবেন, ঠিক করলেন?  
নিরেশ। তা কিছুই ঠিক করিনি। সেইজন্যই তো মহাবিদ্যার ক্লাসে ভর্তি হয়েছি,—  
যদি একটা রাস্তা পাওয়া যায়। আচ্ছা এই কোর্স অভ লেকচার্স আয়োজন করলে কে?

সরেশ। কি জানি মশায়। কেউ বলে, বিলাতের কোনও দয়ালু ক্লোরপতি জগদগুরুকে  
পাঠিয়েছেন। আবার শুনতে পাই, ইউনিভার্সিটিই নাকি লুর্কিয়ে এই লেকচারের খরচ  
যোগাচ্ছে।

মিস্টার গুহা। ইউনিভার্সিটির টাকা কোথা? যেই টাকা দিক, মিথ্যে অপব্যয় হচ্ছে।  
এ রকম লেকচারে দেশের উন্নতি হবে না। ক্যাপিটাল চাই, ব্যবসা চাই।

দীনেশ। তবে আপনি এখানে এলেন কেন? এইসব রাজা-মহারাজাই বা কি জন্য ক্লাস  
অ্যাটেন্ড করছেন? নিশ্চয়ই একটা লাভের প্রত্যাশা আছে। এই দেখুন না, আমি সামান্য  
মাইনে পাই, তবু ধার করে লেকচারের ফী জমা দিয়েছি—যদি কিছু অবস্থার উন্নতি করতে  
পারি।

সরেশ। জগদগুরু আসবেন কখন? ঘণ্টা যে কাবার হয়ে এল।

### চতুর্থ শ্রেণীর কথা

গবেশ্বর। কিহে পাঁচুমিয়া, এখানে কি মনে করে?

পাঁচুমিয়া। বাবুজী, এক টাকা রোজ্ঞে আর দিন চলে না। তাই খারিরা-লোটা বেচে  
একটা টিকিট কিনেছি, যদি কিছু হৃদিস পাই। তা আপনারা এত পিছে বসেছেন কেন  
হুজুর? সামনে গিয়ে বাবুদের সাথ বসুন না!

কাঙালীচরণ। ভয় করে।

গবেশ্বর। আমরা বেশ নিরিবিলিতে আছি। দেখ পাঁচু, তুমি যদি বক্তৃতার কোনো  
মাসগা বুদ্ধতে না পার তো আমাদের জিজ্ঞাসা করো।

ঘণ্টাধনি। জগদগুরু প্রবেশ। মাথায় সোনার মুকুট, মুখে মুখোশ, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা। তিনি আসিয়া বহির্বাস খুলিয়া ফেলিলেন। মাথা কামানো, গায়ে তেল, পরনে লেংটি, ডান-হাতে বরাভর, বাঁ-হাতে সিঁধকাটি। পট্, পট্ হাততালি।

হোমরাও। লোকটির চেহারা কি বীভৎস! চেনেন নাকি মিস্টার গ্রাব?

গ্রাব। চেনা চেনা বোধ হচ্ছে।

জগদগুরু। হে ছাত্রগণ, তোমাদের আশীর্বাদ করছি জগজ্জয়ী হও। আমি যে-বিদ্যা শেখাতে এসেছি তার জন্য অনেক সাধনা দরকার—তোমরা একদিনে বুঝতে পারবে না। আজ আমি কেবল ভূমিকামাত্র বলব। হে বালকগণ, তোমরা মন দিয়ে শোন—যেখানে খটকা ঠেকবে, আমাকে নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করবে।

প্রফেসর গুই। আমি স্তব্ধলি আপত্তি করছি—জগদগুরু কেন আমাদের ‘বালকগণ—তোমরা’ বলবেন? আমরা কি স্কুলের ছেঁকরা? এটা একটা রেস্পেক্টেবল গ্যাদারিং। এই মহারাজা হোমরাও সিং, নবাব চোমরাও আলি রয়েছেন। পদমর্যাদা যদি না ধরেন, বয়সের একটা সম্মান তো আছে। আমাদের মধ্যে অনেকের বয়স ষাট পেরিয়েছে।

হাউলার। আপনাদের বাংলা ভাষার দোষ। জগদগুরু, বিদেশী লোক, ‘আপনি’ ‘তুমি’ গুলিয়ে ফেলেছেন। আর ‘বালক’ কথাটা কিছু নয়, ইংরেজীর ওল্ড বয়।

খুদীন্দ্র। বাংলা ভাল না জানেন তো ইংরেজীতে বলুন না।

গুই। যাই হ’ক আমি আপত্তি করছি।

মিস্টার গুহা। আমি আপত্তির সমর্থন করছি।

জগদগুরু (সহাস্যে)। বৎস, উতলা হলো না। আমি বাংলা ভালই জানি। বাংলা, ইংরেজী, ফরাসী, জাপানী, সবই আমার মাতৃভাষা। আমি প্রবীণ লোক, দশ-বিশ হাজার বৎসর ধরে এই মহাবিদ্যা শেখাচ্ছি। তোমরা আমার স্নেহের পাত্র, ‘তুমি’ বলবার অধিকার আমার আছে।

লুটেবেহারী। নিশ্চয় আছে। আপনি আমাদের ‘তুমি, তুই’—যা খুশি বলুন। আমি ও-সব গ্রাহ্য করি না। মোদ্দা, শেষকালে ফাঁকি দেবেন না।

জগদগুরু। বাপ, আমি কোনও জিনিস দিই না, শুধু শেখাই মাত্র। যা হ’ক, তোমাদের দেখে আমি বড়ই প্রীত হয়েছি। এমন-সব সোনার চাঁদ ছেলে—কেবল শিক্ষার অভাবে উন্নতি করতে পারছে না!

মিস্টার গুপ্টা। ভাগ্যতা ছেড়ে কাজের কথা বলুন।

জগদগুরু। হে ছাত্রগণ, মহাবিদ্যা না জানলে মানুুষ সুসভ্য ধনী মানী হতে পারে না, তাকে চিরকাল কাঠ কাটতে আর জল তুলতে হয়। কিন্তু এটা মনে রেখো যে, সাধারণ বিদ্যা আর মহাবিদ্যা এক জিনিস নয়। তোমরা পদ্যপাঠে পড়েছ—

এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে বেড়ে,

যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।

এই কথা সাধারণ বিদ্যা সম্বন্ধে খাটে, কিন্তু মহাবিদ্যার বেলায় নয়। মহাবিদ্যা কেবল নিতান্ত অন্তরঙ্গ জনকে অতি সন্তর্পণে শেখাতে হয়। বেশী প্রচার হ’লে সমূহ ক্ষতি। বিদ্যানে বিদ্যানে সংঘর্ষ হ’লে একটু বাক্যব্যয় হয় মাত্র, কিন্তু মহাবিদ্যান্দের ভিতর ঠোকাঠকি বাধলে সব চরমায়। তার সাক্ষী এই ইউরোপের যুদ্ধ। অতএব মহাবিদ্যান্দের একজোটে হয়েই কাজ করতে হবে।

## মহাবিদ্যা

হাউলার। আমি এই লেকচারে আপত্তি করছি। এদেশের লোকে এখনও মহাবিদ্যালান্দের উপযুক্ত হয় নি। আর আমাদের মহাবিদ্বান্‌রা দেশী মহাবিদ্বান্‌দের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারবে না। মিথ্যা একটা অশান্তির সৃষ্টি হবে।

গ্র্যাব। চুপ কর হাউলার। মহাবিদ্যা শেখা কি এ দেশের লোকের কর্ম? লেকচার শুনে হুজুকে পড়ে যদি মহাবিদ্যা নিয়ে লোকে একটু ছেলেখেলা আরম্ভ করে, মন্দ কি? একটু অন্যদিকে ডিসট্রাকশন হওয়া দেশের পক্ষে এখন দরকার হয়েছে।

হাউলার। সাধারণ বিদ্যা যখন এদেশে প্রথম চালানো হয় তখনও আমরা ব্যাপারটাকে ছেলেখেলা মনে করেছিলুম। এখন দেখছ তো ঠেলা? জোর করে টেন্ড্রট বুক থেকে এটা-সেটা বাদ দিয়ে কি আর সামলানো যাচ্ছে?

খুদীন্দু। মিস্টার হাউলার ঠিক বলেছেন। আমারও ভাল ঠেকছে না।

চোমরাও আলি। ভাল-মন্দ গভর্নমেন্ট বিচার করবেন। তবে মহাবিদ্যা যদি শেখাতেই হয়, মুসলমানদের জন্য একটা আলাদা ব্যবস্থা করা দরকার।

হোমরাও। অর্ডার, অর্ডার।

জগদগুরু। সাধারণ বিদ্যা মোটামুটি জানা না থাকলে মহাবিদ্যার ভাল রকম ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না। পাশ্চাত্য দেশে দুই বিদ্যার মণিকাণ্ড যোগ হয়েছে। এ-দেশেও যে মহাবিদ্বান্‌ নেই, তা নয়—

গাঁট্টালাল। হুঁ হুঁ গুরুজী আমাকে মালুম করছেন।

রূপচাঁদ। দূর, তোকে কে চেনে? আমার দিকে চাইছেন।

জগদগুরু। তবে মুখ লোকে মহাবিদ্যার প্রয়োগটা আত্মসম্ভ্রম বাঁচিয়ে করতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশ এ বিষয়ে অত্যন্ত উন্নত। জরির খাপের ভিতর যেমন তলোয়ার ঢাকা থাকে, মহাবিদ্যাকেও তেমন সাধারণ বিদ্যা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। মহাবিদ্যার মূলসুত্রই হচ্ছে—যদি না পড়ে ধরা।

প্রফেসর গুই। আপনি কী সব খারাপ কথা বলছেন!

অনেকে। শেম, শেম।

জগদগুরু। বৎস, লজ্জিত হয়ে না। তোমাদেরই এক পণ্ডিত বলেন—একাং লজ্জাং পরিতাজা ত্রিভুবনবিজয়ী ভব। যদি মহাবিদ্যা শিখতে চাও তবে সত্যের উল্গা মূর্তি দেশে ডরালে চলবে না। যা বলছিলাম শোন।—এই মহাবিদ্যা যখন মানুষ প্রথমে শেখে তখন সে আনাড়ী শিকারীর মত বিদ্যার অপপ্রয়োগ করে। যেখানে ফাঁদ পেতে কার্যসিদ্ধি হতে পারে সেখানে সে কুপ্তি লড়ে বাঘ মারতে যায়। দু-চারটে বাঘ হয়তো মরে; কিন্তু শিকারীও শেষে ঘায়েল হয়। বিদ্যার্গুস্তর অভাবেই এই বিপদ হয়। মানুষ যখন আর একটু চালাক হয়, তখন সে ফাঁদ পাততে আরম্ভ করে, নিজেকে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু গোটাকতক বাঘ ফাঁদে পড়লেই আর সব বাঘ ফাঁদ চিনে ফেলে, আর সেদিকে আসে না, আড়াল থেকে টিটকারি দেয়, শিকারীরও ব্যবসা বন্ধ হয়। ফাঁদটা এমন হওয়া চাই যেন কেউ ধরে না ফেলে। মহাবিদ্যাও সেই রকম গোপন রাখা দরকার। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো নিজের অজ্ঞাত-সারে কেবল সংস্কারবশে মহাবিদ্যার প্রয়োগ কর। এতে কখনও উন্নতি হবে না। পরের কাছে প্রকাশ করা নিষেধ; কিন্তু নিজের কাছে লুকোলে মহাবিদ্যায় মরচে পড়বে। সজ্ঞানে ফলাফল বুঝে মহাবিদ্যা চালাতে হয়।

গুই। বড়ই গোলমেলে কথা।

লুটেবহারী। কিছু না, কিছু না। জগদগুরু নতুন কথা আর কি বলছেন। প্র্যাক্টিস আমার সবই জানা আছে, তবে থিওরিটা শেখবার তেমন সময় পাইনি।

গুহা। এতদিন ছিলে কোথা হে?

লুটবেহারী। শব্দরবাড়ি। সেদিন খালাস পেয়েছি।

গুহা। নাঃ, তোমার দ্বারা কিছু হবে না। এই তো ধরা দিয়ে ফেললে।

লুটবেহারী। আপনাকে বলতে আর দোষ কি! দু-জনেই মহাবিদ্বান্, মাসভুতো ভাই। হোমরাও। অর্ডার, অর্ডার।

গুহা। আচ্ছা গুরুদেব, মহাবিদ্যা শিখলে কি আমাদের দেশের সকলেরই উন্নতি হবে?

জগদ্গুরু। দেখ বাপু, পৃথিবীর ধনসম্পদ যা দেখছ, তার একটা সীমা আছে, বেশী বাড়ানো যায় না। সকলেই যদি সমান ভাগে পায়, তবে কারও পেট ভরে না। যে জিনিস সকলেই অবাধে ভোগ করতে পারে, সেটা আর সম্পত্তি বলে গণ্য হয় না। কাজেই জগতের বাবস্থা এই হয়েছে যে জনকতক ভোগদখল করবে, বাকি সবাই যুগিয়ে দেবে। চাই গুটিকতক মহাবিদ্বান্ আর একগাদা মহামুখ।

খুদীন্দ্র। শুনছেন মহারাজা? এই কথাইতো আমরা বরাবর বলে আসছি। আরিস্টোক্রাসি না হ'লে সমাজ টিকবে কিসে? লোকে আবার আমাদের বলে মুখ—অযোগ্য। হুঁঃ!

জগদ্গুরু। ভাল বুঝলে বৎস। তোমার পূর্বপুরুষরাই মহাবিদ্বান্ ছিলেন, তুমি নও। তুমি কেবল অতীতে অর্জিত বিদ্যার রোমন্থন করছ। তোমার আশে-পাশে মহাবিদ্বান্‌রা ওত পেতে বসে আছেন। যদি তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না শেখ তবে শীঘ্রই গাদায় গিয়ে পড়বে।

প্রফেসর গুই। পরিষ্কার করেই বলুন না মহাবিদ্যাটা কি।

তৃতীয় শ্রেণী হতে। ব'লে ফেলুন সার, ব'লে ফেলুন। ঘণ্টা বাসতে বেশী দৌর নেই।

জগদ্গুরু। তবে বলা ছি শোন। মহাবিদ্যায় মানুষের জন্মগত অধিকার; কিন্তু একে ঘণ্টে মেজে পালিশ করে সভ্যসমাজের উপযুক্ত করে নিতে হয়। ক্রমোন্নতির নিয়মে মহাবিদ্যা এক স্তরে হ'তে উচ্চতর স্তরে পৌঁছেছে। জানিয়ে শুনিয়ে সোজাসজি কেড়ে নেওয়ার নাম ডাকাতি—

ছাত্রগণ। সেটা মহাপাপ—চাই না; চাই না।

জগদ্গুরু। দেশের জন্য যে ডাকাতি, তার নাম বীরত্ব—

ছাত্রগণ। তা আমাদের দিয়ে হবে না, হবে না!

হাউলার। Bally rot!

জগদ্গুরু। নিজে লুকিয়ে থেকে কেড়ে নেওয়ার নাম চুরি—

ছাত্রগণ। ছ্যা—ছ্যা, আমরা তাতে নেই, তাতে নেই।

লুটবেহারী। কিহে গট্টোলাল, চুপ করে কেন? সায় দাও না।

জগদ্গুরু। ভালমানুষ সেজে কেড়ে নিয়ে শেষে ধরা পড়ার নাম জুরাচুরি—

ছাত্রগণ। রাম কহ, তোবা, থঃ।

গুহা। কি লুটবেহারী, চোখ বুজে কেন?

জগদ্গুরু। আর যাতে ঢাক পিটিয়ে কেড়ে নেওয়া যায়, অথচ শেষ পর্যন্ত নিজের মানসসম্মত বজায় থাকে লোকে জয়-জয়কার করে—সেটা মহাবিদ্যা।

ছাত্রগণ। জগদ্গুরু কি জয়! আমরা তাই চাই, তাই চাই।

গুই। কিন্তু ঐ কেড়ে নেওয়া কথাটা একটু আপত্তিজনক।

লুটবেহারী। আপনার মনে পাপ আছে, তাই খটকা বাধছে। কেড়ে নেওয়া পছন্দ না হয়, বলুন ভোগা দেওয়া।

গুই। কে হে বেহায়া তুমি? তোমার কনশেন্স নেই?



## মহাবিদ্যা

জগদ্গুরু। বৎস, কেড়ে নেওয়াটা রূপক মাত্র। সাদা কথায় এর মানে হচ্ছে—সংসারের মঙ্গলের জন্য লোককে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিছু আদায় করা।

লুটবেহারী। আমার তো সবে একটি সংসার। কিছু আদায় করতে পারলেই ছুঁল-বছল। নবাবসাহেবের বরণ—

হোমরাও। অর্ডার, অর্ডার।

গুই। দেখুন জগদ্গুরু, আমার দ্বারা বিবেক-বিরুদ্ধ কাজ হবে না। কিন্তু ঐ যে আপনি বললেন—সংসারের মঙ্গলের জন্যে, সেটা খুব মনে লেগেছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—

লুটবেহারী। মশায়, ভগবান বোচারায়ে নিয়ে যখন-তখন টানাটানি করবেন না, চটে উঠবেন।

নিতাই। আচ্ছা, সকলেই যদি মহাবিদ্যা শিখে ফেলে তা হলে কি হবে?

জগদ্গুরু। সে ভয় নেই। তোমরা প্রত্যেকে যদি প্রাণপণে চেষ্টা কর, তা হলেও কেবল দু-চারজন ওতরাতে পার।

সরেশ। সার, একবার টেস্ট ক'রে নিন না।

জগদ্গুরু। এখন পরীক্ষা করলে বিশেষ ভাল ফল পাওয়া যাবে না। অনেক সাধনা দরকার।

নিরেশ। কিছু-মার্কও কি পাব না?

জগদ্গুরু। কিছু-কিছু পাবে বই কি। কিন্তু তাতে এখন ক'রে-খেতে পারবে না।

নিরেশ। তবে না হয় আমাদের কিছু হোম-একসারসাইজ দিন।

জগদ্গুরু। বাড়িতে তো সুবিধা হবে না বাছা। এখন তোমরা নিতান্ত অপোগন্ড। দিনকতক দল বেঁধে মহাবিদ্যার চর্চা কর।

খুদীন্দ্র। ঠিক বলেছেন। আসুন মহারাজ, আপনি আমি আর নবাবসাহেব মিলে একটা আসোসিয়েশন করা যাক।

প্রফেসর গুই। আমাকেও নেবেন, আমি স্পীচ লিখে দেব।

মিস্টার গুহ। নিতাইবাবু, আমি ভাই তোমার সঙ্গে আছি।

লুটবেহারী। আমি একাই এক শ। তবে রূপচাঁদবাবু যদি দয়া ক'রে সঙ্গে নেন।

রূপচাঁদ। খবরদার, তুমি তফাত থাক।

লুটবেহারী। বটে? তোমার মত ঢের-ঢের বড়লোক দেখেছি।

গাঁটলাল। আমরা কারও তোয়াক্কা রাখি না—কি বল তেওয়ারীজী?

মিস্টার গুপ্টা। ভাবনা কি সরেশবাবু, নিরেশবাবু। আমি টেকনিক্যাল ক্লাস খুলছি, ভর্তি হ'ন। তরল অলতা, গোলাবী বিড়ি, ঘাড়ি-মোরামত, ঘুড়ি-মোরামত, দাঁত-বাঁধানো, থামা-বাঁধানো সব শিখিয়ে দেব।

দীনেশ। গুরুদেব, চুপি-চুপি একটা নিবেদন করতে পারি কি?

জগদ্গুরু। বল বৎস।

দীনেশ। দেখুন, আমি নিতান্তই মরুদ্বীপী। মহাবিদ্যার একটা সোজা তুকতাক—বেশী নয়, যাতে লাখ-খানেক টাকা আসে—যদি দয়া ক'রে গরিবকে শিখিয়ে দেন।

জগদ্গুরু। বাপো, তোমার গতিক ভাল বোধ হচ্ছে না। মহাবিদ্যান্ অপরকেই তুকতাক শেখায়—নিজে ও সবে বিশ্বাস করে না।

দীনেশ। টিকিটের টাকাটাই নষ্ট। তার চেয়ে ডার্বার টিকিট কিনলে বরং কিছুদিন আশা আশায় কাটাতে পারতুম।

গণেশ্বর। আমার কি হবে প্রভু? কেউ যে দলে নিচ্ছে না।

জগদ্‌গুরু। তুমি ছেলে তৈরি কর। তাদের শেখাও—মহাবিদ্যা শেখে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে।

পাঁচু'মিয়া। আমার কি করলেন ধর্মাবতার?

জগদ্‌গুরু। তুমি এখানে এসে ভাল করনি বাপু। তোমার গুরু রুশিয়া থেকে আসবেন, এখন ধৈর্য ধরে থাক।

গুহা। দশহাজার টাকা চাঁদা তুলতে পারিস? ইউনিয়ন খুলে এমন হুড়ো লাগাব যে এখনি তোদের মজুরি পাঁচগুণ হয়ে যাবে।

মিস্টার গ্যাব। সাবধান, আমার চটকলের ত্রিসীমানার মধ্যে যেন এস না।

গুহা। (চুপি চুপি) তবে আপনার বাড়ি গিয়ে দেখা করব কি?

কাঙালীচরণ। দেবতা আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

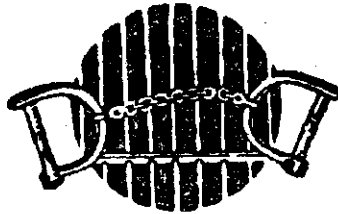
জগদ্‌গুরু। তোমার আবার কি চাই? ব'লে ফেল।

কাঙালী। যদি কখনও মহাবিদ্যা ধরা পড়ে যায়, তখন অবস্থাটা কি রকম হবে?

জগদ্‌গুরু। (ঈষৎ হাসিমা বেদী হইতে নামিয়া পড়িলেন)।

ঘণ্টা ও কোলাহল

ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩২৯ ( ১৯২২ )





বায় বংশলোচন বানার্জি বাহাদুর ভূমিন্দার অ্যান্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বেগোঘাটা-বেণ্ড প্রত্যহ বৈকালে খালের ধারে হাওয়া খাইতে যান। চল্লিশ পার হইয়া ইনি একটু মোটা হইয়া পড়িয়াছেন। সেজন্য ডাক্তারের উপদেশে হাঁটিয়া এক্সারসাইজ করেন এবং ভাত ও লুচি বর্জন করিয়া দু-বেলা কচুরি খাইয়া থাকেন।

কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া বংশলোচনবাবু ক্রান্ত হইয়া খালের ধারে একটা টাঁপার উপর রুমাল বিছাইয়া বসিয়া পড়িলেন। ঘড়ি দেখিলেন—সাড়ে-ছটা বাজিয়া গিয়াছে। জ্যেষ্ঠ মাসের শেষ। সিলোনে মনসুন পৌঁছিয়াছে। এখানেও যে-কোনও দিন হঠাৎ ঝড়-জল হওয়া বিচিত্র নয়। বংশলোচন উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া হাতের বর্মাচরুটে একবার জেরে টান দিলেন। এমন সময় বোধ হইল, কে যেন পিছু হইতে তাঁর জামার প্রান্ত ধরিয়া টানিতেছে এবং মিহি সুরে বলিতেছে—‘হু’ ‘হু’ ‘হু’ ‘হু’ ‘হু’ ফিরিয়া দেখিলেন—একটি ছাগল।

বেশ হুটপুটে ছাগল। কুচকুচে কালো নখর দেহ, বড় বড় লটপটে কানের উপর কাঁচ পটলের মত দুটি শিং বাহির হইয়াছে। বয়স বেশী নয়, এখনও অজাতশমশ্রু। বংশলোচন বলিলেন—‘আরে এটা কোথা থেকে এল? কার পাঠা? কাকেও তো দেখছি না।’

ছাগল উত্তর দিল না। কাছে ঘেঁষিয়া লোলুপনেত্র তাঁহাকে গর্বাৎসেক্ষণ করিতে লাগিল। বংশলোচন তাহার মাথায় ঠেলা দিয়া বলিলেন—‘খাঃ পালা, ভাগো হিঁয়াসে।’ ছাগল পিছনের

দুপায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, এবং সামনের দু-পা মড়াড়িয়া ঘাড় বাঁকাইয়া রায়বাহাদুরকে চুঁ মারিল।

রায়বাহাদুর ক্ষেত্রিক বোধ করিলেন। ফের ঠেলা দিলেন। ছাগল আবার খাড়া হইল এবং খপ করিয়া তাঁহার হাত হইতে চুরটুটি কাড়িয়া লইল। আহারান্তে বলিল—‘অর্-র্-র্-র্’ অর্থাৎ আর আছে?

বংশলোচনের সিগার-কেসে আর একটিমাত্র চুরটু ছিল। তিনি সেটি বাহির করিয়া দিলেন। ছাগলের মাথা-ঘোরা, গা-বামি বা অপর কোনও ভাব-বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইল না। দ্বিতীয় চুরটু নিঃশেষ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—‘অর্-র্-র্-র্?’ বংশলোচন বলিলেন—‘আর নেই! তুই এইবার যা। আমিও উঠি।’

ছাগল বিশ্বাস করিল না, পকেট তল্লাশ করিতে লাগিল। বংশলোচন নিরুপায় হইয়া চামড়ার সিগার-কেসটি খুলিয়া ছাগলের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—‘না বিশ্বাস হয়, এই দেখ্ বাপু।’ ছাগল এক লক্ষ্যে সিগার-কেস কাড়িয়া লইয়া চর্বণ আরম্ভ করিল। রায়বাহাদুর রাগিবেন কি হাসিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন—‘শুশালা।’

অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। আর দেরি করা উচিত নয়। বংশলোচন গৃহাভিমুখে চলিলেন। ছাগল কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। বংশলোচন বিব্রত হইলেন। কার ছাগল কি বৃত্তান্ত! তিনি কিছুই জানেন না, নিকটে কোনও লোক নাই যে জিজ্ঞাসা করেন। ছাগলটাও নাছোড়বান্দা, তাড়াইলে যায় না। অগত্যা বাড়ি লইয়া যাওয়া ভিন্ন গতান্তর নাই। পথে যদি মালিকের সন্ধান পান ভালই, নতুবা কাল সকালে যা হ’ক একটা ব্যবস্থা করিবেন।

বাড়ি ফিরিবার পথে বংশলোচন অনেক খোঁজ লইলেন, কিন্তু কেহই ছাগলের ইতিবৃত্ত বলিতে পারিল না। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া স্থির করিলেন যে আপাতত নিজেই উহাকে প্রতিপালন করিবেন।

হঠাৎ বংশলোচনের মনে একটা কাঁটা খচ করিয়া উঠিল। তাঁহার যে এখন পত্নীর সঙ্গে কলহ চলিতেছে। আজ পাঁচ দিন হইল কথা বন্ধ। ইহাদের দাম্পত্য কলহ বিনা আড়ম্বরে নিঃসৃত হয়। সামান্য একটা উপলক্ষ্য, দু-চারটি নাতিতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ, তার পর দিন কতক অহিংস অসহযোগ, বাক্যালাপ বন্ধ, পরিশেষে হঠাৎ একদিন সন্ধি-স্থাপন ও পুনর্মিলন। এরকম প্রায়ই হয়। বিশেষ উদ্বেগের কারণ নাই। কিন্তু আপাতত অবস্থাটি সুবিধাজনক নয়। গৃহিণী জন্তু-জানোয়ার মোটেই পছন্দ করেন না। বংশলোচনের একবার কুকুর পোষাদ শখ হইয়াছিল, কিন্তু গৃহিণীর প্রবল আপত্তিতে তাহা সফল হয় নাই। আজ একে কলহ চলিতেছে তার উপর ছাগল লইয়া গেলে আর রক্ষা থাকিবে না। একে মনসা, তায় ধূনার গন্ধ।

চলিতে চলিতে রায়বাহাদুর পত্নীর সহিত কাম্পনিক বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। একটা পাঁঠা পুঁষিবেন তাতে কার কি বলিবার আছে? তাঁর কি স্বাধীনভাবে একটা শখ মিটাইবার ক্ষমতা নাই? তিনি একজন মানাগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বেলেঘাটা রোডে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বিস্তর ভূসম্পত্তি। তিনি একজন খেতাবধারী অনারারি হার্কম,—পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, এক মাস পর্যন্ত জেল দিতে পারেন। তাঁহার কিসের দুঃখ, কিসের নার-ভস্মেন্দ? বংশলোচন বার বার মনকে প্রবোধ দিলেন—তিনি কাহারও তেয়াক্ক রাখেন না।

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় যে সাম্ভা আন্ডা বসে তাহাতে নিত্য বহুসংখ্যক রাজা-উজির বধ হইয়া থাকে। লাটসাহেব, সুরেন বাড়ীজ্যে, মোহনবাগান, পরমাখত্ব, প্রতিবেশী অধর-বুড়োর শ্রাদ্ধ, আলিপুরের নূতন কুমির—কোন প্রসঙ্গই বাদ যায় না। সম্প্রতি সাত

দিন ধরিয়া বাঘের বিষয় আলোচিত হইতেছিল। এই সুত্রে গতকলা বংশলোচনের শ্যালক নগেন এবং দূরসম্পর্কের ভাগিনেয় উদয়ের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়। অন্যান্য সভ্য অনেক কণ্ঠে তাহাদিগকে নিরস্ত করেন।

বংশলোচনের বৈঠকস্থান ঘরটি বেশ বড় ও সুসজ্জিত, অর্থাৎ অনেকগুলি ছবি, আয়না, আলমারি, চেয়ার ইত্যাদি জিনিসপত্রে ভরতি। প্রথমেই নজরে পড়ে একটি কাপেটে বোনা ছবি, কাল জমির উপর আসমানী রঙের বিড়াল। যুদ্ধের সময় বাজারে সাদা পশম ছিল না, সুতরাং বিড়ালটির এই দশা হইয়াছে। ছবির নীচে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লেখা—CAT। তার নীচে রচয়িত্রীর নাম—মানিনী দেবী। ইনিই গৃহকর্তা। ঘরের অপর দিকের দেওয়ালে একটি রাধাকৃষ্ণের তৈলচিত্র। কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া কদমতলায় দাঁড়াইয়া আছেন, একটি প্রকাণ্ড সাপ তাহাদিগকে পাক দিয়া পিষিয়া ফেলবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের দ্রষ্টব্য নাই; কারণ সাপটি বাস্তবিক সাপ নয়, ঠা-কার মাত্র। তা-ছাড়া কতকগুলি মেমের ছবি আছে, তাদের অঙ্গে সিলেকের স্নাকশাডি এবং মাথায় কাল সুতার আলমারিয়ায় পরচুলা ময়দার কাই দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের মুখের দূরন্ত মেম-মেম-ভাব ঢাকা পড়ে নাই, সেজন্য জোর করিয়া নাক বিংখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘরে দুটি দেওয়াল-আলমারিতে চীনেমাটির পতুল এবং কাচের খেলনা ঠাসা। উপরের শূইবার ঘরের চারিটি আলমারি বোঝাই হইয়া যাহা বাড়তি হইয়াছে তাহাই নীচে স্থান পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন আরও নানাপ্রকার আসবাব, যথা—রাজা-রানীর ছবি, রায়-বাহাদুরের পরিচিত ও অপরিচিত ছোট-বড় সাহেবের ফোটোগ্রাফ, গিলটির ফ্রেমে বাঁধানো আয়না, আলম্যানাক, ঘড়ি, রায়বাহাদুরের সনদ, কয়েকটি অভিনন্দনপত্র ইত্যাদি আছে।

আজ বথাসময়ে আড্ডা বসিয়াছে। বংশলোচন এখনও বেড়াইয়া ফেরেন নাই। তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিনোদ উকিল ফরাশের উপর ভাবিয়া ঠেস দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। বন্ধু কেদার চাটুজো মহাশয় হুঁকা হাতে বিনোদকে বলেন—‘নগেন ও উদয় অতি কণ্ঠে ক্রোধ বৃদ্ধ করিয়া ওত পাতিয়া বাঁসিয়া আছে, একটা ছুতা পাইলেই পরস্পরকে আক্রমণ করিবে।

আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া উদয় বলিল—‘যাই বল, বাঘের মাপ কখনই লাজ-সুস্থ হ’তে পারে না। তা হ’লে মেয়েছেলেদের মাপও চুল-সুস্থ হবে না কেন? আমার বউ-এর বিনুনিটাই তো তিনফুট হবে। তবে কি বলতে চাও, বউ আট ফুট লম্বা?’

নগেন বলিল—‘দেখ, উদো, তোর বউ-এর বর্ণনা আমরা মোটেই শুনতে চাই না। বাঘের কথা বলতে হয় বল।’

চাটুজো মহাশয়ের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। বলিলেন—‘আঃ হা, ভোমাদের এখানে কি বাঘ ছাড়া অন্য জানোয়ার নেই?’

এমন সময় বংশলোচন ছাগল লইয়া ফিরিলেন। বিনোদবাবু বলিলেন—‘বাহবা, বেশ পাঁঠাটি তো। কত দিয়ে কিনলে হে?’

বংশলোচন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। বিনোদ বলিলেন—‘বেওয়ারিস মাল, বেশী দিন ঘরে না রাখাই ভাল। সাবাড় ক’রে ফেল—কাল রবিবার আছে, লাগিয়ে দাও।’

চাটুজো মহাশয় ছাগলের পেট টিপিয়া বলিলেন—‘দাঁড় পুরুষ্টু পাঁঠা। খাসা কালিয়া হবে।’

নগেন ছাগলের উরু টিপিয়া বলিল—‘উহু, হাঁড়িকাঁবাব। একটু বেশী করে আদা-বাটা আর প্যাজ।’

উদয় বলিল—‘ওঃ, আমার বউ আয়সা গুলিকাবাব করতে জানে!’

নগেন ভ্রুকুটি করিয়া বলিল—‘উদো, আবার?’

বংশলোচন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—‘তোমাদের কি জন্তু দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে? একটা নিরীহ অনাথ প্রাণী আশ্রয় নিয়েছে, তা কেবল কালিয়া আর কাবাব!’

ছাগলের সংবাদ শুনিয়া বংশলোচনের সন্তম্ববসীয়া কন্যা টেপী এবং সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ঘেটু ছুটিয়া আসিল। ঘেটু বলিল—‘ও বাবা, আমি পাঠা খাব। পাঠার ম-ম-ম—’



‘দাঁড়ি পুরুঘটু পাঠা’

বংশলোচন বলিলেন—‘যা পাঠা, শূনে শূনে কেবল খাই খাই শিখছেন।’

ঘেটু হাত-পা ছুড়িয়া বলিল—‘হ্যাঁ আমি ম-ম-ম-মেটুলি খাব।’

টেপী বলিল—‘বাবা, আমি পাঠাকে পুষবো, একটু লাল ফিতে দাও না।’

বংশলোচন। বেশ তো একটু খাওয়া-দাওয়া করুক, তার পর নিয়ে খেলা করিস এখন।

টেপী। পাঠার নাম কি বল না?

বিলেদ বলিলেন—‘নামের ভাবনা কি। ভাস্করক, দাঁড়িমুখ, মসীপুচ্ছ, লম্বকর্ণ—’

চাটুজ্যো বলিলেন—‘লম্বকর্ণই ভাল।’

বংশলোচন কন্যাকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘টেপু, তোর মা এখন কি করছে রে?’

টেপী। একদুনি তো বল-ঘরে গেছে।

বংশলোচন। ঠিক জানিস? তা হ’লে এখন এক ঘণ্টা নিশ্চিন্দ। দেখ, ঝিকে বল, চট করে ঘোড়ার ভেজানো-ছোলা চাটি এনে এই বাইরের বাবান্দায় যেন ছাগলটাকে খেতে দেয়। আর দেখ, বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাস নি যেন।

উৎসাহের আতিশয্যে টেপী পিতার আদেশ জ্বলিয়া গেল। ছাগলের গলায় লাল ফিতা বাঁধিয়া টানিতে টানিতে অন্দরমহলে লইয়া গিয়া বলিল—‘ও মা, শীগগির এস, লম্বকর্ণ দেখবে এস।’

মাননী মূখ মূচ্ছিতে মূচ্ছিতে স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—‘আ মর, ওটাকে কে আনলে? দূর দূর—ও কি, ও বাতাসী, শীগগির ছাগলটাকে বার করে দে, ঝাটা মার।’

টেপী বলিল—‘বা রে, ওকে তো বাবা এনেছে, আমি পুষব।’

ঘেটু বলিল—‘ঘোড়া-ঘোড়া খেলব।’

মানিনী বলিলেন—‘খেলা বার ক’রে দিচ্ছ। ভন্দর লোকে আবার ছাগল পোষে! বেরো বেরো—ও দরওয়ান, ও চুকন্দর সিং—’

‘হজোর’ বলিয়া হাঁক দিয়া চুকন্দর সিং হাজির হইল! শীর্ণ খর্বাকৃতি বৃদ্ধ, গানপাটো দাড়ি, পাকানো গোঁফ, জাঁকালো গলা এবং ততোধিক জাঁকালো নাম—ইহারই জোরে সে চোট্টা এবং ডাকুর আক্ৰমণ হইতে দেউড়ি রক্ষা করে।



‘হজোর’

অন্দরের মধ্যে হট্টগোল শুনিয়া রায়বাহাদুর বুঝিলেন যুদ্ধ অনিবার্য। মনে মনে তাল ঝুঁকিয়া বাড়ির ভিতরে আসিলেন। গৃহিণী তাঁহার প্রতি দৃকপাত না করিয়া দরওয়ানকে বলিলেন—‘ছাগলটাকে আভি নিকাল দেও, একদম ফটকের বাইরে। নেই তো একদুনি ডিফট নোংরা করোগ।’

চুকন্দর বলিল—‘বহুত আচ্ছা।’

বংশলোচন পাণ্টা হুকুম দিলেন—দেখো চুকন্দর সিং, এই বর্কারি গেটের বাইরে যাগা তো তোমরা নোকরি ভি যাগা।’

চন্দ্রকন্দর বলিল—‘বহুত আচ্ছা।’

মানিনী স্বামীর প্রতি একটি অগ্নিময় নয়নবান হানিয়া বলিলেন—‘হ্যাঁলা টে’পী হতচ্ছাড়া, রাত্তির হয়ে গেল—গিলতে হবে না? থাকিস তুই ছাগল নিয়ে, কাল যাচ্ছি আমি হাটখোলায়।’ হাটখোলায় গা’হণীর পিতালয়।

বংশলোচন বলিলেন—‘টে’পু, ঝিকে ব’লে দে, বৈঠকখানা-ঘরে আমার শোবার বিছানা ক’রে দেবে। আমি সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। আর দেখ্ ঠাকুরকে বল আমি মাংস খাব না। শূদ্র খানকতক কচুরি, একটু ডাল আর পটলভাজা।’

**পু**রাকালে বড়লোকদের বাড়িতে একটি করিয়া গোসাঘর থাকিত। ক্রুশ্ণা আৰ্যনারীগণ সেখানে আশ্রয় লইতেন। কিন্তু আৰ্যপুত্রদের জন্য সে-রকম কোনও পাকা বন্দোবস্ত ছিল না অগত্যা তাঁহারা এক পত্নীর সহিত মতান্তর হইলে অপর এক পত্নীর দ্বারস্থ হইতেন। আজকাল খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়ায় এই সকল সুন্দর প্রাচীন প্রথা লোপ পাইয়াছে। এখন মেয়েদের ব্যবস্থা শুইবার ঘরের মেঝের উপর মাদুর অথবা তেমন তেমন হইলে বাপের বাড়ি। আর ভদ্রলোকদের একমাত্র আশ্রয় বৈঠকখানা।

আহারান্তে বংশলোচন বৈঠকখানা-ঘরে একাকী শয়ন করিলেন। অন্ধকারে তাঁর গুম হয় না, এজন্য ঘরের এক কোণে পিলসুজের উপর একটা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া বংশলোচন উঠিয়া ইলেকট্রিক লাইট জ্বালিলেন এবং একখানি গীতা লইয়া পড়িতে বসিলেন। এই গীতাটি তাঁর দুঃসময়ের সম্বল, পত্নীর সহিত অসহযোগ হইলে তিনি এটি লইয়া নাড়াচাড়া করেন এবং সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। কর্মযোগ পড়িতে পড়িতে বংশলোচন ভাবিতে লাগিলেন—তিনি কী এমন অন্যায্য কাজ করিয়াছেন যার জন্য মানিনী এরূপ ব্যবহার করেন? বাপের বাড়ি যাবেন—ইস, ভারী তেজ! তিনি ফিরাইয়া আনিবার নামটি করিবেন না, যখন গরজ হইবে আপনিই ফিরিবেন। গা’হণী শখ করিয়া যে-সব জঞ্জাল ঘরে পোরেন তা তো বংশলোচন নীরবে বরদাস্ত করেন। এই তো সেদিন পনেরটা জলচৌকি তেইশটা বর্টি এবং আড়াই শ টাকার খাগড়াই বাসনা কেনা হইয়াছে, আর দোষ হইল কেবল ছাগলের বেলা? হুঃ, যতো সব—। বংশলোচন গীতাখানি সরাইয়া রাখিয়া আলোর সুইচ বন্ধ করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে নাসিকাধূনি করিতে লাগিলেন।

লম্বকর্ণ বারান্দায় শুইয়া রোমন্থন করিতেছিল। দুইটা বর্ষা চুরটে খাইয়া তাহার ধূম চটিয়া গিয়াছে। রাত্রি একটা আন্দাজ জেরে হাওয়া উঠিল। ঠান্ডা লাগায় সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। বৈঠকখানা-ঘর হইতে মিটমিটে আলো দেখা যাইতেছে। লম্বকর্ণ তাহার বন্ধনরজ্জু চিবাইয়া কাটিয়া ফেলিল এবং দরজা খোলা পাইয়া নিঃশব্দে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

আবার তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া একবার তদারক করিয়া লইল। ফরাশের এক কোণে একগোছা খবরের কাগজ রহিয়াছে। চিবাইয়া দেখিল, অত্যন্ত নীরস। অগত্যা সে গীতার তিন অধ্যায় উদরস্থ করিল। গীতা খাইয়া গলা শুখাইয়া গেল। একটা উঁচ, তেপায়ার উপর এক কুঁজা জল আছে, কিন্তু তাহা নাগাল পাওয়া যায় না। লম্বকর্ণ তখন প্রদীপের কাছে গিয়া রেড়ির তেল চাখিয়া দেখিল, বেশ সুস্বাদু। চকচক করিয়া সবটা খাইল। প্রদীপ নিবিল।



বংশলোচন স্বপ্ন দেখিতেছেন—সম্মিষ্টস্থাপন হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ পাশ ফিরিতে তাঁহার একটা নরম গরম স্পন্দনশীল স্পর্শ অনুভব হইল। নিদ্রাবিজড়িত স্বরে বলিলেন—‘কখন এলে?’ উত্তর পাইলেন—‘হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।’

হুলস্থলে কাণ্ড। চোর—চোর—বাঘ হায়—এই চক্কন্দর সিং—জল্দি আও—নগেন—উদো—শীগাঁগর আয়—মেরে ফেললে—

চক্কন্দর তার মৃগেরা বন্দুকে বারুদ ভরিতে লাগিল। নগেন ও উদয় লাঠি ছাড়া টেনিস ব্যাট যা পাইল তাই লইয়া ছুটিল। মানিনী ব্যাকুল হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে নামিয়া আসিলেন। বংশলোচন ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। লম্বকর্ণ দু-এক ঘা মার খাইয়া ব্যা ব্যা করিতে লাগিল। বংশলোচন ভাবিলেন বাঘ বরুণ ছিল ভাল। মানিনী ভাবিলেন, ঠিক হয়েছে।

ওরবেলা বংশলোচন চক্কন্দরকে পাড়ায় খোঁজ লইতে বলিলেন—কোনও ভাল আদমী ছাগল পুষিতে রাজী আছে কি না। যে-সে লোককে তিনি ছাগল দিবে ন। এমন লোক চাই যে যত করিয়া প্রতিপালন করিবে, টাকার লোভে বেঁচিবে না, মাংসের লোভে মারিবে না।

আটটা বাজিয়াছে। বংশলোচন বহির্বাটীর বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া আছেন, নাপিত কামাইয়া দিতেছে। বিনোদবাবু ও নগেন অমৃতবাজারে ড্যালহাউসি ভার্সস মোহনবাগান পড়িতেছেন। উদয় ল্যাণ্ডা আমের দর করিতেছে। এমন সময় চক্কন্দর আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—‘লাটুবাবু, আয়ে হে?’

তিনজন সহচরের সহিত লাটুবাবু বারান্দায় আসিয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের বেশভূষা প্রায় একই প্রকার—ঘাড়ের চুল আমল ছাটা, মাথার উপর পর্বতাকার তেড়ি, রগের কাছে দু-গোছা চুল ফণা ধরিয়া আছে। হাতে রিস্ট-ওয়াচ গায়ে আগল্ফ-লম্বিত পাতলা পঞ্জাবি, তার ভিতর দিয়া গোলাপী গেঞ্জির আভা দেখা যাইতেছে। পায়ে লপেটা, কানে অর্ধদংশ সিগারেট।

বংশলোচন বলিলেন—‘আপনাদের কোথেকে আসা হচ্ছে?’

লাটুবাবু বলিলেন—‘আমরা বেলেঘাটা কেরাসিন ব্যান্ড। ব্যান্ড-মাস্টার লটবর লন্দী—অধীন। লোকে লাটুবাবু বলে ডাকে। শুনলুম আপনি একটি পাঠী বিলিয়ে দেবেন, তাই মঠিক খবর লিতে এসেছি।’

বিনোদ বলিলেন—‘আপনারা বুঝি কানেক্তারা বাজান?’

লাটু। কানেক্তারা কি মশায়? দস্তুরমত কলসাট। এই ইনি লবীন লিয়োগী ক্যারিয়নেট—এই লরহরি লাগ ফুলোট—এই লবকুমার লন্দন বায়লা। তা ছাড়া কলেট, পিকলু, হারমোনিয়া, ঢোল, কত্তালসব নিয়ে উলিশজন আছি। বর্মী অয়েল কোম্পানির ডিপোয় আমরা কাজ করি। ছোট-সাহেবের সেদিন বে হ’ল, ফিল্ট দিলে, আমরা বাজালুম, সাহেব খুশী হয়ে টাইটিল দিলে—কেরাসিন ব্যান্ড।

বংশলোচন। দেখুন আমার একটি ছাগল আছে সেটি আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু—লাটু। আমরা হলুম উলিশটি প্রালী, একটা পাঠায় কি হবে মশায়? কি বল হে লরহরি?

নরহরি। লসি, লসি।

বংশলোচন। আমি এই শর্তে দিতে পারি যে ছাগলটিকে আপনি যত করে মানুষ করবেন, বেচতে পারেন না, মারতে পারবেন না।

লাটু। এ যে আপনি লতুন কথা বলছেন মশায়। ভন্দর নোকে কখনও ছাগল পোষে? নরহরি। পাঠী লয় যে দুধ দেবে।

নবীন। পাখি লয় যে পড়বে।

নবকুমার। ভেড়া লয় যে কম্বল হবে।

বংশলোচন। সে যাই হোক। বাজে কথা বলবার আমার সময় নেই। নেবেন কি না বলুন।

লাটুবাবু ঘাড় ঢুলকাইতে লাগিলেন। নরহরি বললেন—‘লিয়ে লাও হে লাটুবাবু, লিয়ে লাও। ভন্দর নোক বলছেন অত ক’রে।’

বংশলোচন। কিন্তু মনে থাকে যেন, বেচতে পারবে না, কাটতে পারবে না।

লাটু। সে আপনি ভাববেন না। লাটু, লন্দীর কথার লড়চড় লেই।

লম্বকর্ণকে লইয়া বেলেঘাটা কেরাসিন ব্যান্ড চালিয়া গেল। বংশলোচন বিমর্ষচিত্তে বলিলেন—‘বাটাদের দিয়ে ভরসা হচ্ছে না!’ বিনোদ আশ্বাস দিয়া বলিলেন—‘ভেবো না হে, তোমার পাঠা গম্বর্বলোকে বাস করবে। ফাঁকে পড়লুম আমরা!’

সন্ধ্যার আন্ডা বসিয়াছে। আজও বাঘের গল্প চলিতেছে। চাটুজ্যে মহাশয় বলিতেছেন—‘সেটা তোমাদের ভুল ধারণা। বাঘ ব’লে একটা ভিন্ন জানোয়ার নেই। ও একটা অবস্থার ফের, আরসোলা হ’তে যেমন কাঁচপোকা। আজই তোমরা ডারউইন শিখেছ—আমাদের ওসব ছেলেবেলা থেকেই জানা আছে। আমাদের রায়বাহাদুর ছাগলটা বিদেয় ক’রে খুব ভাল কাজ করেছেন। কেটে খেয়ে ফেলতেন তো কথাই ছিল না, কিন্তু বাড়িতে রেখে বাড়িতে দেওয়া—উ’হু।’

বংশলোচন একখানি নূতন গীতা লইয়া নিবির্ভীচিতে অধ্যয়ন করিতেছেন—‘নায়ে ভুয়া ভবিতা বা ন ভুয়ঃ, অর্থাৎ কিনা, আত্মা একবার হইয়া আর যে হইবে না তা নয়। অজ্ঞো নিতাঃ—অজ্ঞো কিনা ছাগলং। ছাগলটা যখন বিদায় হইয়াছে, তখন আজ সন্ধিস্থাপনা হইলেও হইতে পারে।’

বিনোদ বংশলোচনকে বলিলেন—‘হে কৌন্তেয়, তুমি শ্রীভগবানকে একটু খামিয়ে রেখে একবার চাটুজ্যে মশায়ের কথাটা শোন। মনে বল পাবে।’

উদয় বলিল—‘আমি সেবার যখন সিমলেয় যাই—’

নগেন। মিছে কথা বলিস নি উদো। তোর দৌড় আমার জানা আছে, লিলুয়া অব্ধি।

উদয়। বাঃ আমার দাদাশ্বর যে সিমলেয় থাকতেন। বউ তো সেইখানেই বড় হয়।

তাইতো রং অত—

নগেন। শ্বরদার উদো।

চাটুজ্যে। যা বলছিলুম শোন। আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের এক ছাগল ছিল, তার নাম ভুটে। বাটা খেয়ে খেয়ে হ’ল ইয়া লাশ, ইয়া সিং, ইয়া দাড়ি। একদিন চরণের বাড়িতে ভোজ—লুচি, পাঠার কালিয়া, এইসব। আঁচাবার সময় দেখি, ভুটে পাঠার মাংস খাচ্ছে। বললুম—দেখছি কি চরণ, এখুনি ছাগলটাকে বিদেয় কর—কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর কর, প্রাণে ভয় নেই? চরণ শুনলে না। গরিবের কথা বাসী হ’লে ফলে। তার পরদিন থেকে ভুটে নিরুদ্দেশ। খোঁজ-খোঁজ কোথা গেল। এক বছর পরে মশায় সেই ছাগল সোঁদরবনে পাওয়া গেল। শিং নেই বললেই হয়, দাড়ি প্রায় খসে গেছে, মুখ একেবারে হাঁড়ি, বর্ণ হয়েছে যেন কাঁচা হলুদ, আর তার ওপর দেখা দিয়েছে মশায়—আঁজি-আঁজি ডোরা-ডোরা। ডাকা হ’ল—ভুটে, ভুটে! ভুটে বললে—হালুম। লোকজন দূর থেকে নমস্কার ক’রে ফিরে এল।

‘লাটুবাবু, আয়ে হে’।’

সপারিষদ লাটুবাবু প্রবেশ করিলেন। লম্বকর্ণও সঙ্গে আছে। বিনোদ বলিলেন—‘কি ব্যাণ্ড মাস্টার, আবার কি মনে করে?’

লাটুবাবুর আর সে লাগণা নাই। চুল উশক খুশক, চোখ বসিয়া গিয়াছে, জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সজলনয়নে হাঁউমাউ করিয়া বলিলেন—‘সর্বনাশ হয়েছে মশায়, ধনে-প্রাণে মেরেছে। ও হোঃ হোঃ হোঃ।’

নরহরি বলিলেন—আঃ কি কর লাটুবাবু একটু থির হও। হুজুর যখন রয়েছে তখন একটা বিহিত করবেনই।’

বংশলোচন ভীত হইয়া বলিলেন—‘কি হয়েছে—ব্যাপার কি?’

লাটু। মশাই, গুই পাঁঠাটা—

চাটুজ্যে বলিলেন—‘হু, বলেছিলুম কি না?’

লাটু। ঢোলের চামড়া কেটেছে, ব্যায়লার তাঁত খেয়েছে, হারমোনিয়ার চাবি সমস্ত চিঁবিয়েছে। আর—আর—আমার পাঞ্জাবির পকেট কেটে লম্বই টাকার লোট—ও হো হো!



‘ভুটে ধললে—হালুম’

নরহরি। গিলে ফেলেছে। পাঁঠা নয় হুজুর, সাক্ষাৎ শয়তান। সর্বস্ব গেছে, লাটুর প্রাণটি কেবল আপনার ভরসায় এখনও ধুক-পুক করছে।

বংশলোচন। ফাসাদে ফেললে দেখছি।

নরহরি। দোহাই হুজুর, লাটুর দশাটা একবার দেখুন, একটা ব্যবস্থা ক’রে দিন—বেচারার মারা যায়।

বংশলোচন ভাবিয়া বলিলেন—‘একটা জ্বোলাপ দিলে হয় না?’

লাটুবাবু উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলিলেন—‘মশায়, এই কি আপনার বিবেচনা হ’ল? মরছি টাকার শোকে, আর আপনি বলছেন জ্বোলাপ খেতে?’

বংশলোচন। আরে তুমি খাবে কেন, ছাগলটাকে দিতে বলছি।

নরহরি। হায় হায়, হুজুর এখনও ছাগল চিনলেন না! কোন কালে হজম ক’রে ফেলেছে। লোট তো লোট—ব্যায়লার তাঁত, ঢোলের চামড়া, হারমোনিয়ার চাবি, মায় ইন্সটলের কতাল।

বিনোদ। লাটুবাবুর মাথাটি কেবল আস্ত রেখেছে।

বংশলোচন বলিলেন—‘যা হবার তা তো হয়েছে। এখন বিনোদ, তুমি একটা খেসারত ঠিক করে দাও। বেচারার লোকসান যাতে না হয়, আমার ওপর বেশী জ্বলমুমও না হয়। ছাগলটা বাড়িতেই থাকুক, কাল যা হয় করা যাবে।’



‘মরছি টাকার শোকে, আর আপনি বলছেন জ্বোলাপ খেতে?’

অনেক দরদস্তুরের পর একশ টাকায় রফা হইল। বংশলোচন বেশী কষাকষি করিতে দিলেন না। লাটুবাবুর দল টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

লম্বকর্ণ ফিরিয়াছে শুনিয়া টে’পী ছুটিয়া আসিল। বিনোদ বলিলেন,—‘ও টে’পুয়ানী শীগগির গিয়ে তোমার মাকে বলো কাল আমরা এখানে খাব—লুচি, পোলাও, মাংস—’

টে’পী। বাবা আর মাংস খায় না।

বিনোদ। বল কি! হ্যাঁ হে বংশ, প্রেমটা এক পাঠা থেকে কিন্তু পাঠায় পেঁছেছে না কি? আচ্ছা তুমি না খাও আমরা আছি। যাও তো টে’পু, মাকে বল সব যোগাড় করতে।

টেপী। সে এখন হচ্ছে না। মা-বাবার ঝগড়া চলছে, কথাটি নেই।

বংশলোচন ধমক দিয়া বলিলেন—‘হ্যাঁ হ্যাঁ—কথাটি নেই—তুই সব জানিস। যা যাঃ, ভারি জ্যাঠা হয়েছিস।’

টেপী। বা-রে, আমি বুঝি টের পাই না? তবে কেন মা খালি-খালি আমাকে বলে—টেপী, পাখাটা মেরামত করতে হবে—টেপী, এ-মাসে আরও দু-শ টাকা চাই। তোমাকে বলে না কেন?

বংশলোচন। থাম্ থাম্ বাকিস নি।

বিনোদ। হে রায়বাহাদুর, কন্যাকে বেশী ঘাঁটিও না অনেক কথা ফাঁস করে দেবে। অবস্থাটা সঁজান হয়েছে বল?

বংশলোচন। আরে এতদিন তো সব মিটে যেত, ওই ছাগলটাই মৃশকিল বাধালে।

বিনোদ। ব্যাটা ঘরভেদী বিভীষণ। তোমারই বা অত মায়া কেন? খেতে না পার বিদেশ্য করে দাও। জলে বাস কর, কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করো না।

বংশলোচন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—‘দেখি কাল যা হয় করা যাবে।’

এ রাত্রিও বংশলোচন বৈঠকখানায় বিরহশয়নে যাপন করিলেন। ছাগলটা আস্তাবলে বাঁধা ছিল, উপদ্রব করিবার সুবিধা পায় নাই।

পরিদিন বৈকাল সাড়ে পাঁচটার সময় বংশলোচন বেড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, কেহ তাঁকে লক্ষ্য করিতেছে কি না। গৃহিণী ও ছেলেমেয়েরা উপরে আছে। ঝি-চাকর অন্দরে কাজকর্মে ব্যস্ত। চক্ৰবর্তী সিং তার ঘরে বসিয়া আটা শানিতেছে। লম্বকর্ণ আস্তাবলের কাছে বাঁধা আছে এবং দড়ির সীমার মধ্যে যথাসম্ভব লক্ষ্য-ক্ষম করিতেছে। বংশলোচন দড়ি হাতে করিয়া ছাগল-লইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইলেন।

পাছে পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয় সেজন্য বংশলোচন সোজা রাস্তায় না গিয়া গালি-ঘুঞ্জির ভিতর দিয়া চলিলেন। পথে এক ঠোঙা জিলিপি কিনিয়া পকেটে রাখিলেন। ক্রমে লোকসল্য হইতে দূরে আসিয়া জনশূন্য খাল-ধারে পৌঁছিলেন।

আজ তিনি স্বহস্তে লম্বকর্ণকে বিসর্জন দিবেন, যেখানে পাইয়াছিলেন আবার সেইখানেই ছাড়িয়া দিবেন—যা থাকে তার কপালে। যথাস্থানে আসিয়া বংশলোচন জিলিপির ঠোঙাটি ছাগলকে খাইতে দিলেন। পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া তাহাতে লিখিলেন—

এই ছাগল বেলখাটা খালের ধারে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। প্রতিপালন করিতে না পারায় আবার সেইখানেই ছাড়িয়া দিলাম। আল্লা কালী যিশুর দিবা ইহাকে কেহ মারিবেন না।

লেখার পর কাগজ ভাঁজ করিয়া ছোট টিনের কোটায় ভরিয়া লম্বকর্ণের গলায় ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। তার পর বংশলোচন শেষবার ছাগলের গায়ে হাত বুলাইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলেন। লম্বকর্ণ তখন আহারে ব্যস্ত।

দূরে আসিয়াও বংশলোচন বার বার পিছু ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। লম্বকর্ণ আহার শেষ করিয়া এদিক-ওদিক চাহিতেছে। যদি তাঁহাকে দেখিয়া ফেলে এখনি পশ্চাদ্ধাবন করিবে। এদিকে আকাশের অবস্থাও ভাল নয়। বংশলোচন জোরে জোরে চলিতে লাগিলেন।

আর পারা যায় না, হাঁফ ধরিতেছে। পথের ধারে একটা তেঁতুলগাছের তলায় বংশলোচন বসিয়া পড়িলেন। লম্বকর্ণকে আর দেখা যায় না। এইবার তাহার মৃতি—আর কিছদিন দৌর করিলে জড়ভরতের অবস্থা হইত। এই হতভাগা কৃষ্ণের জীবকে আশ্রয় দিতে গিয়া তিনি নাকাল হইয়াছেন। গৃহিণী তাহার উপর মর্মান্তিক রুষ্ট, আত্মীয়স্বজন তাহাকে খাইবার জন্য হাঁ করিয়া আছে—তিনি একা কাঁহাতক সামলাইবেন? হায় রে সভায়ুগ, যখন শিবি

রাজা শরণাগত কপোতের জন্য প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন—মহিষীর ক্রোধ, সভাসদবর্গের বেয়াদবি, কিছুই তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই।

দুঃ দুঃ দুঃ দুঃ দুঃ দুঃ! আকাশে কে ঢেঁটেরা পিটিতেছে? বংশলোচন চমকিত হইয়া উপরে চাহিয়া দেখিলেন, অন্তরীক্ষের গম্বুজে এক পোঁচ সীসা-রঙের অস্তর মাখাইয়া দিয়াছে। দূরে এক ঝাঁক সাদা বক জোরে পাখা চালাইয়া পলাইতেছে। সমস্ত চুপ—গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। আসন্ন দুর্যোগের ভয়ে স্বাবর জগম হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। বংশলোচন উঠিলেন, কিন্তু আবার বসিয়া পড়িলেন। জোরে হাঁটার ফলে তাঁর বুক ধড়ফড় করিতেছিল।

সহসা আকাশ চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল। এক বলক বিদ্যুৎ—কড় কড় কড়াৎ—ফটা আকাশ আবার বেমালাম জুড়িয়া গেল। ঈশানকোন হইতে একটা ঝাপসা পর্দা তাড়া করিয়া আসিতেছে। তাহার পিছনে ষা-কিছু সমস্ত মুছিয়া গিয়াছে, সামনেও আর দেখি নাই। ওই এল, ওই এল! গাছপালা শিহরিয়া উঠিল, লম্বা-লম্বা তালগাছগুলো প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল। কাকের দল আতঁনাদ করিয়া উড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঝাপটা খাইয়া



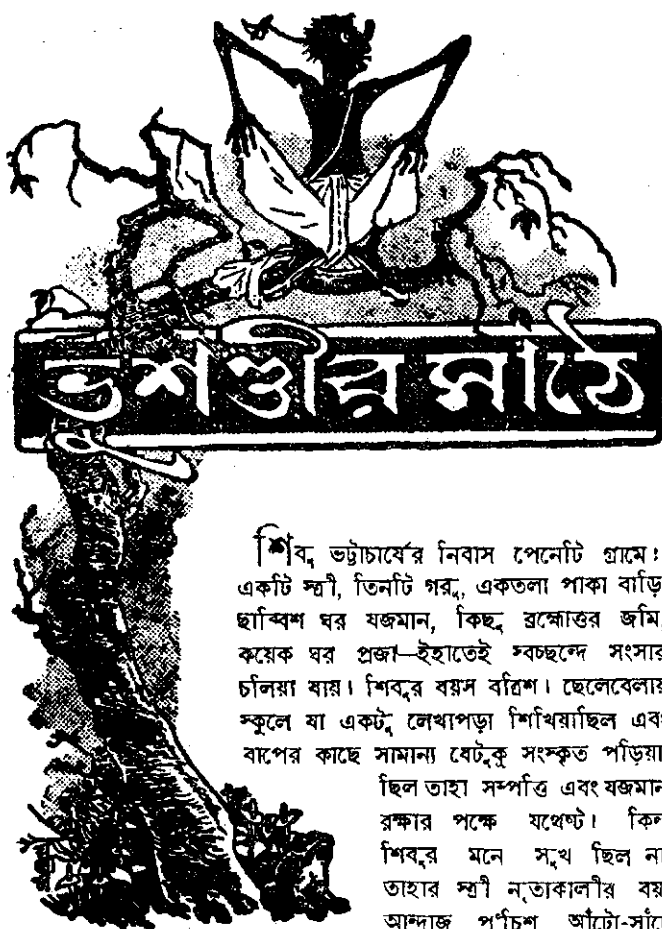
‘লুচি ক-খানি খেতেই হবে’

আবার গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিল। প্রচণ্ড বড়, প্রচণ্ডতর বৃষ্টি। যেন এই নগণ্য উইটবি—এই ক্ষুদ্র কলিকাতা শহরকে ডবাইবার জন্য স্বর্গের তেঁরিশ কোটি দেবতা সার বাঁধিয়া বড় বড় ভৃগুর হইতে তোড়ে জল ঢালিতেছেন। মোটা নিরেট জলধারা, তাহার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ফোঁটা। সমস্ত শূন্য ভরাট হইয়া গিয়াছে।

মান-ইজ্জত কাপড়-চোপড় সবই গিয়াছে, এখন প্রাণটা রক্ষা পাইলে হয়। হা রে হতভাগা ছাগল, কি কুক্ষণে—

বংশলোচনের চোখের সামনে একটা উগ্র বেগুনী আলো খেলিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে আকাশের সঞ্চিত বিশ কোটি ভোল্ট ইলেকট্রিসিটি অদ্রবতী একটা নারিকেল গাছের চক্ষুরন্ধ্র ভেদ করিয়া বিকট নাড়ে ভৃগুর্ভে প্রবেশ করিল।





শিব, ভট্টাচার্যের নিবাস পেনেটি গ্রামে :  
একটি স্ত্রী, তিনটি গরু, একতলা পাকা বাড়ি,  
ছািম্বশ ঘর যজমান, কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি,  
কয়েক ঘর প্রজা—ইহাতেই স্বচ্ছন্দে সংসার  
চলিয়া যায়। শিবের বয়স বয়িশ। ছেলেবেলায়  
স্কুলে যা একটু লেখাপড়া শিখিয়াছিল এবং  
বাপের কাছে সামান্য বেটুকু সংস্কৃত পড়িয়া-

ছিল তাহা সম্পত্তি এবং যজমান-  
রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু  
শিবের মনে সুখ ছিল না।  
তাহার স্ত্রী নৃত্যকালীর বয়স  
আন্দাজ পঁচিশ, আটো-সাঁটো

মজবুত গড়ন, দূর্দান্ত স্বভাব। স্বামীর প্রতি তাহার যত্নের চুটি ছিল না, কিন্তু শিব  
সে যত্নের মধ্যে রস খুঁজিয়া পাইত না। সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল  
বগড়া বাধিত। পঁচিশিনিট বকাবকির পরেই শিবের দম ফুরাইয়া যাইত, কিন্তু নৃত্যকালীর  
কুসনা একবার ছুটিতে আব্রম্ব করিলে সহজে নিরস্ত হইত না। প্রতিবারে শিবেরই পরাজয়  
ঘটিত। স্ত্রীকে বেশে রাখিতে না পারায় পাড়ার লোকে শিবকে কাপুরুষ, ভেড়া, মেনী-  
মুখো প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিল। ঘরে বাহিরে এইরূপে লাঞ্ছিত হওয়ায় শিবের অশান্তির  
সীমা ছিল না।

একদিন নৃত্যকালী গৃহের শূন্যে তাহার স্বামীর চরিত্রদোষ ঘটিয়াছে। সেদিনকার



## ভুশড়ীর মাঠে

বচসা চরমে পৌঁছিল—নৃত্যকালীর ঝাঁটা শিবুর পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। শিবু বেচারা ক্রোধে ক্ষোভে কণ্ঠে চোখের জল রোধ করিয়া কোনও গতিকে রাত কাটাইয়া পরদিন ভোর ছ-টার ট্রেনে কলিকাতা যাত্রা করিল।

শেয়ালদহ হইতে সোজা কালীঘাটে গিয়া শিবু নানা উপাচারে পাঁচ টাকার পূজা দিয়া মানত করিল—‘হে মা কালী, মাগীকে ওলাউঠায় টেনে নাও মা। আমি জোড়া পাঁঠার নৈবিদ্য দেব। আর যে বরদাস্ত হয় না। একটা সুরাহা ক’রে দাও মা, যাতে আবার নতুন ক’রে সংসার পাততে পারি। মাগীর ছেলেপুলে হ’ল না, সেটাও তো দেখতে হবে। দোহাই মা!’

মন্দির হইতে ফিরিয়া শিবু বড় এক ঠোঙা তেলেভাজা খাবার, আধ সের দই এবং আধ সের অমৃতি খাইল। তার পর সমস্ত দিন জন্তুর বাগান, জাদুঘর, হগ সাহেবের বাজার, হাইকোর্ট ইত্যাদি দেখিয়া সন্ধ্যাবেলা বীভূন স্ট্রীটের হোটেল-ডি-অর্থোডক্সে এক শ্লেট কারি, দু’ শ্লেট রোস্ট ফাউল এবং আটখানা ভেঁড়ল জলযোগ করিল। তার পর সমস্ত রাত থিয়েটার দেখিয়া ভোরে পেনেটি ফিরিয়া গেল।

মা-কালী কিন্তু উলটা বুকিয়াছিলেন। বাড়ি আসিয়াই শিবুর ভেদবর্মি আরম্ভ হইল। ডাক্তার আসিল, কবিরাজ আসিল, ফলে কিছুই হইল না। আট ঘণ্টা রোগে ভুগিয়া স্ত্রীকে পায়ে ধরাইয়া কাঁদাইয়া শিবু ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

গ্রামে আর মন টিকিল না। শিবু সেট বাদেই গম্ভীরা পার হইল। পেনেটির আড়পাড় কোম্পানি। সেখান হইতে উত্তরমুখ হইয়া ক্রমে রিশড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটীর হাট, চাঁপদানির চটকল ছাড়াইয়া আরও দু’তিন ক্রোশ দূরে ভুশড়ীর মাঠে পৌঁছিল। মাঠটি বহুদূর বিস্তৃত, জনমানবশূন্য। এককালে এখানে ইটখোলা ছিল সেজনা সমতল নয়, কোথাও গর্ত, কোথাও মাটির ঢিপি। মাঝে মাঝে আসশাওড়া, ঘেঁটু, বুনো ওল, বাবলা প্রভৃতির ঝোপ। শিবুর বড়ই পছন্দ হইল। একটা বহুকালের পরিভাষা ইটের পাঁজার এক পাশে একটা লম্বা তালগাছ সোজা হইয়া উঠিয়াছে, আর একদিকে একটা নেড়া বেলগাছ ত্রিভুজ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিবু সেই বেলগাছে ব্রহ্মদেতা হইয়া বাস করিতে লাগিল।

যাহারা স্পিরিচুয়ালিজম বা প্রেততত্ত্বের খবর রাখেন না তাহাঁদিগকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছি। মানুষ মরিলে ভূত হয় ইহা সকলেই শুনিয়েছেন। কিন্তু এই থিওরির সঙ্গে স্বর্গ, নরক, পুনর্জন্ম খাপ খায় কিরূপে? প্রকৃত তথ্য এই—নাশিতকন্দের আত্মা নাই। তাহারা মরিলে অস্তিত্ব নাই, হাইড্রোজেন নাই, ট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন। সাহেবদের মধ্যে যাহারা আস্তিক, তাহাদের আত্মা আছে বটে, কিন্তু পুনর্জন্ম নাই। তাহারা মৃত্যুর পর ভূত হইয়া প্রথমত একটি বড় ওয়েটিংরুমে জমায়েত হন। তথায় কম্পবাসের পর তাহাদের শেষ বিচার হয়। রায় বাহির হইলে কতগুলি ভূত অনন্ত স্বর্গে এবং অসংশিত সকলে অনন্ত নরকে আশ্রয়লাভ করেন। সাহেবরা জীবদ্দশায় যে স্বাধীনতা ভোগ করেন, ভূতাবস্থায় তাহা অনেকটা কমিয়া যায়। বিলাতী প্রেতাত্মা বিনা প্যাসে ওয়েটিংরুম ছাড়িতে পারে না। যাহারা seance দেখিয়াছেন তাহারা জানেন বিলাতী ভূত নামানো কি-রকম কঠিন কাজ। হিন্দুর জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত, কারণ আমরা পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক, কর্মফল, কৃপা কৃষীকেশ, নির্বাণ, মুক্তি সবই মানি। হিন্দু মরিলে প্রথমে ভূত হয় এবং যত-তত স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারে—আবশ্যক-মত ইহলোকের সঙ্গে কারবারও করিতে পারে। এটা একটা মস্ত সুবিধা। কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী নয়। কেহ কেহ দু-চার দিন পরেই পুনর্জন্ম লাভ করে, কেহ-বা দশ-বিশ বৎসর পরে, কেহ-বা দু-তিন শতাব্দী পরে।

ভূতদের মাঝে-মাঝে চেঞ্জের জন্য স্বর্গে ও নরকে পাঠানো হয়। এটা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, কারণ স্বর্গে খুব ফর্তিতে থাকা যায় এবং নরকে গেলে পাপ ক্ষয় হইয়া সুক্ষ্মশরীর বেশ হালকা করবার হয়, তা ছাড়া সেখানে অনেক ভাল ভাল লোকের সঙ্গে দেখা হইবার সুবিধা আছে। কিন্তু যাঁহাদের ভাগ্যক্রমে কাশীলাভ হয়, অথবা নেপালে পশুপতিনাথ বা রথের উপর বামনদর্শন ঘটে, কিংবা যাঁহারা স্বকৃত পাপের বোঝা হ্রষীকেশের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—একেবারেই মর্দুস্তি।

দু-তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। শিবু সেই বেলগাছেই থাকে। প্রথম প্রথম দিনকতক নূতন স্থানে নূতন অবস্থায় বেশ আনন্দে কাটিয়াছিল, এখন শিবুর বড়ই ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। মেজাজটা যতই বদ হউক, নূতর একটা আন্তরিক টান ছিল, শিবু এখন তাহা হাড়-হাড়ে অনুভব করিতেছে। একবার ভাবিল—দূর হ'ক, না-হয় পেনেটিতেই আড্ডা গাড়ি। তার পর মনে হইল—লোকে বলবে বেটা ভূত হইয়াও স্ত্রীর আঁচল ছাড়িতে পারে নাই। নাঃ, এইখানেই একটা পছন্দমত উপদেবীর যোগাড় দেখিতে হইল।

ফাল্গুন মাসের শেষবেলা। গঙ্গার বাঁকের উপর দিয়া দক্ষিণা হাওয়া ঝির-ঝির করিয়া বাহিতেছে। সূর্যদেব জলে হাবুড়বুড় খাইয়া এইমাত্র তলাইয়া গিয়াছেন। ঘেঁটুফুলের গন্ধে শুশুন্ডীর মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। শিবুর বেলগাছে নূতন পাতা গজাইয়াছে। দূরে আকন্দ



লজ্জায় জিব কাটিয়াছিল

## ভূশুন্ডীর মাঠে

ঝোপে গোটাকতক পাকা ফল ফট্ করিয়া ফাটিয়া গেল, একরাশ তুলোর আঁশ হাওয়ায় উড়িয়া মাকড়শার কংকালের মত বিকর্মিক করিয়া শিবুর গায়ে পড়িতে লাগিল। একটা হলদে রঙের প্রজাপতি শিবুর সূক্ষ্মশরীর ভেদ করিয়া উড়িয়া গেল। একটা কাল গুবরে পোকা ভরব করিয়া শিবুকে প্রদাক্ষণ করিতে লাগিল। অদূরে বাবলা গাছে একজোড়া নাঁড়কাক বাসিয়া আছে। কাক গলায় সুড়সুড়ি দিতেছে, কাকিনী চোখ মৃদিয়া গদগদ স্বরে মাঝে-মাঝে ক-অ-অ করিতেছে। একটা কটকটে ব্যাং সদা ঘুম হইতে উঠিয়া গুটিগুটি পা ফেলিয়া বেলগাছের কোটর হইতে বাহিরে আসিল, এবং শিবুর দিকে ডাবডেবে চোখ মেলিয়া টিটকারি দিয়া উঠিল। একদল ঝিঝিপোকা সন্ধ্যার আসরের জন্য যন্ত্রে সুর বাঁধিতেছিল, এতক্ষণে সংগত ঠিক হওয়ায় সমস্বরে রিরিরিরি করিয়া উঠিল।

শিবুর যদিও রক্তমাংসের শরীর নাই, কিন্তু মরিলেও স্বভাব যাইবে কোথা। শিবুর মনটা খাঁখাঁ করিতে লাগিল। যেখানে রূপিশুন্ড ছিল সেখানটা ভরাট হইয়া ধড়াক ধড়াক



গোবর-গোলা জল ছড়াইয়া যায়

করিতে লাগিল। মনে পড়িল—ভূশুন্ডীর মাঠের প্রান্তস্থিত পিটুলি-বিলের ধারে শ্যাওড়া-গাছে একটি পেঙ্গী বাস করে। শিবু তাহাকে অনেকবার সন্ধ্যাবেলা পোলা হাতে মাছ ধরিতে দেখিয়াছে। তার আপাদমস্তক ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকা, একবার সে ঢাকা খুলিয়া শিবুর দিকে চাহিয়া লজ্জায় জিব কাটিয়াছিল। পেঙ্গীর বয়স হইয়াছে, কারণ তাহার গাল একটু তোব-ডাইয়াছে এবং সামনের দুটো দাঁত নাই। তাহার সঙ্গে ঠাট্টা চলিতে পারে, কিন্তু প্রেম হওয়া অসম্ভব।

একটি শিকচন্দ্রী কয়েকবার শিবুর নজরে পড়িয়াছিল। সে একটা গামছা পরিয়া আর

একটা গামছা মাথায় দিয়া এলোচুলে বকের মত লম্বা পা ফেলিয়া হাতের হাঁড়ি হইতে গোবর-গোলা জল ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যায়। তাহার বয়স তেমন বেশী বোধ হয় না। শিবু একবার রসিকতার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু শাকচন্দ্রী ব্রহ্ম বিড়ালের মত ফাঁচ করিয়া ওঠে, অগত্যা শিবুকে ভয়ে চম্পট দিতে হয়।

শিবুর মন সবচেয়ে হরণ করিয়াছে এক ডাকিনী। ভূশুন্ডীর মাঠের পূর্বদিকে গঙ্গার ধারে ক্ষীরী-বামনীর পরিত্যক্ত ভিটায় যে জীর্ণ ঘরখান আছে তাহাতেই সে অল্পদিন হইল আগ্রস্র লইয়াছে। শিবু তাহাকে শুধু একবার দেখিয়াছে এবং দেখিয়াই মজিয়াছে। ডাকিনী তখন একটা খেজুরের ডাল দিয়া রোয়াক ঝাঁট দিতেছিল। পরনে সাদা থান। শিবুকে দেখিয়া নিমেষের তারে ঘোমটা সরাইয়া ফিক করিয়া হাসিয়াই সে হাওয়ার সঙ্গে মিলাইয়া যায়। কি দাঁত! কি মুখ! কি রং! নৃত্যকালীর রং ছিল পানতুয়ার মত। কিন্তু ডাকিনীর রং যেন পানতুয়ার শাঁস।



খেজুরের ডাল দিয়া রোয়াক ঝাঁট দিতেছিল

শিবু একটি সুন্দর নিঃশ্বাস ছাড়িয়া গান ধরিল—

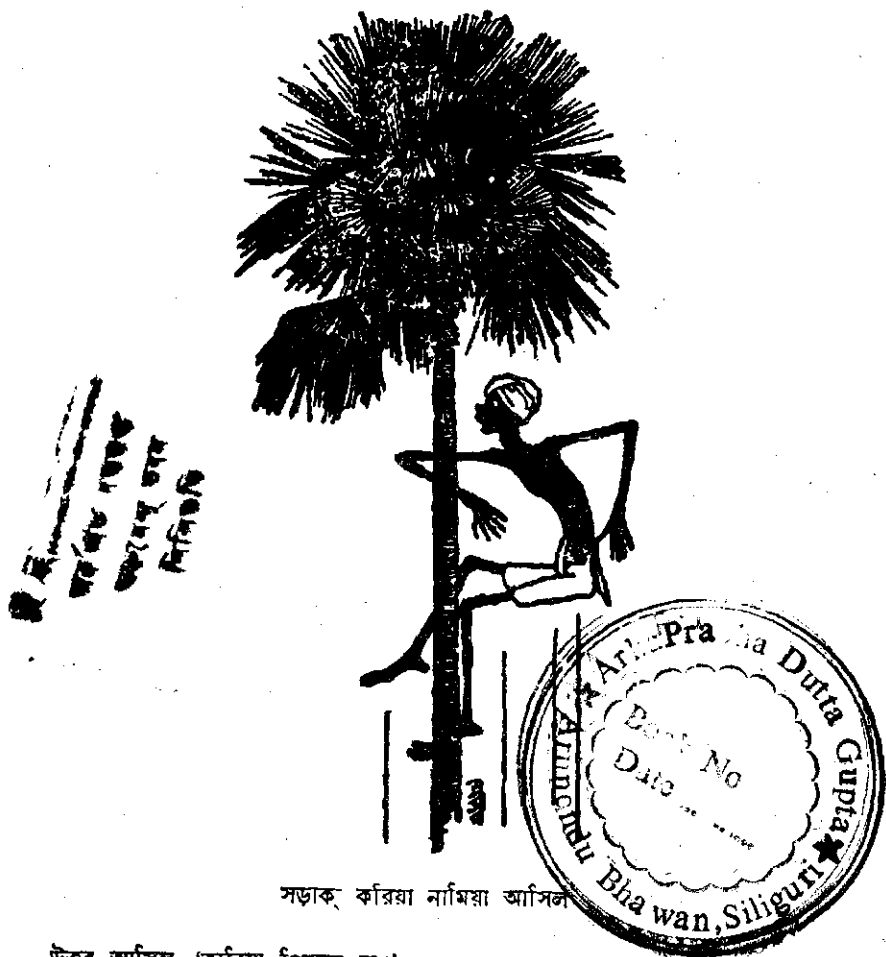
আহা, প্রীতিধিকে চন্দ্রাবলী  
কারে রেখে কারে ফেলি।

## ভুশুড়ীৰ মাঠে

সহসা প্ৰান্তৰ প্ৰকাৰ্পিত কঁৱৰীয়া নিকটবৰ্তী তালগাছৰ মাথা হইতে তীব্ৰকণ্ঠে শব্দ উঠিল—

চা ৱা ৱা ৱা ৱা  
আৱে ভজ্জুৱাকে বহিনিয়া ভগ্জুৱাকে বিটিয়া  
কেক্ৰাসে সাদিয়া হো কেক্ৰাসে হো-ও-ও-ও—

শিব্ চমকাইয়া উঠিয়া ডাকিল—‘তালগাছে কে ৱে?’



সড়াক্ কঁৱৰীয়া নাঁমিয়া আসিল

উত্তৰ আসিল—‘কঁৱৰীয়া পিৱেত বা।’

শিব্। কেলে ভূত? নেমে এস বাবা।

মাথায় পাগড়ি, কাল লিকলিকে চেহাৱা, কাঁকলাসেৰ মত একটি জীৱাত্মা সড়াক কঁৱৰীয়া

ভালগাছের মাথা হইতে নামিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—‘গোড় লাগি বরমদেওজী!’

শিবু। জিতা রহো বেটা। একটু তামাক খাওয়াতে পারিস?

কারিয়া পিরেত। ছিলম বা?

শিবু। তামাকই নেই তা ছিলম। যোগাড় কর না।

প্রত্যেকের উঠিল এবং অল্পক্ষণমধ্যে বৈদ্যবাটির বাজার হইতে তামাক টিকা কলিকা অনিয়া আগ শুল্কাইয়া শিবুর হাতে দিল। শিবু একটা কচুর ভাঁটার উপর কলিকা বসাইয়া টান দিতে দিতে বলিল—‘তার পর, এলি কবে? তোর হাল চাল সব বল্।’

কারিয়া পিরেত যে ইতিহাস বলিল তার সারমর্ম এই।—

তাহার বাড়ি ছাপরা জিলা। দেশে এককালে তাহার জরু গরু জমি জেরাত সবই ছিল। তাহার স্ত্রী মৃৎরী অত্যন্ত মুখরা ও বদমেজাজী, বনিবনাও কখনও হইত না। একদিন প্রতিবেশী ভজুরার ভণ্ডীকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বিষম বগড়া হয়, এবং স্ত্রীর পিঠে এক ঘা লাঠি কশাইয়া স্বামী দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসে। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। কিছুদিন পরে সংবাদ আসে যে মৃৎরী বসন্ত রোগে মরিয়াছে। স্বামী আর দেশে ফিরিল না, বিবাহও করিল না। নানা স্থানে চাকরি করিয়া অবশেষে চাঁপদানির মিলে কুলীর কাজে ভর্তি হয় এবং কয়েক বৎসর মধ্যে সর্দারের পদ পায়। কিছুদিন পূর্বে একটি লোহার কড়ি হাফিজ অর্থাৎ কপিকলে উত্তোলন করিবার সময় তার মাথায় চোট লাগে। তার পর একমাস হাসপাতালে শয্যাশায়ী হইয়া থাকে। সম্প্রতি পঞ্চমপ্রাপ্ত হইয়া প্রেতরূপে এই তালগাছে বিরাজ করিতেছে।

শিবু একটা লম্বা টান মারিয়া কলিকাটি কারিয়া পিরেতকে দিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় মাটির ভিতর হইতে ভাঙা কাসরের মত আওয়াজ আসিল—‘ভায়া, কলকেটায় কিছু আছে না কি?’

বেলগাছের কাছে যে ইটের পাঁজা ছিল তাহা হইতে খানকতক ইট খসিয়া গেল এবং ফাঁকের ভিতর হইতে হামাগুড়ি দিয়া একটি মূর্তি বাঁহর হইল। স্থল খবর দেই, থেলো হুঁকার থেলের উপর একজোড়া পাকা গোঁফ গজাইলে যে-রকম হয় সেই প্রকার মুখ, মাথায় ঢাক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে ঘুণ্ট-দেওয়া মেরজাই, পরনে মূর্তি, পায়ে তালতলার চটি। আগন্তুক শিবুর হাত হইতে কলিকাটি লইয়া বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ? দণ্ডবৎ হই। কিছু সম্পত্তি ছিল, এইখানে পোঁতা আছে। তাই যক্ষি হয়ে আগলাচ্ছি। বেশী কিছু নয়—দু-পাঁচশো। সব বন্ধকী তমসুক দাদা—ইণ্ডাম্বর কাগজে লেখা—নগদ সিক্কা একটিও পাবে না। খবরদার, ওদিকে নজর দিও না—হাতে হাতকাড়ি পড়বে, থুঃ থুঃ!’

শিবুর মেঘদূত একটু আধটু জানা ছিল। সসম্মানে জিজ্ঞাসা করিল—‘যক্ষ মহাশয়, আপনিই কি কালিদাসের—’

যক্ষ। ভায়রাভাই। কালিদাস আমার মাসভূতা শালীকে বে করে। ছোকরা হিজলিতে নিম্নিকর গোমস্তা ছিল, অনেক দিন মারা গেছে। ভূমিতার নাম জানলে কিসে হয়?

শিবু। আপনার এখানে কতদিন আগমন হয়েছে?

যক্ষ। আমার আগমন? হ্যা, হ্যা! আমি বলে গিয়ে সাড়ে তিন কুড়ি বছর এখানে আছি। কত এল দেখলুম, কত গেল তাও দেখলুম। আরে ভূমি তো সেদিন এলে, কার্টিপ’পাড় তাড়িয়ে তিনবার হোঁচট খেয়ে গাছে উঠলে। সব দেখেছি আমি। তোমার গানের শখ আছে



সব বন্দকী ভ্রমসূত্র দাদা

দেখেছি—বেশ বেশ। কালোয়ার্টি শিখতে যদি চাও তো আমার শাগরেদ হও দাদা। এখন আওয়াজটা যদিচ একটু খোনা হয়ে গেছে, তবু মরা হাতি লাখ টাকা।

শিবু। মশায়ের ভূতপূর্ব পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

যক্ষ। বিলক্ষণ। আমার নাম ওনদেরচাঁদ মল্লিক, পদবী বসু, জাতি কায়স্থ, নিবাস রিশড়ে, হাল সাকিন এই পাঁজার মধ্যে। সাবেক পেশা দারোগাগিরি, ইলাকা রিশড়ে ইন্সপেক্টর-জর্জি সাহেবের নাম শুনেছ? হুগলির কালেক্টর—ভারি ভালবাসত আমাকে। মাদ্রাসার পাসনটা তামাম আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছিল। নাদু মল্লিকের দাপটে লোকে গ্রাহি গ্রাহি ডাক ছাড়ত।

শিবু। মশায়ের পরিবারাদি কি?

যক্ষ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—সব সুখ কি কপালে হয় রে দাদা! ঘরসংসার সবই তো ছিল, কিন্তু গিন্নীটি ছিলেন খাণ্ডার। বলব কি মশায়, আমি হলুম গিয়ে নাদু মল্লিক—কোম্পানির ফৌজদারী নিজামত আদালত যার মৃত্যুর মধ্যে—আমারই পিঠে দিলে কিনা এক ঘা চেলা-কাঠ কশিয়ে! তার পরেই পালাল বাপের বাড়ি। তিন-শ চব্বিশ ধারায় ফেলতুম, কিন্তু কেলেকারির ভয়ে গ্রেস্তারী পরোয়ানা আর ছাড়লুম না। কিন্তু যাবে কোথা? গুরুদ্বা আছেন, ধর্ম আছেন। সাতচল্লিশ সনের মড়কে মাগী ফোঁত হ'ল। সংসারখর্মে আর মন বসল না। জর্জি সাহেব বিলেত গেলে আমিও পেনশন নিয়ে এক শখের যাত্রা খললুম। তার পর পরমাই ফুরুলে এই হেথা আস্তা গেড়েছি। ছেলেপুলে হয় নি তাতে দংশন নেই দাদা। আমি করব রোজগার, আর কোন্ আবাগের-বেটা-ভূত মানুষ হয়ে আমার

ঘরে জন্ম নিয়ে সম্পত্তির ওয়ারিস হবে—সেটা আমার সহিত না। এখন তোফা আছি, নিজের বিষয় নিজে আগলাই, গম্ভীর হাওয়া খাই আর খব-বন্ করি। থাক, আমার কথা তো সব শুনলে, এখন তোমার কেছা বল।’

শিবু নিজের ইতিহাস সমস্ত বিবৃত করিল, কারিয়া পিরেতের পরিচয়ও দিল। যক্ষ বলিলেন—‘সব স্যাভ্যাতের একই হাল দেখছি। পুরনো কথা ভেবে মন খারাপ ক’রে ফল নেই, এখন একটু গাওনা-বাজনা করি এস। পাখোয়াজ নেই—তেমন জুত হবে না। আচ্ছা, পেট চাপড়েই ঠেকা দিই। উহু—টনটন করছে। বাবা ছাত্তুখোর, একটু এ’টেল-মাটি চটকে এই মাথিখানে থাকড়ে দে তো। ঠিক হয়েছে। চোঁতাল বোঝ? ছ মাত্রা, চার তাল, দুই ফাঁক। বোল শোন—

ধা ধা ধিন্ তা কং তা গে, গিন্নী ঘা দেন কত’া কে।

ঘরে তাড়া ক’রে খিটখিটে কথা কর

ধূত’া গিন্নী কত’া গাধারে।

ঘাড়ে ধ’রে ঘন ঘন ধা কত ধুম্ ধুম্ দিতে থাকে।

টুটি টিপে ঝুটি ধরে উল্টে পাল্টে ফ্যালে

গিন্নী ঘুঘুটির ক্ষমতা কম নয়;

ধাক্কা ধুক্কি দিতে টুটি ধনী করে না

নগণ্য নিধন কত’া গাধা—

‘ধা’-এর উপর সম। ধিন্ তা তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা।

এই ‘ধা’ ফসকালেই সব মাটি। গলাটা ধরে আসছে। খোঁটাভূত, আর এক ছিলিম সাজ বেটা।’

উদযোগী পুরুষের লক্ষ্মীলাভ অনিবার্য। অনেক কাকূতি-মিনতির পরে ডাকিনী শিবুর ঘর করিতে রাজী হইয়াছে। কিন্তু সে এখনও কথা বলে নাই, ঘোমটাও খোলে নাই, তবে ইশারায় সম্মতি জানাইয়াছে। আজ ভৌতিক পন্থাভিতে শিবুর বিবাহ। সূর্যাস্ত হইবামাত্র শিবু সর্বাপে গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়া স্নান করিল, গাভের আটা দিয়া পইতা মাজিল, ফলি-মনসার বুরুশ দিয়া চুল আঁচড়াইল, টিকিতে একটি পাকা তেলাকুচা বাঁধিল। ঝোপে ঝোপে বনজঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একরাশ ষে’টুফুল, বঁইচ, কয়েকটি পাকা নোনা ও বেল সংগ্রহ করিল। তারপর সম্মুখ শেরালের একতান আরম্ভ হইতেই সে ক্ষীরী বামনীর ভিটার ঘাটা করিল।

সেদিন শরুপক্ষের চতুর্দশী। ঘরের দাওয়ার কচুপাতার আসনে ডাকিনীর সম্মুখে বসিয়া শিবু মন্তপাঠের উদ্যোগ করিয়া উৎসুক চিত্তে বলিল—‘এইবার ঘোমটাটা খুলতে হচ্ছে।’

ডাকিনী ঘোমটাটা সরাইল। শিবু চমকিত হইয়া সভয়ে বলিল—‘আঁ! তুমি নেত্য।’

নৃত্যকালী বলিল—‘হারে মিন্‌সে। মনে করেছিলে ম’রে আমার কবল থেকে বাঁচবে। পেরী শাকচুম্বীর পিছ পিছ ঘুরতে বড় মজা, না?’

শিবু। এলে কি করে? ওলাউঠায় নাকি?

নৃত্যকালী। ওলাউঠা শব্দের হ’ক। কেন, ঘরে কি কেরোসিন ছিল না?

শিবু। তাই চেহারাটা ফরসাপানা দেখাচ্ছে। পোড় খেলে সোনার জলুস বাড়ে। খাতটাও একটু নরম হয়েছে নাকি?

শব্দকর্মে বাধা পড়িল। বাহিরে ও কিসের গোলযোগ? যেন একপাল শকুনি-গৃধ্রী



## ভূশুড়ীর মাঠে

ছোটোপটি কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছে। সহসা উল্কার মত ছুটিয়া আসিয়া পেরাী ও শাকচরুশী উঠানের বেড়ার আগড় তৈলিয়া ভীষণ চেঁচামেচি আরম্ভ করিল (ছাপাখানার দেবতাগণের সুবিধার জন্য চন্দ্রবিন্দু বাদ দিলাম, পাঠকগণ ইচ্ছামত বসাইয়া লইবেন)।

পেরাী। আমার সোয়ামী তোকে কেন দেব লা?

শাকচরুশী। আ মর বড়ী, ও বে ভোর নাতির বরসী।

পেরাী। আহা, কি আমার কনে বউ গা!

শাকচরুশী। দূর মেছোপেরাী, আমি যে ওর দু-জন্ম আগেকার বউ।

পেরাী। দূর গোবরচরুশী, আমি যে ওর তিন জন্ম আগেকার বউ।

শাকচরুশী। মর চেঁচিয়ে, ওদিকে ডাইনি মাগী মিন্সেকে নিয়ে উধাও হ'ক।

তখন পেরাী বিড়বিড় করিয়া মন্ত পড়িয়া আগড় বন্ধ করিয়া বলিল—‘আগে তোম খাড়া মাটিতে তার পর ডাইনি বেটীকে খাব।’

কামড়াকামড়ি চুলোচুলি আরম্ভ হইল। একা নৃত্যকালীতেই রক্ষা নাই তাহার উপর পুনঃপুন দুই জন্মের আরও দুই পত্নী হাজির। শিব হাতে পইতা জড়াইয়া ইন্টমন্ড জপিতে লাগিল। নৃত্যকালী রাগে ফুলিতে লাগিল।

এমন সময় নৈপথ্যে যক্ষের গলা শোনা গেল—

ধনী, শুনছ কিবা আনমনে,

ভাবছ বুঝি শ্যামের বাঁশি ডাকছে তোমার বাঁশবনে।

ওটা যে খ্যাকশেয়ালী, দিও না কুলে কালী।

রাত-বিরেতে শ্যালকুকুরের ছুঁচোপ্যাঁচার ডাক শুনেন।

যক্ষ বেড়ার কাছে আসিয়া বলিলেন—‘ভায়া, এখানে হচ্ছে কি? এত গোল কিসের?’

কারিয়া পিরেত হাঁকিল—‘এ বরম পিচাস, আরে দরবাজা তো খোল।’

শিবুর সাড়া নাই।

প্রচণ্ড ধাক্কা পড়িল, কিন্তু মন্তবন্ধ আগড় খুলিল না, বেড়াও ভাঙ্গিল না। তখন কারিয়া পিরেত তারম্বরে উৎপাটনমন্ত পড়িল—

মারে জু জুরান—হেঁইয়া

আউর ভি ধোড়া—হেঁইয়া

পর্বত তোড়ি—হেঁইয়া

চলে ইজন—হেঁইয়া

ফটে বয়লট—হেঁইয়া

খবরদার—হা-ফিজ।

মড় মড় করিয়া ঘরের চাল, দেওয়াল, বেড়া, আগড় সমস্ত আকাশে উঠিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

ডাকিনী, অর্থাৎ নৃত্যকালীকে দেখিয়া যক্ষ বলিলেন—‘একি, গিম্মী! এখানে? বেঙ্গদতি-টরে সঙ্গে! ছি ছি—লজ্জার মাথা খেয়েছ?’ ডাকিনী ছোমটা টানিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া গাইল।

কারিয়া পিরেত বলিল—‘আরে মুরেরী, তোহার শরম নহি বা?’

\*

\*

\*

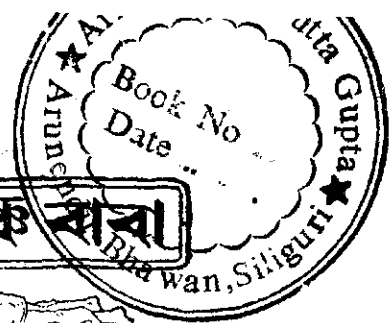
তার পর যে ব্যাপার আরম্ভ হইল তাহা মনে করিলেও কলমের কালি শুখাইয়া যায়। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী—এই ডবল গ্রাহস্পর্শযোগে ভূশন্ডীর মাঠে যুগপৎ জলস্তম্ভ, দাবানল ও ভূমিকম্প শুরুর হইল। ভূত, প্রেত, দৈত্য, পিশাচ, তাল, বৈতাল প্রভৃতি দেশী উপদেবতা যে যেখানে ছিল, তামাশা দেখিতে আসিল। ম্পৃক, পিঙ্গি, নোম, গব্লিন প্রভৃতি গোফ-কামানো বিলাতি ভূত বাঁশ বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। জিন, জান, আফ্রিদ, মারীদ প্রভৃতি লম্বা-দাঁড়ওয়ালা কাবুলী ভূত দাপা-দাপি আরম্ভ করিল। চিং চ্যাং, ফ্যাচাং ইত্যাদি মাকুন্দে চীনে-ভূত ডিগবাজি খাইতে লাগিল।

রাম রাম রাম। জয় হাড়িঝি চন্ডী আজ্ঞা কর মা! কে এই উৎকট দাম্পত্যসমস্যার সমাধান করিবে? আমার কষ্ট নয়। ভূতজ্ঞাতি অতি নাছেড়বান্দা, ন্যায্যগন্ডা ছাড়িবে না। পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর নারীত্ব ভূতের ভূতত্ব, পেত্রীর পেত্রীত্ব—এসব তাহারা বিলক্ষণ বোঝে। অতএব সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি—শ্রীযুক্ত শরৎ চাট্‌জো, চারু বাঁড়ুজো, নরেশ সেন এবং যতীন সিংহ মহাশয়গণ যুক্তি করিয়া একটা বিল-ব্যবস্থা করিয়া দিন—যাহাতে এই ভূতের সংসারটি ছারেখারে না যায় এবং কোনও রকম নীতি-বিগহিত বিদ্যুৎ ব্যাপার না ঘটে। নিতান্ত যদি না পারেন, তবে চাঁদা তুলিয়া গয়ায় পিণ্ড দিবার চেষ্টা দেখুন, যাহাতে বেচারারা অতঃপর শান্তিতে থাকিতে পারে।



<http://boirboi.blogspot.com>

কজলী



চৌদ্দ নম্বর হাবশীবাগান লেনের মেসটি ছোট কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কারণ ম্যানেজার নিবারণ মাস্টার খুব আমুদে লোক হইলেও সব দিকে তার কড়া নজর আছে। মেসের অধিবাসী পাঁচ-ছয়জন মাত্র এবং সকলেরই অবস্থা ভাল। বসবার জন্য একটি আলাদা ঘর, তাতে ঢালা ফরাশ এবং অনেক রকম বাদ্যযন্ত্র, দাবা, তাস, পাশা ও অন্যান্য খেলার সরঞ্জাম, কতকগুলি মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি চিন্তাবিনোদনের উপকরণ সম্বিজত আছে। কাল হইতে পূজার বন্ধ, সেজন্য মেসের অনেকে দেশে চালায়া গিয়াছে। বাকী আছে কেবল নিবারণ ও পরমার্থ। ইহারা কোথাও যাইবে না, কারণ দৃজনেরই শব্দবর্ষাতির সকলে কলিকাতায় আসিতেছেন।

নিবারণ কলেজে পড়ায়। পরমার্থ ইন্সটিটিউটের দালালি, হঠযোগ এবং ঐশ্বর্যের চর্চা করে। আজ সন্ধ্যায় মেসের বৈঠকখানায় ইহারা দুইজন এবং পাশের বাড়ির নিতাইবাবু আসিয়া দিতেছেন। নিতাইবাবু নিতাই এখানে আসেন। তাঁর একটু ন্যাস ওইয়াছে, সেজন্য মেসের ছোকরার দল তাঁকে একটু সমীহ করে, অর্থাৎ পিছন দিয়া সিগারেট খায়।

নিতাইবাবু বলিতেছিলেন—‘চিন্তে সুখ নেই দাদা। ঝি-বেটী পালিয়েছে, খুকী-টার জ্বর, গিন্নী খিটখিট করছেন, আপিসে গিয়েও যে দু-দশ ঘন্টা তার জো নেই, নতুন ছোট সায়ের ব্যাটা যেন চরকি ঘুরছে।’

পরমার্থ বলিল—‘কেন আপনাদের আপিসে তো বেশ ভাল ব্যস্থা আছে।’

নিতাই। সেদিন আর নেই রে ভাই। ছিল বটে মের্কেজ সায়েরের আমলে। পরদা খুড়োকে জান তো? শ্যামনগরের বরদা মদুখুজো। খুড়ো দুটোর সময় আফিম খেতেন, আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত ঘুমুতেন। আমরা সবাই পালা করে টোফনঘরে গাড়িয়ে নিতুম, কিন্তু খুড়ো চেয়ার ছাড়তেন না। একদিন হয়েছে কি—লেজার ঠিক দিতে দিতে যেমনি পাতার নীচে পেঁপেছিলেন অমনি ঘুম এল। নড়ন-চোঁচ নেই, নাক-ডাকা নেই, ঘাড় একটু বকুল না, লেজার টোড়ালের জায়গায় হাতের কলমটি ঠিক ধরা আছে। অসাধারণ ক্ষমতা—দূর থেকে দেখলে কে বলবে খুড়ো

ঘন্টামুছে। এমন সময় মেকেঞ্জি সায়েব ঘরে এল, সকলে শশবাস্ত। সায়েব খুড়োর কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে খুড়োর কাঁধে একটি চিমটি কাটলে। খুড়ো একটু মিটমিটিয়ে চেয়েই বিড়বিড় করে আরম্ভ করলে—সাঁইগ্রিশের সাত নায়ে তিনে—



তিনে-কত্তি তিন

কত্তি তিন। সায়েব হেসে বললে—হ্যাভ এ কপ অভ টী বাবু। এখন সে রামও নেই, সে অযোগ্যও নেই। সংসারে ঘেন্না ধরে গেছে। একটি ভাল সাধু-সন্ন্যাসী পাই তো সব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

পরমার্থ। ভগ্নাথ-ঘাটে আজ একটি সাধুকে দেখে এলুম—আশ্চর্য ব্যাপার। লেকে তাঁকে বলে মিরচাইবা। তিনি কেবল লক্ষা খেয়ে থাকেন—ভাত নয়, রুটি নয়, ছাত্তু নয়—শুধু লক্ষা। লক্ষ লক্ষ লোক ওষুধ নিতে আসছে, একটি করে লক্ষা মন্তপত করে দিচ্ছেন, তাই খেয়ে সব ভাল হয়ে যাচ্ছে। শুনোছি তাঁর আবার যিনি গুরু আছেন, তাঁর সাধনা আরও উঁচু দরের। তিনি খান প্রেফ করাতের গুঁড়ো।

নিষ্ঠাই। ওহে মাস্টার, তুমি তো ফিলজফিতে এম. এ. পাশ করেছ—লক্ষা, করাতের গুঁড়ো, এ সবার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য কি বল তো? তোমার পাখোয়াজ বন্ধ কর বাপু, কান ঝালাপালা হ'ল।

নিবারণ প্রথমে একটা মাসিক পত্রিকা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। তাতে যে পাঁচটি গল্প আছে তার প্রত্যেকের নায়িকা এক-একটি সতী-সাহদী বারাগনা। অবশেষে নিবারণ পত্রিকাটি ফোলিয়া দিয়া একটা পাখোয়াজ কোলে লইয়া মাঝে মাঝে বেতাল।

চাঁটি মারিতেছিল। নিতাইবাবুর কথায় বাজনা থামাইয়া বলিল—‘ও সব হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সাধনার মার্গ! যেমন জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ,—তেমনি মিরচাইমার্গ, করাতমার্গ, লবণমার্গ, একাদশীমার্গ, গোবরমার্গ, টাঁকিমার্গ, দাড়িমার্গ, স্ফটিকমার্গ, কাগমার্গ—’

নিতাই। কাগমার্গ কি রকম?

নিবারণ। জানেন না? গেল বছর হরিহর ছত্রের মেলায় গিয়েছিলুম। এক জায়গায় দেখি একটা প্রকাণ্ড বাঁশের খাঁচায় শ-দুই কাগ বামেলা করছে। পাশে একটা লোক হাঁকছে—দো-দো আনে কোয়ে, দো-দো আনে। ভাবলুম বুঝি পেশোয়ারী কি মূলতানী কাগ হবে, নিশ্চয় পড়তে জানে। একটা বাড়িগোছ কাগের কাছে গিয়ে খিস দিয়ে বললুম—পড়ো ময়না, চিত্রকোট কি ঘাট পর—সীতায়াম—রাধাক্ষয়ন বোলো—চুচ্চুঃ। ব্যাটা ঠেকরাত এল। কাগ-ওলা বললে—বাবু কীয়া নহি পততা। তবে কি করে বাপু? কাগের মাংস তো শুনতে পাই তেতো, লোকে বুঝি সত্ত্ব বানাবার জন্মে কেনে? বললে—তাও নয়। এই কাগ খাঁচায় কয়েদ রয়েছে, দু-দু আনা খরচ ক’রে যতগুলি ইচ্ছে কিনে নিয়ে জীবকে বন্দনদশা হ’তে মুক্তি দাও, তোমারও মুক্তি হবে। ভাবলুম মোক্ষের মার্গ কি বিচিত্র! অন্য লোকে মুক্তি পাবে তাই এই পরিব কাগ-ওলা বোচার নিজের পরকাল নষ্ট করছে। একেই বলে conservation of virtue. একজন পাপ না করলে আর একজনের পুণ্য হবার জো নাই।

এই সময় একটি হ্যাটকোটধারী বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে ঘরে আসিয়া পাখার বেগুলেটার শেষ পর্যন্ত ঠৌলিয়া দিয়া হ্যাটটি আছড়াইয়া ফেলিয়া ফরাণের উপর থপু করিয়া বসিয়া পড়িল। এর নাম সত্যরত, সম্প্রতি লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়া কাজকর্মের চেষ্টা দেখিতেছে। সত্যরত হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—‘ওঃ, কি মর্শাকিলেই পড়া গেছে!’

সত্য প্রায়ই মর্শাকিলে পড়িয়া থাকে, সেজন্য তার কথায় কেহ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিল না। অগত্যা সে আপন মনে বলিতে লাগিল—‘সমস্ত দিন আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনি, বিকেলে যে একটু ফুর্তি করব তারও জো নেই। ভাবলুম আজ হ্যাটিনিতে সীতা দেখে আসি। অমনি পিসীমা ব’লে বসলেন—সতে, তুই ব’কে যাচ্ছিস, আমার সঙ্গে চল, সাণ্ডেলমশায়ের বক্তৃতা শুনবি। কি করি, যেতে হ’ল। কিন্তু সব মিথ্যে। সাণ্ডেলমশায় বলচেন ধর্মজীবরে মধুরত, আর আমি ভাবছি আরসোলা।’

নিতাই। আরসোলা?

সত্য। তিন টন আরসোলা। ফরওয়ার্ড কনট্রোল আছে, নভেম্বর-ডিসেম্বর শিপমেন্ট, চার্লিস পাউন্ড পনের শিলিং টন, সি-আই-এফ হংকং। চায়নায় লড়াই বাধবে কিনা, তাই আগে থাকতে রসদ সংগ্রহ হচ্ছে। বড়সাহেবের হুকুম—এক মাসের মধ্যে সমস্ত মাল পিপে-বন্দী হওয়া চাই। কোথেকে পাই বলুন তো? ওঃ, কি বিপদ!

নিতাই। হারি সতে, তুই না বেশ্মজ্ঞানী, তাদের না মিথ্যে কথা বলতে নেই?

সত্য। কেন বলতে নেই। পিসীমার কাছে না বললেই হ’ল।

নিবারণ। সতে, তোর সম্মানে ভাল বাবাজী কি স্বামিজী আছে?

সত্য। ক-টা চাই?

নিতাই। যা যাঃ, ইয়ারকি করিস নি। তোরা মন্ত্রতন্ত্রই মানিস না তা আবার বাবাজী।

সত্য। কেন মানব না। পিসীমার দাঁত কনকন করছিল, খেতে পারেন না, ঘুমুতে পারেন না, কথা কইতে পারেন না, কেবল পিসেমশায়কে ধমক দেন। বাড়িসুদ্ধ লোক ভয়ে অস্থির। পিপারামিস্ট, অস্পিরিন, মাদুলি, জলপড়া, দাঁতের পোকা বার কো-ও-রি, কিছুতে কিছু হয় না। তখন পিসেমশায় এসা জোর প্রার্থনা আরম্ভ করলেন যে তিন দিনের দিন দাঁত পড়ে গেল।

পরমার্থ চটিয়া উঠিয়া বলিল—‘দেখ সত্য, তুমি যা বোঝ না তা নিয়ে ফাজলামি ক’রো না। প্রার্থনাও যা মন্ত্রসাধনাও তা। মন্ত্রসাধনায় প্রচণ্ড এনার্জি উৎপন্ন হয় তা মান?’

সত্য। আলবৎ মানি। তার সাক্ষী রাজশাহির তড়িতানন্দ ঠাকুর, কলেজের ছেলেরা যাকে বলে রেডিও বাবা। বাবার দুই টর্কি, একটি পজিটিভ, একটি নেগেটিভ। আকাশ থেকে ইলেকট্রিসিটি শুষে নেন। স্পার্ক ঝাড়েন এক-একটি, আঠায়ো ইঞ্চি লম্বা। কাছে এগোয় কার সাধ্য,—সিলেক্টর চাচর মুড়ি দিয়ে দেখা করতে হয়।

নিবারণ। নাঃ, মিরচাই বেদান্ত ইলেকট্রিসিটি এর একটাও নিতাইদার ধাতে সইবে না। যদি কোনও নিরীহ বাবাজী সম্মানে থাকে তো বল। কিন্তু কোরামতি চাই, শূদ্ধ ভক্তিতত্ত্বে চলবে না। কি বলেন নিতাইদা?

পরমার্থ। তবে দমদমায় গুরুদ্বাবাবুর বাগানে চলুন, বিরিগুবাবার কাছে।

নিবারণ। আলিপুরের উকিল গুরুদ্বাবাবু? আমাদের প্রফেসর ননির শ্বশুর? তিনি আবার বাবাজী জোটালেন কোথা থেকে? সত্য, তুই জানিস কিছ?

সত্য। ননিদার কাছে শুনেছিলাম বটে গুরুদ্বাবাবু সম্প্রতি একটি গুরুদ্বা পাল্লায় পড়েছেন। শ্রী মারা গিয়ে অর্বাধ ভদ্রলোক একেবারে বদলে গেছেন। আগে তো কিছই মানতেন না।

নিবারণ। গুরুদ্বাবাবুর আর একটি আইবড় মেয়ে আছে না?

সত্য। ঝুঁচকী, ননিদার শালী।

নিবারণ। তার পর পরমার্থ, বাবাজীটি কেমন?

পরমার্থ। আশ্চর্য! কেউ বলে তাঁর বয়স পাঁচ-শ বৎসর, কেউ বলে পাঁচ হাজার, অথচ দেখতে এই নিতাইদার বয়সী যোধ হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে একটু হেসে বলেন—বয়স বলে কোনও বস্তুই নেই। সমস্ত কালা—একই কাল : সমস্ত স্থান—একই স্থান। যিনি সিম্ধ তিনি ত্রিকাল ত্রিলোক একসঙ্গেই ভোগ করেন। এই ধর—এখন সেপ্টেম্বর ১৯২৫, তুমি হাবশীবাগানে আছ। বিরিগুবাবা ইচ্ছে করলে এখনই তোমাকে আকবরের টাইমে আগ্রাতে অথবা ফোর্থ সেণ্টুরি বি. সি.তে পার্টলিপুত্র নগরে এনে ফেলতে পারেন। সমস্তই আপেক্ষিক কি না।

নিবারণ। আইনস্টাইনের পসার একেবারে মারিট?

পরমার্থ। আরে আইনস্টাইন শিখলে কোথেকে? শুনেছি বিরিগুবাবা যখন চেকোস্লোভাকিয়ায় তপস্যা করতেন তখন আইনস্টাইন তাঁর কাছে গভায়াত করত। তবে তার বিদ্যা রিলেটিভিটির বেশী এগোয় নি।

নিতাইবাবু উদ্গ্রীব হইয়া সমস্ত শুনিতোছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আচ্ছা, আইনস্টাইনের থিওরিটা কি বল তো?’

পরমার্থ। কি জানেন, স্থান কাল আর পর পরস্পরের ওপর নির্ভর করে। যদি স্থান কিংবা কাল বদলায়, তবে পাত্রও বদলাবে।

## বিরিণ্ডাবা

সত্য। ও হ'ল না, আমি সহজ ক'রে বলছি শুনুন। ধরুন আপনি একজন ভারি লোক, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে গেছেন, তখন আপনার ওজন ২ মণ ৩০ সের। সেখানে থেকে গেলেন গোল্ডালা কংগ্রেস কমিটিতে—সেখানে ওজন হ'ল মাত্র ৫ ছটাক, ফুয়ে উড়ে গেলেন।

নিবারণ। ঠিক। জনার্দন ঠাকুর পটলডাঙ্গায় কেনে আড়াই সের আলু, আর মেসে এলেই হয়ে যায় ন-পো।

নিতাই। আচ্ছা পরমার্থ, বিরিণ্ডাবা নিজে তো গ্রিকালিস্থ পুরুষ। ভক্তদের কোনও সুবিধে করে দেন কি?

পরমার্থ। তেমন তেমন ভক্ত হ'লে করেন বই কি। এই সৌদীন মেকিরাম আগরওয়ালার বরাত ফিরিয়ে দিলেন। তিন দিনের জন্যে তাকে নাইশ্টিন ফোর্টনে নিয়ে গেলেন, ঠিক লড়ায়ের আগে। মেকিরাম পাঁচ হাজার টন লোহার কড়ি কিনে ফেললে—ছ টাকা হন্দর। তার পরেই তাকে এক মাস নাইশ্টিন নাইশ্টিনে রাখলেন। মেকিরাম বেচে দিলে একুশ টাকা দরে। তখন আবার তাকে হাল আমলে ফিরিয়ে আনলেন। মেকিরাম এখন পনের লাখ টাকার মালিক। না বিশ্বাস হয়, অংক ক'রে দেখ।

নিতাইবাবু পরমার্থের দুই হাত ধরিয়া গদগদস্বরে বললেন—‘পরমার্থ ভাই রে, আমার একদুনি নিয়ে চল্ বিরিণ্ডাবার কাছে। বাবার পায়ে ধ'রে হত্যা দেব। খরচ যা লাগে সব দেব, ঘটি-বাটি বিক্রি ক'রব, গিন্নীর হাতে পায়ে ধ'রে সেই দশ ভরির গোট-ছড়াটা বন্ধক দেব। বাবার দয়ায় যদি হস্ত থাকেন নাইশ্টিন ফোর্টনে ঘুরে আসতে পারি, তবে তোমায় ভুলব না পরমার্থ। টেন পারসেন্ট—বুঝলে? হা ভগবান, হয়ে রে লোহা!’

নিবারণ। গুরুপদবাবু কিছ্ গুছিয়ে নিতে পরলেন?

পরমার্থ। তাঁর ইহকালের কোনও চিন্তাই নেই। শুনোঁছ বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই গুরুরকে দেবেন।

নিবারণ। এতদূর গড়িয়েছে? হ্যাঁরে সত্য, তোর নান্দা, তোর বউদি, ংরা কিছ্ বলছেন না?

সত্য। নান্দাকে তো জানই, ন্যালা-খ্যাপা লোক, নিজের এক্সপেরিমেন্ট নিয়েই আছেন। আর বউদি নিতান্ত ভালমানুষ। ওঁদের দ্বারা কিছ্ হবে না। কিছ্ করতে হয় তো তুমি আর আমি। কিন্তু দেরি নয়।

নিবারণ। তবে একদুনি নানির কাছে চল্। ব্যাপারটা ভাল ক'রে জেনে নিয়ে তার পর দমদমায় যাওয়া যাবে।

নিতাইবাবু কাগজ পেনসিল লইয়া লোহার হিসাব কষিতেছিলেন। দমদমা যাওয়ার কথা শুনিয়া বললেন—‘তোমরাও বাবার কাছে যাবে নাকি? সেটা কি ভাল হবে? এত লোক গিয়ে আবদার করলে বাবা ভড়কে যেতে পারেন। সত্যটা একে বোঝায় বিশ্ববকাট, ওর গিয়ে লাভ নেই। কেন বাপু, তাদের অমন খাসা ব্রাহ্মসমাজ রয়েছে, সেখানে গিয়ে হত্যা দে না, আমাদের ঠাকুর-দেবতার ওপর নজর দিস কেন? আমি বলি কি, আগে আমি আর পরমার্থ যাই। তার পর আর একদিন না হয় নিবারণ যেকো।’



নিবারণ : না না, আপনার কোনও ভয় নেই, আমরা মোটেই আবদার করব না শুধু একটু শাস্তিলাপ করব। সুবিধে হয় তো কাল বিকেলেই সব একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

প্রফেসর ননি কোনও কালে প্রফেসরি করে নাই, কিন্তু অনেকগুলি পাস করিয়াছে। সে বাড়িতে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া থাকে, সেজন্য বন্ধুবর্গ তাকে প্রফেসর আখ্যা দিয়াছে। রোজগারের চিন্তা নাই, কারণ পৈতৃক সম্পত্তি কিছু আছে। ননি গদুর্দপদ বাবুর জামাতা, সত্যরত্নের দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা এবং নিবারণের ক্লাসফ্রেন্ড।

নিবারণ ও সত্যরত্ন যখন ননির বাড়িতে পের্শিছিল তখন রাত্রি আটটা। বাহিরের ঘরে কেহ নাই, চাকর বলিল বাবু এবং বহুমা ভিতরের উঠানে আছেন। নিবারণ



কাঠি দিয়া ঘাঁটিতেছে

## বিরিঞ্চিবাবা

ও সত্য অন্তরে গিয়া দেখিল উঠানের এক পাশে একটি উনানের উপর প্রকাণ্ড ডেকাচিতে সবুজ রঙের কেনও পদার্থ সিঁধ হইতেছে, নানির স্ত্রী নিরুপমা তাহা কাঠি দিয়া ঘাঁটিতেছে। পাশের বারান্দায় একটা হারমোনিয়ম আছে, তাহা হইতে একটা রবারের নল আসিয়া ডেকাচির ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রফেসর ননি মালকোঁটা মারিয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নিবারণ বলিল—‘একি বউদি, এত শাগের ঘণ্টা কার জন্যে রাখছেন?’

নিরুপমা বলিল—‘শাগ নয়, ঘাস সেম্প হচ্ছে। ঠাঁর কত রকম খেয়াল হয় জানেন তো।’

নিবারণ। সেম্প হচ্ছে? কেন, ননির বুকি কাঁচা ঘাস আর হুজম হয় না?

ননি বলিল—‘নিবারণ, ইয়ারকি নয়। পৃথিবীতে আর অম্মাভাব থাকবে না।’

নিবারণ। সকলেই তো প্রফেসর ননি বা রোমান্থক জীব নয় যে ঘাস খেয়ে বাঁচবে।

ননি। আরে ও কি আর ঘাস থাকবে? প্রোটিন সিন্থেসিস হচ্ছে ঘাস হাইড্রোলাইজ হয়ে কার্বোহাইড্রেট হবে। তাতে দুটো অ্যামিনো-গ্রুপ জুড়ে দিলেই বস্। হেক্সা-হাইড্রক্সি-ডাই-অ্যামিনো—

নিবারণ। থাক, থাক। হারমোনিয়মটা কি জন্যে?

ননি। বুদ্ধলে না? অঞ্জিডাইজ করবার জন্যে। নিরু, হারমোনিয়মটা বাজাও তো।

নিরুপমা হারমোনিয়মের পেডাল চালাইল। সুর বাহির হইল না, রবারের নল দিয়া হাওয়া আসিয়া ডেকাচির ভিতর বদলগ করিতে লাগিল।

নিবারণ। শব্দই ভুড়ভুড়ি! আমি ভাললুম বুকি সংগীতরস রবারের নল ব’য়ে ঘাসের সঙ্গে মিশে সবুজ-অমৃতের চ্যাণ্ড সৃষ্টি করবে। যাক—বউদি বাবার খবর কি বলুন তো।

নিরুপমা স্তানমুখে বলিল—‘শোনেন নি কিছু? মা যাওয়ার পর থেকেই কেমন এক রকম হয়ে গেছেন। গণেশমামা কোথা থেকে এক গুরু জুটিয়ে দিলেন, তাঁকে নিয়েই একবারে তুময়। বাহাজ্ঞান নেই বললেই হয়, কেবল গুরু গুরু গুরু। অনেক কাল্মাণটি করছি কোনও ফল হয়নি। শুনছি টাকাকাড়ি সবই গুরুকে দেবেন। ব’চকীটার জনোই ভাবনা। তার কাছেই গিয়ে থাকতুম, কিন্তু শাশুড়ীর অসুখ, এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারছি না।’

সত্য বলিল—‘আচ্ছা নানি, তুমি তো বুকিয়ে সুকিয়ে বলতে পার?’

ননি। তা কখনও পারি? শব্দরম্যশায় ভাববেন ব্যাটা সম্পত্তির লোভে আমার ধর্মকর্মের ব্যাঘাত করতে এসেছে।

সত্য। তবে হুকুম দাও, প্রহারেণ ধনঞ্জয় ক’রে দিই।

নিরুপমা। না না জুলুম যদি কর তবে সেটা বাবার ওপরেই পড়বে। বাবাকে কষ্ট না দিয়ে যদি কিছু করতে পার তো দেখ।

সত্য। বড় শক্ত কথা। আচ্ছা বউদি, বিরিঞ্চিবাবার ব্যাপার কি রকম বলুন তো।

নিরুপমা। ব্যাপার প্রায় মাসখানেক থেকে চলছে। দমদমার বাগানে আছেন, সঙ্গে আছে তাঁর চেলা ছোট-মহারাজ কেবলানন্দ। গণেশমামা খিদমত করছেন। বাবা দিনরাত সেখানেই পড়ে আছেন। রোজ দু-তিনশ ভক্ত গিয়ে ধর্না দিচ্ছে, বিরিঞ্চিবাবার

অশ্রুত কথাবার্তা শোনবার জন্যে হাঁ করে আছে। প্রতি রবিবার রাতে হোম হচ্ছে তা থেকে এক-এক দিন এক-একটি দেবতার আবির্ভাব হচ্ছে। কোনও দিন রামচন্দ্র, কোনও দিন ব্রহ্মা, কোনও দিন বিষ্ণু, কোনও দিন শ্রীচৈতন্য। ষাট-তাক হোমঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় না, যারা খুব বেশী ভক্ত তারাই যেতে পারে। ব্রহ্মা বেরনোর দিন আমি ছিলুম।

সত্য। কি রকম দেখলেন?

নিরুপমা। আমি কি ছাই ভাল ক'রে দেখেছি? অশ্বকার ঘরে হোমকুণ্ডুর পিছনে আবিষ্কার মত প্রকাণ্ড মূর্তি, চারটে মস্তক, লম্বা লম্বা দাড়ি। আমার তো দেখেই দাঁতে দাঁত লেগে ফিট হ'ল। গণেশমামা ঘর থেকে টেনে বার ক'রে দিলেন। বদু'চকীর বরণ সাহস আছে, প্রায়ই দেখছে কিনা। কাল নাকি মহাদেব বার হবেন।

নিবারণ। কাল একবার আমরা বিরিণ্ডিবাবার চরণ দর্শন ক'রে আসি, ব'দি তাঁর দয়া হয় তবে কপালে হরতো মহাদেব দর্শনও হবে।

নিরুপমা। গণেশমামাকে বশ করুন, তিনি হুকুম না দিলে হোমঘরে ঢুকতে পাবেন না।

নিবারণ। সে আমি ক'রে নেব। কিন্তু সতে, তাকে নিয়ে যেতে সাহস হয় না তোর ম'খ বড় আলগা, তুই হেসে ফেলবি।

সত্য তার সমস্ত দেহ নাড়িয়া বলিল—‘কথ'খনো নয়, তুমি দেখে নিও, হাসে কোন' শা—ইল!’

নিবারণ। ও কি, জিব বার করলি যে?

সত্য। বেগ ইওর পাড'ন বউদি, খুব সামলে নিরেছি। পিসীমার কাছ ব'লে ফেললে রক্ষে থাকত না।

নিবারণ। তবে আজ আমরা চলি। হ্যাঁ, ভাল কথা। ননি, এমন কিছু বলতে পার য'তে খুব ধোঁয়া হয়?

ননি। কি রকম ধোঁয়া? যদি লাল ধোঁয়া চাও তবে নাইট্রিক অ্যাসিড অ্যান্ড ডামা, যদি বেগনী চাও তবে অয়োডিন ভেপার, যদি সবুজ চাও—

নিবারণ। আরে না না। প্লেন ধোঁয়া চাই।

ননি। তা হ'লে ট্রাই-নাইট্রো-ডাই-মিথাইল—

নিবারণ কান চাপিয়া বলিল—‘আবার আরম্ভ করলে রে! বউদি, এটাকে নিয়ে আপনার চলে কি ক'রে?’

নিরুপমা হাসিয়া বলিল—‘মামার বাড়িতে দেখেছি গোয়ালঘরে ভিজে খড় জ্বালে, খুব ধোঁয়া হয়।’

নিবারণ। ইউরেকা! বউদি, আপনিই নোবেল প্রাইজ পাবেন, ননেটার কিছু হবে না।

নিরুপমা। ধোঁয়া দিয়ে করবেন কি?

নিবারণ। ছু'চোর উপদ্রব হয়েছে, দেখি তাড়াতে পারি কি না।

## বিরিগ্ধাবা

গুরুদপদাবাবুর দমদমার বাগানবাড়ি পূর্বে বেশ সুসজ্জিত ছিল, কিন্তু তাঁর পত্নী গত হওয়া অবধি হতস্ত্রী হইয়াছে। সম্প্রতি বিরিগ্ধাবাবুর আধিষ্ঠানহেতু বাড়িটি মেরামত করানো হইয়াছে এবং জঙ্গলও কিছু কিছু সাফ হইয়াছে, কিন্তু পূর্বের গৌরব ফিরিয়া আসে নাই। গুরুদপদাবাবু সংসারের কোনও খবর রাখেন না, তাঁর শ্যালক গণেশই এখন সপরিবারে আধিপত্য করিতেছেন।

বৈকালপাচটার সময় নিবারণ, সত্যরত, পরমাধ্ব এবং নিতাইবাবু আসিয়া পৌঁছি-  
লেন। বাড়ির নীচে একটি বড় ঘরে শতরঞ্জ বিছাইয়া ভক্তবৃন্দের বসিবার ব্যবস্থা  
করা হইয়াছে। তার একপাশে একটি তক্তাপোশে গদি এবং বাঘের ছপ-মারা রাগের  
উপর নিরিগ্ধাবাবুর আসন। পাশের ঘরে ভক্ত মহিলাগণের স্থান। বাবাজী এখনও  
তাঁর সামান্যকিছু হঠাতে নামেন নাই। ভক্তের দল উদ্গ্রীব হইয়া বসিয়া আছে এবং  
মুদ্রাধারে বাবার মাহিমা গুঞ্জন করিতেছে। একটি সাহেবী পোশাক পরা প্রোট ব্যক্তি  
অলোচন কণ্ঠ সঙ্গীত করায় পা মূড়িয়া বসিয়া আছেন এবং অধীর হইয়া মাঝে মাঝে  
তাঁর কামানো গোফে পাক দিতেছেন। ইনি মিস্টার ও. কে. সেন, বার অ্যাট-ল।  
সম্প্রতি কয়লায় খানিতে অনেক টাকা লোকসান দিয়া ফর্মকর্মে মন দিয়াছেন।

পরমাধ্ব ও নিতাইবাবুকে ঘরে বসাইয়া নিবারণ ও সত্যরত বাহিরে আসিল এবং  
বাগানের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া ফটকের কাছে উপস্থিত হইল। ফটকের পাশেই  
এক সারি টালি-ছাওয়া ঘর, তাতে আস্তাবল এবং কোচমান, দরোয়ান, মালী ইত্যাদির  
খানিকটা স্থান।

হাস্যভাবের সম্মুখে মৌলবী বাছিরুদ্দ একটি ভাঙা বেগে বসিয়া কোচম্যান ঘোঁটি  
মিমা এবং দরোয়ান ফেঁকু পাঁড়ের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। মৌলবী সাহেবের নিবাস  
ফরিদপুর, ইনি গুরুদপদাবাবুর অন্যতম মুহুরী। গুরুদপদাবাবু ওকালতি ত্যাগ করায়  
বাছিরুদ্দের উপার্জন কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তিনি নিয়মিত মাসহারা পাইয়া  
থাকেন, সেজন্য মনিবকে সেলাম করিতে আসেন।

মৌলবী সাহেব ফরিদপুরী উদ্ভূত দুনিয়ার বর্তমান দুরবস্থা বিবৃত করিতে-  
ছিলেন, কোচমান ও দরোয়ান মাথা নাড়িয়া সায় দিতেছিল। অদূরে সহিস ঘোড়ার  
আগে ভলিতেছে এবং মাঝে মাঝে চম্পল ঘোড়ার পেটে সশব্দে খাবড়া মারিয়া বলিতেছে—  
‘আরে ঠহুর যা উল্লু।’ সামনের মাঠে একটি স্থলকায় বিভাল মুখভঙ্গী করিয়া  
মাগ খাইতেছে—প্রত্যহ বিরিগ্ধাবাবুর ভুক্তাবশিষ্ট মাছের মূড়া খাইয়া তার গরহজম  
হইয়াছে।

সত্যরত বলিল—‘আদাব মৌলবী সাহেব। মেজাজ তো দিবিা শরিফ? পরনাম  
পাঁড়জী! কোচমানজী আছা হায় তো? একে চেন না বুঝ? ইনি নিবারণ-  
বাবু, জামাইবাবুর দোস্ত। পুজোর জন্যে কিছু ভেট এনেছেন—কিছু মনে করবেন  
না মৌলবী সাহেব—আপনার দশ টাকা, পাঁড়জী আর কোচমানজীর পাঁচ-পাঁচ, সহিস  
মালী এদের আরও পাঁচ।’

সৌজন্যে অভিভূত হইয়া বাছিরুদ্দ, ফেঁকু এবং ঘোঁটি দন্তবিকাশ করিয়া বার বার  
সেলাম করিল এবং খোদা ও কালীমায়ীর নিকট ববুজীদের তরফি প্রার্থনা করিল।

মৌলবী বলিলেন—‘আর বাবুশায়, সে সব দিন খ্যান কমনে চলে গেছে।  
মা-ঠাকরোন বেহস্ত পাওয়া ইস্তক মোদের বাবুসায়েরে জান্ডা কলেজায় নেই। অত

ক'রে বললাম, হুজুর, অগন পসারডা নষ্ট করবেন না। তা কে শোনে?—খোদার মজি'।

নিবারণ বলিল—‘ও বাবাজীটাই যত নষ্টের গোড়া।’

ফেকু পাঁড়ে ভরসা পাইয়া মত প্রকাশ করিল—বিরিগিবা বাবাজী খোড়াই আছেন। তাঁর জনো ভি নাই, জটা ভি নাই। তিনি মছারি ভি খান, বর্কাড়ির গোস্ত ভি খান। দোনো সাঝ চা-বিস্কুট না হইলে তাঁর চলে না। এ সব বংগালী বাবাজী বিলকুল জুয়াচোর। আর ছোট-মহারাজ যিনি আছেন তিনি তো একটি বিচ্ছু, ফেকু পাঁড়েকে পর্যন্ত দংশন করিতে তাঁহার সাহস হয়। তিনি জানেন না যে উক্ত ফেকু পাঁড়ে মিউর্টনিমে তলোয়ার খেলায়া থা (যদিও ফেকু তখনও জন্মেন নাই)। একবার যদি মনিব হুকুম দেন, তবে লাঠির চোটে বাবাজীদের হাঁধি চুর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

মৌলবী জনাইলেন যে তাঁকেও কম অপমান সহ্য করিতে হয় নাই। মামাবাবু (গণেশ) যে তাঁর উপর লম্বাই চওড়াই করিবে তা তিনি বরদাস্ত করিবেন না। তিনি খানদানী মনিয়া, তাঁর ধমনীতে মোগলই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। যদিও লোকে তাঁকে বিছরুদ্দ বলে, কিন্তু তাঁর আদত নাম ছোদম খাঁ, তাঁর পিতার নাম জাহাঙ্গীর খাঁ, পিতামহের নাম আবদুল জব্বার, তাঁদের আদি নিবাস ফরিদপুর নয়—আরব দেশে, যাকে বলে তুর্খ। সেখানে সকলেই লুঙ্গি পরে এবং উদ্দ বলে, কেবল পেটের দায়ে তাঁকে বাংলা শিখিতে হইয়াছে। সেই আরব দেশের মধ্যখানে ইস্তানবুল, তার বাঁয়ে শহর বোগদাদ। এই কলকাতা শহরটা তার কাছে একেবারেই তুচ্ছ। বোগদাদের দখিন-বাগে মক্কা-শরিফ, সেখানকার পবিত্র কুয়ার জল আব-এ-জমজম তাঁর কাছে এক শিশি আছে। মনিব যদি হুকুম দেন তবে সেই জল ছিটাইয়া হালাল-পো-হালা ইবলিসের বাচ্চা দুই বাবাজী মায় মামাবাবুকে তিনি হা—ই সাত দরিয়ার পরে জাহান্নামের চোমাথায় পেঁছাইয়া দিতে পারেন।

নিবারণ বলিল—‘দেখুন মৌলবী সাহেব, আমরা বাবাজী দুটোকে তাড়াবই তাড়াব। যদি সুবিধে হয় তো আজই। কিন্তু একলা পেরে উঠব না। আপনি আর দরওয়াজী সঙ্গে থাকা চাই।’

ফেকু। মার-পিট হোবে?

নিবারণ। আরে না না। তোমাদের কোনও ভয় নেই। কেবল একটু চিল্লাচিল্লি করতে হবে। পারবে তো?

জব্বার। আলবৎ। জান কবুল। কিন্তু মনিব যদি গোসা হন?

নিবারণ বুঝাইল, মনিবের চটিবার কোনও কারণ থাকিবে না। একটু পরে সে আসিয়া যথাকর্তব্য বাতলইয়া দিবে।

নিবারণ ও সত্যরত বিরিগিবাবুর দরবার অভিমুখে চলিল। পথে গণেশমামার সঙ্গে দেখা, তিনি ব্যস্ত হইয়া হোমের অয়োজন করিতে বাইতেছেন। নিবারণ ও সত্যরতকে দেখিয়া বলিলেন—‘এই যে তোমরাও এসেছ দেখাছ, বেশ বেশ। হে'-হে', তার পর—বাড়ির সব হে'-হে'? নিবারণ, তোমার বাবা বেশ হে'-হে'? তোমার মা এখন একটু হে'-হে'? তোমার ছোট বোনটি হে'-হে'? সত্য, তোমার পিসেমশায় পিসীমা সফল—’

নিবারণের স্বজনবর্গ সকলেই হে'-হে'। সত্যরতেরও তদ্রূপ। সমস্তই গণেশ-

## বিবর্তনাব্যবস্থা

মামার আশীর্বাদের ফল। মামাবাবুর ভাবনায় ঘুম হইতেছিল না, এখন কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন।

সত্য বলিল—‘মামা, আপনার ছোট জামাইটির চাকরি হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তবে ছুটির পরেই আমাদের আপিসে একবার পাঠাবেন, একটা ভেক্যান্সি আছে।’

গণেশ। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। তোমরা হলে আপনার লোক, তোমরা চেষ্টা না করলে কি কিছ্ হয়? আপিস খুললেই সে তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

নিবারণ। মামাবাবু, একটি নিবেদন আছে। দেবদর্শন করিয়ে দিতে হবে।

গণেশ। তা যাও না বাবার কাছে। সকলেই তো গেছে।

নিবারণ। ও দেবতা তো দেখবই। আসল দেবতা দেখতে চাই—হোমঘরে।

গণেশমামা সভয়ে জিব কাটিয়া বলিলেন—‘বাপ রে, সে কি হয়! কত সাধ্য-সাধনা ক’রে তবে অধিকার জন্মায়। আর আমাদের সত্য তো—এই—এই—যাকে বলে—’

নিবারণ। বেসমজ্ঞানী। কিন্তু ওর ব্রহ্মজ্ঞান এখনও হয় নি। সত্য হচ্ছে দৈত্য কুলে প্রহ্লাদ, হিন্দু-খানিটা ঠিক বজায় রেখেছে। ও গীতা আওড়ায়, খিয়েটার দেশে সত্যনারায়ণের শিষ্য, মদনমোহনের খিচুড়ি-ভোগ, কালীঘাটের কালিয়া সমস্ত খায়। আর বলতে নেই, অপর্যাপ্ত হলেন নেহাত গুরুজন, নইলে ওর দু-চারটে বোলচাল শুনলে বড়বড়েন যে ও বড় বড় হিন্দুর কন কাটতে পারে।

গণেশ। যাই করুক, জাত গেলে আর ফিরে আসে না। তুমিও তো শুনতে পাই অথচ যাও।

নিবারণ। সে তো সম্ভাব্যই খায়। গুরুপদবাবুও চের খেয়েছেন। তা হ’লে দেবদর্শন হবে না? নিতান্তই নিরাশ করবেন? আচ্ছা, তবে চললাম।

সত্য। প্রণাম মামাবাবু। হ্যাঁ, একটা কথা—আমি বলি কি, আপনার জামাইটি এখন মাস চার-পাঁচ টাইপরাইটিং শিখুক। একবারে আনাড়ী, তাকে ঢুকিয়ে দিয়ে আমিই সায়েবের কাছে অপদস্থ হব। নেক্সট ভেক্যান্সিতে বরং চেষ্টা করা যাবে।

গণেশ। আরে না না না। চাকরি একবার ফসকে গেলে কি আর সহজে মেলে? না সত্য, লক্ষ্মী বাবা আমার, চাকরিটি ক’রে দিতেই হবে—হ্যাঁ—কি বলছিলে? তুমি এখন গীতা-টিতা প’ড়ে থাক? খুব ভাল। তা—হোমঘরে গেলে তেমন দোষ হবে না। একটু গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে যেরো—দুজনেই। আচ্ছা—তা হ’লে জামাইটির কথা ভুলো না।

গণেশ-মামা তফাতে গেলে নিবারণ বলিল—‘এখন পর্যন্ত তো বেশ আশাজনক বোধ হচ্ছে, শেষ রক্ষা হলেই হয়। অমূল্য, হাবলা এরা সব এসেছে?’

সত্য। হ্যাঁ, তারা দরবারে রয়েছে। ঠিক সময় হাজির হবে। আচ্ছা নিবারণদা, মামাবাবুর কিছ্ বখরা আছে নাকি?

নিবারণ। ভগবান জানেন। গুরুপদবাবু যত দিন সংসারে নির্লিপ্ত থাকেন, মামাবাবুর তত দিনই সুবিধে।

বিরিঞ্চিবাবা সভা অলংকৃত করিয়া বসিয়াছেন। তাঁর চেহারাটি বেশ লম্বা-চওড়া, গোরবর্ণ, মৃদুভিত মৃদু। সুপদ্ম গালের আড়াল হইতে দুইটি উজ্জ্বল চোখ উঁকি মারিতেছে। দূ-পরসা দামের শিঙাড়ার মত সুবৃহৎ নাক, মৃদু হাস্যমণ্ডিত প্রশস্ত ঠোঁট, তার নীচে খাঁজে খাঁজে চিব্বকের স্তর নামিয়াছে। স্বামীগিরির উপযুক্ত মূর্তি। অঙ্গে গৈরিকরঞ্জিত আলখাল্লা, মস্তকে ঐরূপ কানঢাকা টুপি। বয়স ঠিক পাঁচ হাজার বলিয়া বোধ হয় না, যেন পঞ্চাশ কি পঞ্চাশ। বাবার বেদীর নীচে ডান-দিকে ছোট-মহারাজ কেবলানন্দ বিরাজ করিতেছেন। ইহার বয়স কয় শতাব্দী তাহা ভক্তগণ এখনও নির্ণয় করেন নাই, তবে দেখিতে বেশ জ্যোতান বলিয়াই মনে হয়। ইনিও গুরুদর অনুরূপ বেশধারী, তবে কাপড়টা সস্তাদরের। বেদীর নীচে বাঁ-দিকে শীর্ণকায় গুরুদপদাবদ্ বেদীতে মাথা ঠেকাইয়া অধঃশায়িত অবস্থায় আছেন, জাগ্রত কি নির্দ্রিত বুদ্ধিতে পারা যায় না। পাশের ঘরে মহিলাগণের প্রথম শ্রেণীতে একটি সতর-আঠার বছরের মেয়ে লাল শাড়ির উপর এলোচুল মেলিয়া বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে গুরুদপদাববুর দিকে করুণ নয়নে চাহিতেছে। সে বৃচ্ছকী, গুরুদপদাববুর কনিষ্ঠা কন্যা। ভক্তবৃন্দের অনেকে সটান লম্বা অবস্থায় উপদ্রু হইয়া যুক্তকর সম্মুখে প্রসারিত করিয়া পড়িয়া আছেন। অবশিষ্ট সকলে হাতজোড় করিয়া পা ঢাকিয়া বাবার বচনামৃত পানের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া বসিয়া আছেন।

সত্য ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ভক্তমণ্ডলীর ভিতরে বসিয়া পড়িল। নিবারণ ছোট-মহারাজের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া একেবারে বিরিঞ্চিবাবার পা জড়াইয়া ধরিল। বাবা প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন—‘চেনা চেনা বোধ হচ্ছে!’

নিবারণ। অধমের নাম নিবারণচন্দ্র।

বিরিঞ্চি। নিবারণ? ও, এখন বুদ্ধি তোমার ওই নাম? কোথা যেন দেখেছি তোমায়,—নেপালে? উহু, মুরশিদাবাদে। তোমার মনে থাকবার কথা নয়। জগৎ-শেষের কুঠিতে, তার মায়ের শ্রাদ্ধের দিন। অনেক লোক ছিল—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রায়-রায়ান জানকীপ্রসাদ, নবাবের সিপাহী-সলার খান-খানান মহস্বৎ জং, সুতোনুটির আমিরচন্দ্র—হিস্তিতে যাকে বলে উমিচাঁদ। তুমি শেঠজীর খাজাগী ছিলে, তোমার নাম ছিল—রোস-মোতিরাম। উঃ, শেঠজী খুব খাইয়েছিল, কেবল সুতোনুটির বাবুদের পাতে মন্ডা কম পড়ে, তারা গালাগাল দিয়ে চলে যায়।—তা মোতিরাম, উহু,—নিবারণচন্দ্র, তুমি ধুজুটি মন্ত্র জপ করতে শেখ, তাতে তোমার সুবিধে হবে। রোজ ভোরে উঠেই একশ-আটবার বলবে—ধুজুটি—ধুজুটি—ধুজুটি, খুব তাড়াতাড়ি। আচ্ছা, এখন বস গিয়ে।

নিবারণ পুনরায় পায়ের ধূলা লইল এবং তাহা চাটবার ভান করিয়া ভক্তদের মধ্যে গিয়া বসিল।

নিতাইবাবু চুপি চুপি পরমার্থকে বলিলেন—‘ব্যাপার দেখলে? নিবারণটা আসবামার বাবার নজরে পড়ে গেল, আর আমি-ব্যাটা দেড় ঘণ্টা হাঁ করে বসে আছি। একেই বলে বরাত। এইবার একবার উঠে গিয়ে পা জড়িয়ে ধরব, যা থাকে কপালে।’

যারা ভূমিসাৎ হইয়া পড়িয়া ছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি স্থূলকায় বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর পরিধানে মিহি জরিপাড় ধূতি, গিলে-করা আশ্রিত পাঞ্জাবি, তার ভিতর দিয়া

সমুদ্র সোনার হার দেখা যাইতেছে। ইনি বিখ্যাত মৎস্যসন্দী গোবর্ধন মল্লিক, সম্প্রতি তৃতীয়পক্ষ ঘরে আনিয়াছেন। গোবর্ধনবাবু আস্তে আস্তে উঠিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন—‘বাবা, প্রবৃত্তিমার্গ’ আর নিবৃত্তিমার্গ’ এর কোনটা ভাল?’

বাবা ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন—‘ঠিক ঐ কথা তুলসীদাস আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমরা আহার গ্রহণ করি। কেন করি? ক্ষুধা পায় ব’লে। কি আহার, করি? অন্নবাজন ফলমূল মৎস্য মাংসাদি। আহার করলে কি হয়? ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। ক্ষুধা একটা প্রবৃত্তি, আহারে তার নিবৃত্তি। অতএব ভোগের মূল হচ্ছে প্রবৃত্তি, ভোগের ফল হচ্ছে নিবৃত্তি। তুলসী ছিল সন্ন্যাসী। আমি বললুম—বাপু, ভোগ না হ’লে তোমার নিবৃত্তি হবে না। তার রামায়ণ লেখা শেষ হ’লে তাকে রাজা মানসিংহ ক’রে দিলুম। অনেক বিষয়-সম্পাদিত করেছিল, কিন্তু কিছুই গইল না। তার ব্যাটা জগৎসিংহ বাঙালীর মেয়ে বে ক’রে সমস্ত উড়িয়ে দিলে। বাঁকম তার বইএ সে-কথা আর লেখে নি।’

ব্যারিস্টার ও. কে. সেন বলিলেন—‘ওআন্ডারফুল!’

নিতাইবাবু আর থাকিতে পারিলেন না। ছুটিয়া গিয়া বাবার সম্মুখে গলবস্ত্র চইয়া বলিলেন,—‘দয়া কর প্রভু!’

বাবা দ্রু কুণ্ঠিত করিয়া বলিলেন—‘কি চাই তোমার?’

নিতাইবাবু খতমত খাইয়া বলিলেন—‘নাইণ্টিন ফোর্টিন!’

সত্যরতের একটা মহৎ রোগ—সে হাসি সামলাইতে পারে না। সে নিজের বেশ গাম্ভীর্য হইয়া পরিহাস করিতে পারে, কিন্তু অপরের মুখে অশ্রুত কথা শুনিলে গাম্ভীর্যরক্ষা কঠিন হয়। হাস্য দমনের জন্য সত্য একটা মুষ্টিযোগ ব্যবহার করিয়া থাকে। গুরুজনদের সমক্ষে হাসির কারণ উপস্থিত হইলে সে কোনও ভয়াবহ অবস্থায় কল্পনা করে। তবে সব সময় তাতে উপকার হয় না।

বিরিণ্ডাবা বলিলেন—‘নাইণ্টিন ফোর্টিন? সে কি?’

নিবারণ চুপি চুপি বলিল—‘ওআন-নাইন-ওআন-ফোর, ক্যালকটা। নো রিশলাই? টাই এগেন মিস!’

সত্যরত ধ্যান করিতে লাগিল—ছুতার মিস্ত্রী তার পিঠের উপর রাঁদা চালাইতেছে। চোকলা চোকলা চামড়া উঠিয়া যাইতেছে। ওঃ সে কি অসহ্য যন্ত্রণা!

নিতাইবাবু বলিলেন—‘সাতটি দিনের জন্যে আমায় লড়ায়ের আগে নিয়ে যান থানা, সপ্তায় লোহা কিনব—দোহাই বাবা!’

বিরিণ্ডা। তোমার কি করা হয়?

নিতাই। আজ্ঞে ভলচার বাদাসের আপসে লেজার-কিপার, কুলে দেড়-শ টাকা মাটনে, সংসার চলে না।

বিরিণ্ডা। ষড়ৈশ্বর্য সন্তায় হয় না বাপু, কঠোর সাধনা চাই। মূল্যধারচক্রে ঠেলা দিয়ে কুলকুণ্ডলিনীকে আন্ড্রাচক্রে আনতে হবে, তার পর তাকে সহস্রার পশ্বে তুলতে হবে। সহস্রারই হচ্ছেন সূর্য। এই সূর্যকে পিছু হটাতে হবে। সূর্যবিজ্ঞান আমরা না হ’লে কালস্তম্ভ করা যায় না। তাতে বিস্তর খরচ—তোমার কল্প নয়। ডুইম অষ্টাত্ত কিছুদিন মাত’শ্চন্দ্রমস্ত জপ কর। ঠিক দুপ্পর বেলা সূর্যের দিকে গেয়ে একশ-আটবার বলবে—মাত’শ্চ-মাত’শ্চ-মাত’শ্চ,—থুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু খণ্ডপাণ, চোখের পাতা না পড়ে, জিব জড়িয়ে না যায়,—তা হ’লেই মরবে।



নিতাইবাবু বিরস বদনে ফিরিয়া আসিলেন।

বিরিঞ্চিবাবা বলিলেন—‘ধন-দৌলত সকলেই চায়, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রে পড়া চাই। এই নিয়মই তো যিশুর সঙ্গে আমার ঝগড়া। যিশু বলত, ধনীর কখনও স্বর্গরাজ্য লাভ হবে না। আমি বলতুম—তা কেন? অর্থের সদ্ব্যবহার করলেই হবে। আহা বেচারা বেথোরে প্রাণটা খোয়ালে।’

মিস্টার সেন সবিস্ময়ে বলিলেন—‘এক্সকিউজ মি প্রভু, আপনি কি জিসস ক্রাইস্টকে জানতেন?’

বিরিঞ্চি। হাঃ হাঃ যিশু তো সেদিনকার ছেলে।

মিস্টার সেন। মাই ঘড!



‘মাই ঘড!’

সত্যের কানের ভিতর গগ্গাফড়িং, নাকের ভিতরে গুবরে পোকা কুরিমা কুরিয়া খাইতেছে।

মিস্টার সেন নিবারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ইনি তা হ’লে গোটাঁমা বড়ঢাকেও জানতেন?’

নিবারণ। নিশ্চয়। গৌতম বুদ্ধ কোন্ ছার, প্রভু মনু-পরশুরের সঙ্গে এক ছিলিমে গাঁজা খেতেন। সম্ভার সঙ্গে গুর আলাপ ছিল। ভগীরথ, টুটেন খামেন, নেবু-চাউ-নাজুর, হাম্মুরাবি, নিওলিথিক ম্যান, পিথেকান্থ্রোপস ইরেক্টস, মায় মিসিং লিংক।

মিস্টার সেন চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন—‘মাই!’

সাতটা বাঘ সত্যর পিছনে তাড়া করিয়াছে। সামনে তিনটা ভালুক থাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বিরিঞ্চিবাবা কহিলেন—‘একবার মহাপ্রলয়ের পর বৈবস্বত আমার বললে—নীল-লোহিত কল্পে কি? না, শ্বেতবরাহ কল্প তখন সবে শুরু হয়েছে। বৈবস্বত বললে—মানুষ তো সৃষ্টি করলুম, কিন্তু ব্যাটারা দাঁড়াবে কোথা, খাবে কি?—চার-দিকে জঙ্গল খই খই করছে। আমি বললুম—ভয় কি বিবু, আমি আছি, সুবৈবজ্ঞান

আমার মূঠোর মধ্যে। সর্বের তেজ বাড়িয়ে দিলুম, চৌ ক'রে জল শুকিয়ে গেল, বসুন্ধরা ধনধান্যে ভরে উঠল। চন্দ্র-সুৰ্য চালাবার ভার আমারই ওপর কিনা।

মিস্টার সেন কেবল মূখব্যাধান করিলেন।

সত্য মরিয়া গিয়াছে। পঞ্জাব মেলের সঙ্গে দার্জিলিং মেলের কলিশন—বক্তারক্তি—পিসীমা—

কিছুতেই কিছু হইল না। পুঞ্জীভূত হাসি সত্যরতের চোখ নাক মুখ ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। সে তখন নিরুপায় হইয়া বিপুল চেষ্টায় হাসিকে কান্নায় পরিবর্তিত করিল এবং দৃ-হাতে মুখ ঢাকিয়া ভেউ ভেউ করিয়া উঠিল।

বিরিঞ্চিবাবা বলিলেন—‘কি হয়েছে, কি হয়েছে—আহা, ওকে আসতে দাও আমার কাছে।’

সত্য নিকটে গিয়া বলিল—‘উদ্ভার কর বাবা, মানবজন্মে যেম্মা ধ'রে গেছে। আমার হরিণ ক'রে সেই স্ত্রোত যুগে কব্ব মূনির আগ্রমে ছেড়ে দাও বাবা! অর্থ চাই না, মান চাই না, স্বর্গও চাই না। শুধু চাট্টি কচি ঘাস, শকুন্তলার নিজের হাতে ছেঁড়া। আর এক জোড়া শিং দিও প্রভু, দৃশ্মন্তটাকে যাতে গর্দভিয়ে দিতে পারি।’

নিবারণ বেগতিক দেখিয়া বলিল—‘ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বাবা। বিস্তর শোক পেয়েছে কিনা।’

ঘড়িতে সাতটা বাজিল। দৈনিক পন্ধ্যতি অনুসারে এই সময় বিরিঞ্চিবাবা ইঠাৎ তুরীয় অবস্থাপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি চন্দ্র বদর্শন্য কঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন, কেবল তাঁর চোঁট দুটি ঈষৎ নড়িতে লাগিল। মামাবাবু, চেলামহারাজ এবং দুইজন ভক্ত বাবার শ্রীপদ চাংদোলা করিয়া সাধনক্ষে লইয়া গেলেন। সভা আজকের মত ভঙ্গ হইল। ভক্তগণ ক্রমশ বিদায় হইতে লাগিলেন।

নিতাইবাবু বলিলেন—‘বিকের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপান্য চকর! এ রকম বাবাজী আমার পোষাবে না। ক্যামতা যদি থাকে তবে দৃ-চারটে নমুনা দেখা না বাপু। তা নয়, সত্যযুগে কি করেছিলেন তারই ব্যাখ্যান। চল পরমার্থ, সাতটা কুড়ির ট্রেন এখনও পাওয়া যাবে। নিবারণ আর সতেরটার খোঁজে দরকার নেই। তারা নিজের নিজের পথ দেখবে। দেখ পরমার্থ, কাল না হয় মিরচাই-বাবার কাছেই নিয়ে চল।’

সত্যরত বৃচকীকে বদর্শন্য বাহির করিয়া বলিল—‘দেখুন, একটু চা খাওয়াতে পারেন? নিবারণ-দাও আসবে এখনই। ওঃ, গলাটা বন্ধ চিরে গেছে।’

বৃচকী বলিল—‘চিরবে না?—যা চে'চাচ্ছিলেন! জল চড়িয়ে দিচ্ছি, বসুন একটু। আচ্ছা, আমার বাবার সামনে কি কান্ডটা করলেন বলুন তো? কি ভাববেন তিনি?’

সত্য মনে মনে বলিল, তোমার বাবা তো বেহুশ ছিলেন। প্রকাশ্যে বলিল—‘একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলোছি নম? ভারি অন্যায় হয়ে গেছে, আর ক'খনো অমন হবে না। আপনার বাবার কাছে মাপ চেয়ে তাকে বদর্শি ক'রে তবে বাড়ি ফিরব।’

বৃচকী। বাবার আবার বদর্শি-অবদর্শি। বেণ্চে আছেন এই পর্বন্ত, কে কি করছে বলছে তা জানতেও পারছেন না।

সত্য। থাকবে না, এমন দিন থাকবে না। আপনি দেখে নেবেন—ওই যে, নিবারণ-দা আসছেন।

রাতি ন-টা। হোম আরম্ভ হইয়াছে। ভক্তের দল পূর্বেই বিদায় হইয়াছে। হোমঘরে আছেন কেবল বিরিঞ্চিবাবা, গুরুদাদাবাবু, বৃচ্চকী, মামাবাবু, নিবারণ, সত্যরত এবং গোবর্ধনবাবু। ইনি একজন বিশিষ্ট ভক্ত, বাবার জন্য তেতলা আশ্রম নির্মাণ করিয়া দবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। হোমঘরটি ছোট, দরজা-জানালা প্রায় সমস্তই বন্ধ, প্রবেশের পথ মামাবাবু আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ছোট-মহারাজ অর্থাৎ কেবলানন্দ, বাবার নৈশ আহার চরু প্রস্তুত করিবার জন্য অনগ্র ব্যস্ত আছেন। ঘরে একটি মাত্র ঘৃতপ্রদীপ মিটমিট করিতেছে। বিরিঞ্চিবাবা যোগাসনে ধ্যানমগ্ন, সম্মুখে হোমকুণ্ড। পিছনে গুরুদাদাবাবু ও তাঁর কন্যা উপবিষ্ট। তাহাদের এক-পাশে নিবারণ ও সত্যরত, অপর পাশে গোবর্ধনবাবু বসিয়া আছেন।

অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া বিরিঞ্চিবাবা কোষা হইতে জল লইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিলেন। ঘৃতপ্রদীপ নিবিয়া গেল। হোমগ্নির শিখা নাই, কেবল কয়েক খণ্ড অঙ্গার আরম্ভ হইয়া আছে। বিরিঞ্চিবাবা তখন মুখের উপর হাত কাঁপাইয়া ভীষণ গালবাদ্য আরম্ভ করিলেন। সেই গম্ভীর বৃ-বৃ-বৃ-বৃ নিনাদে ক্ষুদ্র গৃহ কম্পিত হইতে লাগিল।

সত্যরত বৃচ্চকীর কানে কানে বলিল—‘বৃচ্চ, ভয় করছে।’ বৃচ্চকী বলিল—‘না।’

সহসা হোমকুণ্ড হইতে নীলাভ অগ্নিশিখা নির্গত হইল। সেই ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোকে সকলে দেখিলেন—মহাদেবই তো বটে!—হোমকুণ্ডের পশ্চাতে ব্যাঘ্রচর্মধারী হাড়মালাবিভূষিত পিনাকডমরুপাণ ধবলকান্তি দস্তুরমত মহাদেব।

গুরুদাদাবাবু নির্বাক নিশ্চল। গোবর্ধন মল্লিক তাঁর কারবার এবং তৃতীয়পক্ষ সংক্রান্ত অভাব-অভিযোগ করণ স্বরে দেবাদিদেবকে নিবেদন করিতে লাগিলেন। গণেশ-মামা শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—যেটি তাঁর ছোট মেয়ে মহাকালী-পাঠশালায় শিখিয়াছে।

নিবারণ সত্যরতকে চুপিচুপি বলিল—‘এইবার।’ সত্যরত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—‘বম্ বাবা মহাদেব!’

একটু পরে হঠাৎ বাহিরে একটা কলরব উঠিল। তারপর চিৎকার করিয়া কে বলিল—‘আগ লগা হায়া।’

বিরিঞ্চিবাবার গালবাদ্য থামিল। তিনি চঞ্চল হইয়া ইতস্তত চাহিতে লাগিলেন। মামাবাবু ব্যস্ত হইয়া বাহিরে গেলেন।

‘আগুন—অগুন—বেরিয়ে আসুন শিগ্গির।’ ঘন ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘরে ঢুকিতে লাগিল। বিরিঞ্চিবাবা এক লাফে গৃহত্যাগ করিলেন। গোবর্ধনবাবু চিৎকার করিতে করিতে বাবার পদানুসরণ করিলেন, বৃচ্চকী পিতার হাত ধরিয়া বলিল—‘বাবা বাবা, ওঠ!’ নিবারণ কহিল—‘এখন যাবেন না, একটু বসুন, কোনও ভয় নেই।’

মহাদেবের টনক নড়িল। তিনি উসখুস করিতে লাগিলেন। নিবারণ একটা বাতি জ্বালিল। মহাদেব পিছনের দরজা দিয়া পলায়নের উপক্রম করিলেন—অর্মান সত্যরত জাপটাইয়া ধরিল।

মহাদেব বলিলেন—‘অঃ—ছাড়—ছাড়—লাগে, মাইরি এখন ইয়ারকি ভল লগে না—চান্দিকে আগুন—ছেড়ে দাও বলছি।’

সত্যরত বলিল—‘আরে অত ব্যস্ত কেন। একটু আলাপ পরিচয় হ’ক। তারপর ক্যাবলরাম, কান্দন থেকে দেবতাগিরি করা হচ্ছে?’

## বিরিগ্ধিবাৰা

বাহিৰ হইতে দু-চাৰজন লোক হোমঘৰে প্ৰবেশ কৰিল। ফেৰু পাড়ৈৰ জিম্মায়  
বেবলানন্দকে দিয়া নিবাৰণ ও সত্যব্ৰত বিস্ময়-বিমূঢ় গদুৰুপদবাবু ও তাঁৰ কন্যাকে  
বাহিৰে আনিল।



‘আঃ—ছাড়—ছাড়—লাগে’

বাড়িতে আগুন লাগে নাই। পাশেৰ ঘৰে খানিকটা ভিজা খড় কে জ্বলাইয়া  
দগািছিল। দৰোয়ান, মৌলবী সাহেব, কোচমান এবং অমূল্য হাবলা প্ৰভৃতি সত্যব্ৰতৰ  
অনুচৰবন্দ মিথ্যা হল্লা কৰিয়াছে।

বিরিণ্ডাবা ভাঙেন কিন্তু মচকান না। বলিলেন—‘কেমন গুরুপদ, এখন আশা মিটল তো? যে নাস্তিক, তার দিব্য দৃষ্টি হবে কেন? তাই তোমার কপালে দেবতা দেখা দিয়েও দিলেন না। শেষটার মানুষের মূর্তি ধ’রে বিদ্রূপ করলেন।’

সত্যরত বলিল—‘বিদ্রূপ ব’লে বিদ্রূপ! মহাদেব প’চে গিয়ে বেরুল ক্যাবলা। বিরিণ্ডাবা হয়ে গেলেন জোচ্চোর।’

গোবর্ধনবাবু বলিলেন—‘ব্যাটা আমাদের সঙ্গে চালাকি? গোবর্ধন মল্লিক পাঁচটা হোসের মুচ্ছন্দী, বড় বড় ইংরেজ চরিগে খায়,—তাকে তুমি ঠকাবে? মারো শালেকো দুই খাবড়া।’

গুরুপদবাবু এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। বলিলেন—‘না না, যেতে দাও, যেতে দাও। সত্য, গাড়িটা জুড়িয়ে এ’দের স্টেশনে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। কেউ যেন কিছু না বলে।’

তম্পতলপা গুছানো হইলে সত্য শিষ্য বিরিণ্ডাবাকে গাড়িতে তুলিয়া দিল। বিদায়কালে বলিল—‘প্রভু, তা হ’লে নিতান্তই চললেন? চন্দ্র-সূর্য আপনার জিম্মায় রইল, দেখবেন যেন ঠিক চলে। দম দিতে ভুলবেন না, আর মধ্যে মধ্যে অয়েল করবেন।’

ভিড় কমিলে গুরুপদবাবু বলিলেন—‘বাবা নিবারণ, বাবা সত্য, তোমরা আমায় রক্ষা করছ, এ উপকার আমি ভুলব না। আজ তোমরা এখানেই খাওয়া-দাওয়া ক’রে থাক, অনেক রাত হয়েছে। একি সত্য, তোমার হাতে রক্ত কেন?’

সত্য। ও কিছু নয়, ধস্তাধস্তির সময় মহাদেব একটু কামড়ে দিয়েছিলেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না, বিশ্রাম করুন গিয়ে।

গুরুপদ। তবে তুমি আমার সঙ্গে এস, বদ’চকী টিংচার আয়োডিন দিয়ে বেঁধে দেবে এখন।

\*

\*

\*

আহারান্তে সত্য বলিল—‘ওঃ, কি মর্শকিলেই পড়া গেছে।’

নিবারণ বলিল—‘আবার কি হ’ল রে?’

সত্য। নিবারণ-দা।

নিবারণ। বল না কি।

সত্য। নিবারণ-দা!

নিবারণ। ব’লেই ফ্যাল না কি।

সত্য। আমি বদ’চকীকে বে করব।

নিবারণ। তা তো বুদ্ধতেই পারছি। কিন্তু তোর সঙ্গে বিয়ে যদি না দেয়?

সত্য। আলবৎ দেবে, বদ’চকীর বাপ দেবে।

নিবারণ। বাপ না হয় রাজী হ’ল, কিন্তু মেয়ে কি বলে?



‘যাঃ’

সত্য। বড় গোলমালে জবাব দিচ্ছে।

নিবারণ। কি বলে বুঁচকী?

সত্য। বললে—যাঃ।

নিবারণ। দূর গাথা, যাঃ মানেই হ্যাঁ।



ভরতের সঙ্গে বশিষ্ঠাদি যে সকল ঋষিগণ মহিষাশূর ও কুলপতিগণ চিত্রকূট পর্বতে গিয়াছিলেন তাহারা সকলে রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় প্রত্যানয়নের জন্য নানা-প্রকার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সত্যসন্ধ রাম অটল রহিলেন। অবশেষে মহর্ষি জাবালি বলিলেন—

\*‘রাম, তুমি অতি সুবোধ, সামান্য লোকের ন্যায় তোমার বান্ধব যেন অনর্থদর্শিনী না হয়। জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে এবং একাকীই বিনষ্ট হয়, অতএব মর্ত্যাপিতা বলিয়া যাহার স্নেহাসক্তি হইয়া থাকে সে উন্মত্ত।...পিতার অনুরোধে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম সংকটপূর্ণ অরণ্য আশ্রয় করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে তুমি সেই সুসমৃদ্ধ অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। সেই এক-বেণীধরা নগরী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি তথায় রাজভোগে কালক্ষেপ করিয়া দেবলোকে ইন্দ্রের ন্যায় পরম সুখে বিহার করিবে। দশরথ তোমার কেহ নহেন; তিনি অন্য, তুমিও অন্য।...বৎস, তুমি স্ববান্ধবদোষে বশা নষ্ট হইতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম লইয়া থাকে, আমি তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছি, তাহারা ইহলোকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অন্তে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। দেখ, ইহাতে অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয়, কারণ, কে কোথায় শূন্যিয়াছে যে মৃতব্যক্তি আহার করিতে পারে?...যে সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা যজ্ঞ তপস্যা দান প্রভৃতি কার্যের বিধান আছে, ধীমান্ মনুষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সেইসকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে। অতএব রাম, পরলোকসম্বন্ধ ধর্ম নামে কোন পদার্থই নাই, তোমার এইরূপ বান্ধব উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যেকের অনুষ্ঠান এবং পরে ফের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। ভারত তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি সর্বসম্মত বান্ধবের অনুসরণপূর্বক রাজ্যভার গ্রহণ কর।’

জাবালির কথা শুনিয়া রামচন্দ্র ধর্মবান্ধব অবলম্বনপূর্বক কহিলেন—‘তপোধন, আপনি আমার হিতকামনায় যাহা কহিলেন তাহা কলুতঃ অকার্য, কিন্তু কর্তব্যবৎ

\* বাল্মীকী রামায়ণ। অযোধ্যাকাণ্ড। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য-কৃত অনুবাদ।

প্রতীয়মান হইতেছে। আপনার বুদ্ধি বেদ-বিরোধনী, আপনি ধর্মভ্রষ্ট নাস্তিক। আমার পিতা যে আপনাকে যাজকগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন আমি তাঁহার এই কার্যকে যথোচিত নিন্দা করি। বৌদ্ধ যেমন তস্করের ন্যায় দণ্ডাহ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে। অতএব যাহাকে বেদ-বাহিনীকৃত বলিয়া পরিহার করা কর্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সঙ্গে সম্বাষণও করিবেন না।...

জাবালি তখন বিনয় বচনে কহিলেন—‘রাম, আমি নাস্তিক নহি, নাস্তিকের কথাও কহিতেছি না। আর পরলোক প্রভৃতি যে কিছুই নাই তাহাও নহে। আমি সময় বদ্বিধা নাস্তিক হই, আবার অবসরকালে আস্তিক হইয়া থাকি। যে কালে নাস্তিক হওয়া আবশ্যিক, সেই কাল উপস্থিত। এক্ষণে তোমাকে বন হইতে প্রতিনয়ন করিবার নিমিত্ত এইরূপ কহিলাম, এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই আবার তাহা প্রত্যাহার করিতেছি।’

জাবালির কথা রামায়ণে এই পর্যন্ত আছে। যাহা নাই তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

মহর্ষি জাবালি ক্রান্তদেহে বিষ্ণুচিহ্নে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। সমস্ত পথ তাঁহাকে নীরবে অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কারণ অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহার সংস্রব প্রায় বর্জন করিয়াই চলিয়াছিলেন। খর্বট খল্লাট খালিট প্রভৃতি কয়েকজন ঋষি তাঁহাকে দূর হইতে নির্দেশ করিয়া বিদ্রূপ করিতেও দ্রুতী করেন নাই।

অযোধ্যায় বিপ্রগণ কেহই জাবালিকে শ্রদ্ধা করিতেন না। স্বয়ং রাজা দশরথ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া এ পর্যন্ত তাঁহাকে কোন লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু এখন রামচন্দ্র কর্তৃক জাবালির প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে। সহযাত্রী বিপ্রগণের ব্যবহার দেখিয়া জাবালি স্পষ্টই বুদ্ধিতে পারিলেন যে তন্ত তৈলমধ্যে মৎস্যের ন্যায় তাঁহার অযোধ্যায় বাস করা অসম্ভব হইবে।

রামচন্দ্রের উপর জাবালির কিছুমাত্র ক্রোধ নাই, পরন্তু তিনি রামের ভবিষ্যতের জন্য কিঞ্চিৎ চিন্তান্তবিত্ত হইয়াছেন। ছোকরার বয়স মাত্র সাতাশ বৎসর, সাংসারিক অভিজ্ঞতা এখনও কিছুমাত্র জন্মে নাই। শাস্ত্রজীবী সভাপণ্ডিতগণ এবং মূনিপুংগব গির্বাদিগণ—যিনি এককালে অনেক কীর্তি করিয়াছেন—ইহারা যেরূপ ধর্মশিক্ষা দিয়াছেন, সরলস্বভাব রামচন্দ্র তাহাই চরম পুরুষার্থ বোধে গ্রহণ করিয়াছেন। বোচারাকে এর পর কষ্ট পাইতে হইবে। এইরূপ বিবিধ চিন্তা করিতে করিতে জাবালি অযোধ্যায় নিজ আগ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

নগরের উপকণ্ঠে সরযুতীরে জাবালির পর্ণকুটীর। বেলা অবসান হইয়াছে। গোমালিন্সত পরিচ্ছন্ন অঙ্গনের এক পার্শ্বে পনসবৃক্ষতলে জাবালিপত্নী হিন্দুলিনী রামের জন্য ভোজ্য প্রস্তুত করিতেছেন। নদীর পরপারবাসী নিষাদগণ যে মৃগমাংস পাঠাইয়াছিল তাহা শুলপক হইয়াছে, এখন খানকয়েক মোটা মোটা পুরোডাশ লোকলৈ রন্ধন শেষ হয়। হিন্দুলিনী যবাপণ্ড খাসিতে খাসিতে নানাপ্রকার সাংসারিক ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁর এতখানি বয়স হইল, কিন্তু এ পর্যন্ত পুণ্যমুখ দেখিলেন না। স্বামীর পুণ্যম নরকের ভয় নাই, পরলোকে পিণ্ডেরও ভাবনা নাই—ইহলোকে দু-বেলা নিয়মিত পিণ্ড পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট। পোষা-



পুত্রের কথা তুলিলে বলেন—পুত্রের অভাব কি, যখন যাকে ইচ্ছা পুত্র মনে করিলেই হয়। কিবা কথার শ্রী! স্বামী যদি মানুষের মতন মানুষ হইতেন তাহা হইলে হিন্দুলিনীর অত খেদ থাকিত না। কিন্তু তিনি একটি সৃষ্টিবাহির্ভূত লোক, কাহারও সাহিত বনাইয়া চলিতে পারিলেন না। সাধে কি লোকে তাঁকে আড়ালে পাশে বসে! হ্রিসন্দ্যা নাই, জপতপ নাই, অগ্নিহোত্র নাই, কেবল তর্ক করিস লোক চটাইতে পারেন। অমন যে রামচন্দ্র, ব্রাহ্মণ তাঁকেও চটাইয়াছেন। যতদিন দশরথ ছিলেন, অন্নবস্ত্রের অভাব হয় নাই। বৃন্দ রাজা স্ট্রোণ ছিলেন বটে, কিন্তু নজরটা তাঁর উচ্চ ছিল। এখন কি হইবে ভবিতব্যতাই জানেন। ভরত তো নন্দিগ্রামে পাদুকাপূজা লইয়া বিব্রত। সচিব সুমন্ত্র এখন রাজকাৰ্য্য দেখিতেছে; কিন্তু সে অত্যন্ত কৃপণ, ঘোড়ার বলগা টানিয়া তার সকল বিষয়েই টানাটানি করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। রাজবাটী হইতে যে সামান্য বৃত্তি পাওয়া যায় তাতে এই দুর্মূল্যের দিনে সংসার চলে না। হিন্দুলিনী তাঁর বাবার কাছে শুনিয়াছিলেন, সত্যযুগে এক কপর্দকে সাত কলস খাটী হৈয়গাবীন মিলিত, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব ত্রেতাযুগে মাত্র তিন কলস পাওয়া যায়, তাও ভয়সা। ঘৃণের জন্য জাবালির কিছু ঋণ হইয়াছে, কিন্তু শোধ করার ক্ষমতা নাই। নীবার ধনা যা সঞ্চিত ছিল ফুরাইয়া আসিয়াছে, পরিধেয় জীর্ণ হইয়াছে, গৃহে অর্থাগম নাই। এদিকে জাবালি শত্রুসংখ্যা বাড়াইতেছেন। স্বামীর সংসর্গদোষে হিন্দুলিনীও অনাচারে অভ্যস্ত হইয়াছেন। অযোধ্যার নিষ্ঠাবতীগণ তাঁহাকে দেখিলে শকরীর ন্যায় ওষ্ঠ কুণ্ঠিত করে। হিন্দুলিনী আর সহ্য করিতে পারেন না, আজ তিনি আহারান্তে স্বামীকে কিছু কটুবাক্য শুনাইবেন।

অঙ্গনের বাহিরে হৃৎকার করিয়া কে বলিল—‘হংহো জাবালে, হংহো!’ হিন্দুলিনী চমকিত হইয়া দেখিলেন দশ-বার জন ক্ষুদ্রকায় ঋষি কুটীরস্বারে দণ্ডায়মান। তাঁহাদের খর্ব বপু বিবল শ্মশ্রু ও ক্ষণিত উদর দেখিয়া হিন্দুলিনী বদ্বিলেন তাঁহারা বালখিলা মূর্খ।

হিন্দুলিনী কহিলেন—‘হে মহাতপা মূর্নিগণ, আমার স্বামী সরযুতটে ধ্যানস্থ আছেন। তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন, আপনারা ততক্ষণ ঐ কুটির-অলিন্দে আসন গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করুন।’

বালখিলাগণের অগ্রণী মহামূর্খ খর্বট কহিলেন—‘ভদ্রে, তোমার ঐ অলিন্দ ভূমি হইতে বিতস্তিত্রয় উচ্চ, আমরা নাগাল পাইব না। অতএব এই প্রাঙ্গণেই আসন পরিগ্রহ করিলাম, তুমি বাস্তু হইও না।’

জাবালি তখন সরযুতীরে জন্মবৃক্ষতলে আসীন হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন—এই অমজলাবলস্বী মানবশরীরে পঞ্চভূতের কিংবিশ সংস্থান হইলে সুবৃন্দ্রির উৎপত্তি হয় এবং কিরূপেই বা মূর্খতা জন্মে। অপরন্তু, লাঠোষধি স্ৱারা দেহস্থ পঞ্চভূত প্রকাম্পিত করিলে মূর্খতা অপরূপ হইয়া যে সুবৃন্দ্রির উদয় হয়, তাহা স্থায়ী কিনা। এই জটিল তত্ত্বের মীমাংসা কিছুতেই করিতে না পারিয়া অবশেষে জাবালি উঠিয়া পড়িলেন এবং আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

জাবালি বালখিলাগণকে কহিলেন—‘অহো, আজ আমার কি সৌভাগ্য যে খর্বট খালিত প্রভৃতি মহামূর্নিগণ আমার এই আশ্রমে সমাগত! হে মূর্নিবৃন্দ, তোমাদের তো সর্বাঙ্গীণ কুশল? যাগযজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে তো? ঋষিভূক্ত রাক্ষসগণ তোমাদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করে না তো? তোমাদের সেই কপিল গাভীটির বাচ্চা হইয়াছে? রাজগুরু বশিষ্ঠ তোমাদের জন্য যথেষ্ট গবাদ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন তো?’

মহামুনি খবট দদুর্ধদনিবৎ গম্ভীরনাদে কহিলেন—‘জাবালে, ক্ষান্ত হও। আপ্যায়নের জন্য আমরা আসি নাই। তুমি পাপপঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া আছ, আমরা তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি। প্রায়োগবেশন চান্দ্রায়ণাদি ম্বারা তোমার কিছ্ হইবে না। আমরা অথর্বোক্ত পক্ষ্যতিতে তোমাকে অগ্নিশুদ্ধ করিব, তাহাতে তুমি অন্তে পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে। তুবানল প্রস্তুত, তুমি আমাদের অনঙ্গমন কর।’

জাবালি বলিলেন ‘হে খবট, তোমাদিগকে কে পাঠাইয়াছেন? রাজপ্রতিভ ভরত, না রাজপুত্র, বশিষ্ঠ? আমার উদ্ধারসাধনের জন্য তোমরাই বা অত ব্যগ্র কেন? আমি আত নিরীহ বানপ্রস্থানসম্মত প্রোট ব্রাহ্মণ, কখনও কাহারও অনিষ্ট করি নাই, তোমাদের শ্রাপা দাক্ষিণ্যও অংশভাক্ হই নাই। তোমরা আমার পরকালের জন্য বাস্ত না চাইয়া নিজ নিজ হৃৎকালের জন্য যত্নমান হও।’

তখন অতিকোপনম্বভাণ খল্লাট ঋষি অশ্বধনিবৎ কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন—‘রে তপোমন, তুমি আত দুর্য্যাতার সম্ভ্রান্ত নাস্তিক। তোমার বাসহেতু এই অযোধ্যাপুত্রী অশ্লীল হইয়াছে, গম্ভীরা নিপ্রপণ অতিষ্ঠ হইয়াছেন। আমরা ভরত বা বশিষ্ঠ কাহারও আজ্ঞাবাহী নহি। ব্রাহ্মণের রক্ষাহেতু আমরা প্রজাপতি ব্রহ্মা কতৃক সৃষ্ট হইয়াছি। তুমি আর বাক্যব্যয় করিও না, প্রস্তুত হও।’

জাবালি বলিলেন—‘হে বালখিল্যগণ, আমি স্বেচ্ছায় যাইব না। তোমরা আমাকে প্রাণতেজোবলে উত্তালন কর।’

জাবালির শালপ্রাংশু বিরাট বপু দেখিয়া বালখিল্যগণ কিয়ৎক্ষণ নিম্নকণ্ঠে অঙ্গুশ্রুতি করিলেন। অবশেষে গলিতদন্ত খালিত মূনি স্থলিত স্বরে কহিলেন—‘হে জাবালে, যদি তুমি অগ্নিপ্রবেশ করিতে নিতান্তই ভীত হইয়া থাক তবে প্রাণশিষ্টের নিষ্করস্বরূপ তিন শূর্প তিল ও শত নিম্বক কাণ্ডন প্রদান কর। আমরা যথানিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান ম্বারা তোমাকে পাপমুক্ত করিব।’

জাবালি কহিলেন—‘আমার এক কপর্দকও নাই, থাকিলেও দিতাম না।’

তখন খবট খল্লাট খালিতাদি মূনিগণ সমস্বরে কহিলেন—‘রে নরাধম, তবে আমরা অভিসম্পাত করিতেছি শ্রবণ কর। সাক্ষী চন্দ্র সূর্য তারা, সাক্ষী দেবগণ গিত্তগণ দিক্-পালগণ বসট্কারগণ—’

জাবালি বলিলেন—‘শৌণ্ডিকের সাক্ষী মদ্যপ, তস্করের সাক্ষী গ্রন্থিচ্ছেদক। হে বালখিল্যগণ, বৃথা দেবতাগণকে আহ্বান করিতেছ, তাহারা আসিবেন না। বরং তোমরা ছদ্ম্ভূষণ ও কর্ণকর্তৃকগণকে স্মরণ কর।’

হিন্দুলিনী বলিলেন—‘হে আশপুত্র, তুমি কেন এই অস্পায়ু অপোগন্ড অকালপক কুস্মাণ্ডগণের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছ, উহাদিগকে খেদাইয়া দাও।’

বালখিল্যগণ কহিলেন—‘রে রে রে রে—’

জাবালি তখন তাহার বিশাল ভুজস্বরে বালখিল্যগণকে একে একে তুলিয়া ধরিয়া প্রাণগবেষ্টনীর পরপারে বদূপ বদূপ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন।

বালখিল্যগণ প্রস্থান করিলে জাবালি বলিলেন—‘প্রিয়ে, আমাদের আর অযোধ্যায় বাস করা চলিবে না, কখন কোন দিক হইতে উৎপাত আসিবে তাহার স্থিরতা নাই।

অতএব কল্যা প্রভৃষেই আমরা এই আগ্রম ত্যাগ করিয়া দূরে কোনও নিরুপদ্রব স্থানে যাত্রা করিব।’

পরদিন উষাকালে সস্ত্রীক জাবালি অযোধ্যা ত্যাগ করিলেন। কয়েকজন অনুগত নিম্নাদ তাঁহাদের সামান্য গৃহোপকরণ বহন করিয়া অগ্রে অগ্রে পথপ্রদর্শনপূর্বক চলিল। মাসাধিক কাল তাঁহারা নানা জনপদ গিরি নদী বনভূমি অতিক্রম করিয়া অবশেষে হিমালয়ের সান্নিধ্যে শতদ্রুতীরে এক রমণীয় উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন।

জাবালি তথায় পর্ণকুটীর রচনা করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পর্বতবাসী কীরাতগণ তাহার বিশাল দেহ, নিবিড় শ্মশ্রু ও মধুর সদয় ব্যবহার দেখিয়া মূগ্ধ হইল এবং নানাপ্রকার উপঢৌকন দ্বারা সংবর্ধনা করিল। জাবালি তথায় বিবিধ দ্রুহ তত্ত্বসমূহের অনুসন্ধানে নিবিষ্ট রহিলেন এবং অবসরকালে শতদ্রু নদীতে মৎস্য ধরিয় চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন।



‘রে রে রে—’

দেবভাগ্যের খ্যাতি আছে—তাঁহারা অন্তর্ঘামী। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহাদিগকেও সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় গুল্লবের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে হয় এবং তাহার ফলে জগতে অনেক অবিচার ঘটিয়া থাকে। অচিরে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট সমাচার আসিল যে মহাতেজা জাবালি মুনী শতদ্রুতীরে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন আছেন,— তাঁহার অভিসন্ধি কি ভাষা এখনও সম্যক্ অবধারিত হয় নাই, তবে সম্ভবতঃ তিনি ইন্দ্রকে বিষ্ণুকে কিংবা ঐরূপ কোনও একটা পরমপদ আয়ত্ত না করিয়া ছাড়িবেন না। দেবরাজ চিন্তিত হইয়া আজ্ঞা দিলেন—‘উবশীকে ডাক।’

মাতাল আসিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন—‘হে দেবেন্দ্র, উবশী আর মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইতে চাহে না—’

ইন্দ্র কহিলেন—‘হুং, তার ভারি তেজ হইয়াছে।’

দেবর্ষি নারদ কহিলেন—‘মর্ত্যের কবিগণই স্তুতি করিয়া তাহার মস্তকটি ভক্ষণ করিয়াছেন। এখন কিছুকাল তাহাকে বিরাম দাও, দিনকতক অমরাবতীতে আবদ্ধ

থাকিলে আপনিই সে মর্ত্যলোকে বাইব'র জন্য আবদার ধরবে। জাবালি'র জন্য অন্য কোনও অঙ্গুর পাঠাও।'



মাতালি বলিলেন—‘মেনকা তার কন্যাকে দেখিতে গিয়াছে। তিলেভুমা'কে অশ্বিনীকুমারস্বর এখনও তিন মাস বাহির হইতে দিবেন না। অলম্বদ্বার পা মচকাইয়াছে, নাচিতে পারিবে না। অষ্টাবক্ত মূনি দেবগণের উপর বিমুখ হইয়া বাঁকিয়া বসিয়াছেন, রম্ভা তাহাকে সিধা করিতে গিয়াছে। নাগদত্তা হেমা সোমা প্রভৃতি তিন শত অঙ্গুরাকে লক্ষেশ্বর রাবণ অপহরণ করিয়াছেন। বাকী আছে কেবল মিশ্রকেশী ও ঘূতাচী।’

ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন—‘আমাকে না জানাইয়া কেন অঙ্গুরাদের যতন পাঠানো হয়। মিশ্রকেশী ঘূতাচীর বয়স হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা কিছু হইবে না।’

নাগদ বলিলেন—‘হে ইন্দ্র, সেজন্য চিন্তা করিও না। জাবালিও যদুবা নহেন। নাগদ, গৃহিণী-বাহিনী-জাতীয়া অঙ্গুরাই তাহাকে ভালরকম বশ করিতে পারিবে।’

ইন্দ্র বলিলেন—‘মিশ্রকেশীর চুল পাকিয়াছে, সে থাক। ঘূতাচীকে পাঠাইবার গাণ্ধ্যা কর। তাহাকে একপ্রস্থ সঙ্কর চীনাংশুক ও যথোপযুক্ত অলংকারাদি দাও।

বায়ু, তুমি মৃদুমন্দ বহিবে। শশধর, তুমি মৃন্দাকিনীতে স্নান করিয়া উজ্জ্বল হইয়া  
লও। কন্দর্প, তুমি সেই অস্ত্রের পোশাকটা পরিয়া যাইবে, আবার যাতে ভস্ম না  
হও। বসন্ত, তুমি সঙ্গে এক শত কোকিল লইবে।’

নারদ বলিলেন—‘আর এক শত বন্যকুকুট। ঋষি বড়ই গ্নাহসংশী।’

ইন্দ্র বলিলেন—‘আচ্ছা, তাহাও লইবে। আর দশ কুম্ভ ঘৃত, দশ স্থালী দধি,  
দশ দ্রোণী গুড় এবং অন্যান্য ভোজ্যসম্ভার। যেমন করিয়া হউক জাবালির ধ্যান  
ভংগ করা চাই।’

সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে ঘৃতাচী জাবালিবিজয়ে যাত্রা করিলেন।

জাবালির তপোবনে তখন ঘোর বর্ষা। মেঘে পর্বতে একাকার হইয়া দিগন্তে  
নিবিড় প্রাচীর রচনা করিয়াছে। শতদ্রুর গৈরিকবর্ণ জলে পালে পালে মৎস্য বিচরণ  
করিতেছে। বনে ভেকবংশের চতুর্প্রহরব্যাপী মহোৎসব চলিতেছে।



আবার নৃত্য শুরুর করিলেন

সন্ধ্যার প্রাক্কালে যতটী অনূচরবর্গসহ জাবালির আশ্রমে পৌঁছিলেন আক্রমণের উদ্‌যোগ করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না, কারণ বহুবীর এইরূপ অভিযান করিয়া তাঁহারা পরিপক্ব হইয়াছেন। নিমেষের মধ্যে মেঘ দূরীভূত হইল, ময়লানিল বাহিতে লাগিল, শতদ্রুর স্রোত মন্দীভূত হইল, নির্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিল, পাদপসকল পুষ্পস্তবকে ভূষিত হইল, অলিকুল গুঞ্জরিতে লাগিল, ভেকগণ নীরব হইয়া পম্বলে লুকাইল।

জাবালি শতদ্রুতীরে ছিপহস্তে নিবিষ্টমনে মাছ ধরিতেছিলেন। আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্ষয়ে তিনি বিচলিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। সহসা ঋতুরাজ বসন্তের খোঁচা খাইয়া নিদ্রাতুর কোকিলকুল আকুল চিৎকার করিয়া উঠিল। জাবালি চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, এক অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী দিব্যাঙ্গনা কটিতটে বামকর, চিবুকে দক্ষিণকর নিবন্ধ করিয়া নৃত্য করিতেছে।

ধীমান্ জাবালি সমস্ত ব্যাপারটি চট করিয়া হৃদয়ংগম করিলেন। ঈষৎ হাস্য বলিলেন—‘অয়ি বরাঙ্গনে, তুমি কে, কি নিমিত্তই বা এই দুর্গম জনশূন্য উপত্যকার আসিয়াছ? তুমি নৃত্য সংবরণ কর। এই সৈকতভূমি অতিশয় পিচ্ছিল ও উপলবিধম। যদি আছাড় খাও তবে তোমার ঐ কোমল অস্থি আন্ত থাকিবে না।’



অপাঙ্গে বিলোল কটাক্ষ স্ফুর্নিত করিয়া ঘৃতাচী কহিলেন—‘হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, আমি ঘৃতাচী স্বর্গাঙ্গনা। তোমাকে দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও। এই সমস্ত দ্রব্যসম্ভার তোমারই। এই ঘৃতকুম্ভ দধিস্থালী গুড়দ্রোণী—সকলই তোমার। আমিও তোমার। আমার যা কিছু আছে—নাঃ থাক।’—এই পর্যন্ত বলিয়া লজ্জাবতী ঘৃতাচী ঘাড় নীচু করিলেন।

জাবাল বলিলেন—‘অরি কল্যাণি, আমি দীনহীন বৃন্দ ব্রাহ্মণ। গৃহিণীও বর্তমান। তোমার তুষ্টি বিধান কর; আমার সাধের অতীত। অতএব তুমি ইন্দ্রালয়ে ফিরিয়া যাও। অথবা যদি তোমার নিতান্তই মূনিঋষির প্রতি কোঁক হইয়া থাকে তবে অধোদ্বায় গমন কর। তথায় খবট খল্লট খালিতাদি মূনিগণ আছেন, তাঁদের মধ্যে থাকি ইচ্ছা এবং যতগুলিকে ইচ্ছা তুমি হেলায় তর্জনীহেলনে নচাইতে পারিবে। আর যদি তোমার অধিকতর উচ্চাভিলাষ থাকে তবে ভাগ্যবদূর্বাসা কৌশল প্রভৃতি অনলসংকাশ উগ্রতেজা মহর্ষিগণকে জ্বল করিয়া বশ্যম্বিনী হও। আমাকে ক্ষমা দাও।’

ঘৃতাচী কহিলেন—‘হে জাবালে, তুমি নিতান্তই নীরস। তোমার ঐ বিপুল দেহ কি বিধাতা শূন্য কাণ্ডে নির্মাণ করিয়াছেন? তুমি দীনহীন তাতে ক্ষতি কি, আমি তোমাকে কুবেরের ঐশ্বর্য আনিয়া দিব। তোমার ব্রাহ্মণীকে বারণসী প্রেরণ কর। তিনি নিশ্চয়ই লোলাঙ্গী বিগতযোবনা। আর আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর, —চিরযোবনা, নিটোলা নিখুঁত। উর্বশী মেনকা পর্যন্ত আমাকে দেখিয়া ঐশ্বর্য ছটফট করে।’

জাবাল সহাস্যে কহিলেন—‘হে সুন্দরি, কিছু মনে করিও না। তুমিও নিতান্ত খুকীটি নহ। তোমার মূখের লোধরেণু ভেদ করিয়া কিসের রেখা দেখা যাইতেছে? তোমার চোখের কোলে ও কিসের অন্ধকার? তোমার দন্তপঙ্ক্তিতে ও কিসের ফাঁক?’

ঘৃতাচী সরোষে কহিলেন—‘হে মূর্খ, তুমি নিশ্চয়ই রাহাশ, তাই অমন কথা বলিতেছ। পশুশ্রমের ক্রান্তিহেতু আমার লাবণ্য এখন সমাক্ষ স্ফূর্তি পাইতেছে না। আগে সকাল হোক, আমি মূখের সর মাখিয়া চান করি, তখন দেখিও, মূগ্ধ ঘূরিয়া যাইবে’—এই বলিয়া ঘৃতাচী আবার নৃত্য শুরু করিলেন।

অদূরবর্তী দেবদারুবৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া জাবালপত্নী সমস্ত দেখিতেছিলেন। ঘৃতাচীর দ্বিতীয়বার নৃত্যারম্ভে তিনি আর আশ্চর্যবরণ করিতে পারিলেন না, সম্মার্জনীহস্তে ছুটিয়া আসিয়া ঘৃতাচীর পৃষ্ঠে ঘা-কতক বসাইয়া দিলেন।

তখন কন্দর্প বসন্ত শশধর মলয়ানিল সকলেই মহাভয়ে ব্যাকুল হইয়া বেগে পলায়ন করিলেন। আকাশ আবার জলদঙ্গলে আচ্ছন্ন হইল, দিগ্‌মণ্ডল তিমিরাবৃত হইল, কোকিলকুল ঢুলিতে লাগিল, মধুকরনিকর উদ্ভ্রান্ত হইয়া পরস্পরকে দংশন করিতে লাগিল, শতদ্রু স্ফীত হইল, ভেককুল মহা উল্লাসে বিকট কোলাহল করিয়া উঠিল।

জাবাল পত্নীকে কহিলেন—‘প্রিয়ে, স্থিরা ভব। ইনি স্বর্গাঙ্গনা ঘৃতাচী, ইন্দ্রের আদেশে এখানে আসিয়াছেন—ইহার অপরাধ নাই।’

হিন্দুলিনী কহিলেন—‘হলা দধাননে নিলঞ্জৈ য়েচী, তোর আশ্রয় ক্রম নয় যে আমার স্বামীকে বোকা পাইয়া ভুলাইতে আসিয়াছিস! আর, ভো অঙ্কউত্ত, তোমারই বা কি প্রকার আশ্রয় যে এই উৎকপালী বিভালাক্ষী মায়াবিনীর সহিত বিজনে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলে।’

জাবাল তখন সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করিয়া অতি কষ্টে পত্নীকে প্রসন্ন করিলেন এবং রোরদামানা ঘৃতাচীকে বলিলেন—‘বৎসে, তুমি শান্ত হও। হিন্দুলিনী তোমার

## জাবালি

পৃষ্ঠে কিঞ্চিৎ ইন্দ্রদীপ্তি মর্দন করিয়া দিলেই বাথার উপশম হইবে। তুমি আজ রাতে আমার কুটীরেই বিশ্রাম কর। কল্যাণ অমরাবতীতে ফিরিয়া গিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে আমার প্রীতিসম্ভাষণ এবং ঘৃণা-দধি-গুড়াতির জন্য বহু ধন্যবাদ জানাইও।’

ঘৃণা চাই কহিলেন—‘তিনি আমার মধুদর্শন করিবেন না। হা, এমন দূর্দর্শা আমার কখনও হয় নাই।’

জাবালি বলিলেন—‘তোমার কোনও ভয় নাই। তুমি দেবেন্দ্রকে জানাইও যে ইন্দ্রের উপর আমার কিছুমাত্র লোভ নাই, তিনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতে থাকুন।’

সুতরাং পরাভব শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র নারদকে কহিলেন—‘হে দেবর্ষে, এখন কি করা যায়? জাবালি ইন্দ্র চাহেন না জানিয়াও আমি নিশ্চিত হইতে পারিতেছি না। জনরব শুনিতোছি যে ঐ দূর্দান্ত ঋষি সমস্ত দেবতাকেই উড়াইয়া দিতে চায়।’

নারদ কহিলেন—‘পূরন্দর, তুমি চিন্তিত হইও না। আমি যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছি।’

নৈমিষারণ্যে সনকাদি ঋষিগণের সকাশে দেবর্ষি নারদ আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন—‘হে মূনিগণ, শাস্ত্রে উক্ত আছে, সত্যযুগে পুণ্য চতুষ্পাদ, পাপ নাস্তি। কিন্তু এই ত্রেতা-যুগে পুণ্য ত্রিপাদ মাত্র এবং একপাদ পাপও দেখা গিয়াছে। ইহার হেতু কি তোমরা তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি?’

মূনিগণ বলিলেন—‘আশ্চর্য, ইহা আমরা কেহই ভাবিয়া দেখি নাই।’

নারদ বলিলেন—‘তবে তোমাদের যাগযজ্ঞ ভূপতপ সমস্তই ব্যথা।’ ইহা কহিয়া তিনি তাহার কাষ্ঠবাহনে আরোহণপূর্বক ব্রহ্মার নিকট অপর এক যজ্ঞমন্ত্র করিতে প্রস্থান করিলেন।

মূনিগণ নারদীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া এক মহতী সভা আহ্বান করিলেন। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী প্লবাদি সন্তদীপ হইতে বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ বিপ্রগণ নৈমিষারণ্যে সমবেত হইলেন। মহর্ষি জাবালি আমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন।

অনন্তর সকলে আসন গ্রহণ করিলে সভাপতি দক্ষ প্রজ্ঞাপতি কহিলেন—‘ভো পণ্ডিতবর্গ, সত্যযুগে পুণ্য চতুষ্পাদ ছিল, এখন তাহা ত্রিপাদ হইয়াছে। কেন এমন হইল এবং ইহার প্রতিকার কি, যদি তোমরা কেহ অবগত থাক তবে প্রকাশ করিয়া বল।’

তখন জ্বলন্ত পাবকতুল্য তেজস্বী জামদগ্ন্য মূনি কহিলেন—‘হে প্রজাপতে, এই পাখ্যা জাবালিই সমস্ত অনিষ্টের মূল! উহার সংস্পর্শে বসুন্ধরা ভারগ্রস্তা হইয়াছেন।’

সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী বলিলেন—‘ঠিক, ঠিক, আমরা তাহা অনেকদিন হইতেই জানি।’

জামদগ্ন্য কহিলেন—‘এই জাবালি দ্রষ্টাচার উল্লাসগামী নাস্তিক। ইহার শাস্ত্র নাই, মার্গ নাই। রামচন্দ্রকে এই পাষণ্ডই সত্যধর্মচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। গালাখলাগাণকে এই দুরাত্মাই নিষ্যাদিত করিয়াছে। দেবরাজ পূরন্দরকেও এই পাপিষ্ঠ



হাস্যাস্পদ করিয়াছে। ইহাকে বধ না করিলে পুণ্ড্রের নষ্টপাদ উদ্ধার হইবে না।

পাণ্ডিতগণ কহিলেন—‘আমরাও ঠিক তাহাই ভাবিতেছিলাম।’

দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—‘হে জাবালে, সত্য করিয়া কহ তুমি নাস্তিক কিনা। তোমার মার্গ কি, শাস্ত্রই বা কি।’

জাবাল বলিলেন—‘হে সুধীবৃন্দ, আমি নাস্তিক কি আস্তিক তাহা আমি নিজেই জানি না। দেবতাগণকে আমি নিষ্কৃতি দিয়াছি, আমার তুচ্ছ অভাব-অভিযোগ জানাইয়া তাঁহাদিগকে বিরত করি না। বিধাতা যে সামান্য বৃদ্ধি দিয়াছেন তাহারই বলে কোনও প্রকারে কাজ চালাইয়া লই। আমার মার্গ যত তত্র, আমার শাস্ত্র অনিত্য, পৌরুষেয়, পরিবর্তনসহ।’

দক্ষ কহিলেন—‘তোমার কথার মাতামুণ্ড কিছুই বুদ্ধিলাম না।’

জাবাল বলিলেন—‘হে ছাগমুণ্ড দক্ষ, তুমি বুদ্ধিবার বৃথা চেষ্টা করিও না। আমি এখন চলিলাম। বিপ্রগণ, তোমাদের জয় হউক।’

তখন সভায় ভীষণ কোলাহল উঠিত হইল এবং ধর্মপ্রাণ বিপ্রগণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। কয়েকজন জাবালিকে ধরিয়া ফেলিলেন। জামদগ্ন্য তাঁহার তীক্ষ্ণ কুঠার উদ্যত করিয়া কহিলেন—‘আমি এক-বিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নিঃশেষ করিয়াছি, এইবার এই নাস্তিককে সাবাড় করিব।’

স্থিরপ্রজ্ঞ দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—‘হাঁ হাঁ কর কি, ব্রাহ্মণের দেহে অস্বাঘাত ! ছি ছি, মন্দ কি মনে করিবে ! বরং উহাকে হলাহল প্রয়োগে বধ কর।’

দেবর্ষি নারদ এতক্ষণ অলক্ষ্যে বসিয়াছিলেন। এখন আত্মপ্রকাশ করিয়া কহিলেন—‘আমার কাছে বিশুদ্ধ চৈনিক হলাহল আছে। তাহা সর্বপরিমাণ সেবনে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, দুই সর্বপে বৃদ্ধিভ্রংশ, চতুর্মাগ্নায় নরকভোগ, এবং অষ্টমাগ্নায় মোক্ষলাভ হয়। জাবালিকে চতুর্মাগ্না সেবন করও ; সাবধান, যেন অধিক না হয়।’

মহাচীন হইতে আনীত কৃষ্ণবর্ণ হলাহল জলে গুলিয়া জাবালিকে জোর করিয়া খাওয়ানো হইল। তাহার পর তাঁহাকে গভীর অরণ্যে নিক্ষেপ করিয়া ত্রিলোকদর্শী পাণ্ডিতগণ কহিলেন—‘পাশ্চ এতক্ষণে কুস্তম্বীপকে পৌঁছিয়াছে।’

**চৈনিক হলাহল জাবালির মস্তিষ্কে ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।**

জাবাল যজ্ঞের নিমন্ত্রণে বহুবীর সোমরস পান করিয়াছেন ; প্রথম ঘোবনে বয়স্য ক্ষত্রিয়কুমারগণের পাশ্চায় পড়িয়া গোড়ী মাধবী গৈণ্ডটী প্রভৃতি আসবও চাখিয়া দেখিয়াছেন ; ছেলেবেলার মামার বাড়িতে একবার ভূগুমামার সঙ্গে চুরি করিয়া ফেনিল তালরসও খাইয়াছিলেন,—কিন্তু এমন প্রচণ্ড নেশা পূর্বে তাঁহার কখনও হয় নাই। জাবালির সকল অঙ্গ নিশ্চল হইয়া আসিল, ভাল, শুদ্ধ হইল, চক্ষু উজ্জ্বল, বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল।

সহসা জাবালি অনুভব করিলেন—তিনি রক্তচন্দনে চর্চিত হইয়া রক্তমালাধারণ-পূর্বক গর্দভযোজিত রথে দক্ষিণাভিমুখে দ্রুতবেগে নায়মান হইতেছেন। রক্তবসনা পিঙ্গলবর্ণা কামিনী তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছে এবং বিকৃতবদনা রাক্ষসী তাঁহার রথ আকর্ষণ করিতেছে। ক্রমে বৈভরিণী পার হইয়া তিনি যমপুরীর দ্বারে উপনীত হইলেন। তথায় যমকিংকরগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া যমরাজের সকাশে লইয়া গেল।

যম কহিলেন—‘জাবালে, স্বাগতোসি, আমি বহুদিন যাবৎ তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। তোমার পারলৌকিক ব্যবস্থা আমি যথোচিত করিয়া রাখিয়াছি, এখন আমার অনুগমন কর। দূরে ঐ যে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গবাক্ষহীন অশ্বদুর্গারী সৌধমালা দেখিতেছ, উহাই রৌরব ; ইতরপ্রকৃতি পাপিগণ তথায় বাস করে। আর সম্মুখে এই যে গগনচুম্বী তাম্রচড় রক্তবর্ণ অলিন্দপরিবেষ্টিত আয়তন, ইহাই কুম্ভীপাক ; সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ এখানে অবস্থান করেন। তোমার স্থান এখানেই নির্দিষ্ট হইয়াছে, ভিতরে চল।’

অনন্তর ধর্মরাজ যম জাবালিকে কুম্ভীপাকের গর্ভমণ্ডপে লইয়া গেলেন। এই মণ্ডপ বহুযোজনবিস্তৃত, উচ্চছাদ, বাষ্পসমাকুল, গম্ভীর অরাবে বিধূনিত। উভয় পার্শ্বে জ্বলন্ত চুল্লীর উপর শ্রেণীবদ্ধ অতিকায় কুম্ভসকল সজ্জিত আছে, তাহা হইতে নিরন্তর শ্বেতবর্ণ বাষ্প ও আত্নাদ উঠিত হইতেছে। নীলবর্ণ যমকিংকরগণ ইন্দ্র-নিষ্কপের জন্য মধ্যে মধ্যে চুল্লীস্বার খুলিতেছে, জ্বলন্ত অনলচ্ছটায় তাহাদের মুখ উল্কাপিণ্ডের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছে।

কৃতান্ত কহিলেন—‘হে মহর্ষে, এই যে রত্ননির্মিত কিংকিণীজালমাণ্ডিত সুবৃহৎ কুম্ভ দেখিতেছ, ইহাতে নহুষ যযাতি দুজ্ঞানত প্রভৃতি মহাযশা মহীপালগণ পারিপক্ক হইতেছে। ইহারা প্রায় সকলেই সংশোধিত হইয়া গিয়াছেন, কেবল যযাতির কিণ্ডিৎ বিলম্ব আছে। আর এক প্রহরের মধ্যে সকলেই বিগতপাপ হইয়া অমরাবতীতে গমন করিবেন। ঐ যে বৈদুর্ঘ্যচিত হিরণ্ময় কুম্ভ দেখিতেছ, উহার তত তৈলে ইন্দ্রাদি দেবগণ মধ্যে মধ্যে অবগাহন করিয়া থাকেন। গৌতমের অভিশাপের পরে সহস্রাঙ্ক পুরুন্দরকে বহুকাল এই কুম্ভমধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন অগ্নিপ্রয়োগে ইহার তলদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এই যে রত্নাঙ্কমালাবোঁদিত গৈরিকবর্ণ প্রকাণ্ড কুম্ভ দেখিতেছ, ইহার অভ্যন্তরে ভার্গব দুর্বাসা কৌশিক প্রভৃতি উগ্রতপা মহর্ষিগণ সিন্ধ হইতেছেন।’

জাবালি কৌতুহলপরবশ হইয়া বলিলেন—‘হে ধর্মরাজ, কুম্ভের ভিতরে কি হইতেছে দয়া করিয়া আমাকে দেখাও।’

ধর্মরাজের আজ্ঞা পাইয়া জনৈক যমকিংকর কুম্ভের আবরণী উন্মুক্ত করিল। যম তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ দারুণ্য দর্বা নিমজ্জিত করিয়া সন্তপণে উত্তোলিত করিলেন। সিন্ধজটাজুট ধূমায়িতকলেবর কয়েকজন ঋষি দর্বাতে সংলগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া অভিসম্পাত আরম্ভ করিলেন—‘রে নারকী যমরাজ, যদি আমাদের কিণ্ডিপি তপঃপ্রভাব থাকে—’

দর্বা উল্টাইয়া কুম্ভের ঢাকনি ঝটিতি বন্ধ করিয়া যম কহিলেন—‘হে জাবালে, এই কোপনশব্দাব ঋষিগণের কার্য্যনা দূর হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। ইহারা আরও অষ্টাহকাল পরিসিন্ধ হইতে থাকুন।’

এমন সময় কয়েকজন যমদূতের সহিত খর্বট খল্লাট খালিত বিষমবদনে কুম্ভীপাকের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলেন।

জাবালি কহিলেন—‘হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা এখানে কেন, স্কন্ধলোকে কি স্থানাভাব ঘটিয়াছে?’

খর্বট উত্তর দিলেন—‘জাবালে, তুমি বিরক্ত করিও না, আমরা এখানে তদারক্য করিতে আসিয়াছি।’

যমরাজের ইঞ্জিতে কিংকরগণ বালখিলায়কে একত্র বাঁধিয়া উত্তপ্ত পণ্ডগব্যপূর্ণ এক ক্ষুদ্রাকার কুন্ডে নিক্ষেপ করিল। কুন্ড হইতে তাঁর চিৎকার উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃতান্তের বাপান্তকর বাক্যসমূহ নির্গত হইতে লাগিল। ধর্মরাজ কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া সরিয়া আসিয়া বলিলেন—‘হে মহর্ষে, এই নরকের অনুষ্ঠানসকল অতিশয় অপ্রীতিকর, কেবল বিপন্ন ধরিগ্রীর রক্ষাহেতুই আমাকে তাহা সম্পন্ন করিতে হয়। যাহা হউক, আমি আর তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করিব না, এখন তোমার প্রতি আমার যাহা কর্তব্য তাহাই পালন করিব। দেখ, যে পাপ মনের গোচর তাহা আমি



‘রে নারকী যমরাজ’

সহজেই দূর করিতে পারি। কিন্তু যাহা মনের অগোচর তাহা জন্মজন্মান্তরেও সংক্রমিত হয়, এবং তাহা শোধন করিতে হইলে কুন্ডীপাকে বার বার নিক্ষেপন আবশ্যক। তোমার যাহা কিছু দম্ভকৃত আছে তাহা তুমি জানিয়া শূন্যিয়াই দৌর্বল্যবশাৎ করিয়া ফেলিয়াছ, কদাপি আত্মপ্রবণতা কর নাই। সুতরাং আমি তোমাকে সহজেই পাপমুক্ত করিতে পারিব, অধিক যন্ত্রণা দিব না।’

এই বলিয়া কৃতান্ত জাবালিকে সুবহু লৌহসংদংশে বেষ্টিত করিয়া একটি তপ্ত পণ্ডগব্য কুন্ডে নিক্ষেপ করিলেন। ছাঁক করিয়া শব্দ হইল।

সহস্র বিহগকাকালিতে বনভূমি সহসা ঝংকৃত হইয়া উঠিল। প্রাচীদিক্ নবারুণ-  
কিরণে আরক্ত হইয়াছে। জাবালি চৈতন্য লাভ করিয়া সাধনীর হিন্দালিনীর অশ্রু হইতে  
ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন—সম্মুখে লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রসন্নবদনে  
মৃদুমধুর হাস্য করিতেছেন।

ব্রহ্মা বলিলেন—‘বৎস, আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি ইচ্ছানুযায়ী বর প্রার্থনা কর।’



‘বৎস, আমি প্রীত হইয়াছি।’

জাবালি বলিলেন—‘হে চতুরানন, ঢের হইয়াছে। আর বরে কাজ নাই। আপনি  
সরিয়া পড়ুন, আর ভেংচাইবেন না।’

ব্রহ্মা তাহার ভূজপত্রবিচিত ছন্দমুখ মোচন করিয়া কহিলেন—‘জাবালে, অভিমান  
সংবরণ কর। তুমি বর না চাহিলেও আমি ছাড়িব কেন? আমিও প্রার্থী। হে  
শ্রাবলম্বী মৃত্তমতি যশোবিমুখ তপস্বী, তুমি আর দুর্গম অরণ্যে আত্মগোপন করিও  
না, লোকসমাজে তোমার মন্ত প্রচার কর। তোমার যে ভ্রান্তি আছে তাহা অপনীত  
হউক, অপরের ভ্রান্তিও তুমি অপনয়ন কর। তোমাকে কেহ বিনষ্ট করিবে না,  
অপরেও যেন তোমার দ্বারা বিনষ্ট না হয়। হে মহাত্মন, তুমি অমরত্ব লাভ করিয়া  
যুগে যুগে লোকে লোকে মানবমনকে সংসারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে থাক।’

জাবালি বলিলেন—‘তথাস্তু।’



চাট্‌জ্যেমশায় বলিলেন—‘বাঘের কথা যদি বল, তো রত্নপ্রসাদের বাঘ। ইয়া কেঁদে কেঁদে। সৌদরবন থেকে সেখানে গ্রীষ্মকালে হাওয়া বদলাতে যায়। কিন্তু এমনি স্থানমাহাত্ম্যে যে কাউকে কিছু বলে না, সব তীর্থযাত্রী কিনা। কেবল সায়েব ধ’রে ধ’রে খায়।’

বিনোদ উকিল বলিলেন—‘খাসা বাঘ তো। এখানে গোটাকতক আনা যায় না? চটপট স্বরাজ হয়ে যেত,—স্বদেশী, বোমা, চরকা, কাউন্সিল-ভাঙা, কিছুই দরকার হ’ত না।’

সন্ধ্যাবেলা বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় গল্প চলিতেছিল। তিনি নির্বিকট হইয়া একটি ইংরেজি বই পড়িতেছেন—How to be happy though married। তাঁর শালা নগেন এবং ভাগনে উদয়, এরাও আছে।

চাট্‌জ্যে হৃদ্যায় একমিনিটব্যাপী একটি টান মারিয়া বলিলেন—‘তুমি কি মনে কর সে চেষ্টা হয় নী?’

—‘হয়েছিল নাকি? কই, রাউলট-রিপোর্টে তো সে কথা কিছু লেখেনি।’

—‘ভারী এক রিপোর্ট পড়েছ। আরে গবরমেণ্ট কি সবজাজ্জা? There are more things...কি বলে গিয়ে।’

—‘ব্যাপারটা কি হয়েছিল খলেই বলুন না।’

চাট্‌জ্যে ক্ষণকাল গম্ভীর থাকিয়া বলিলেন—‘হৃদ্য।’

নগেন বলিল—‘বলুন না চাট্‌জ্যেমশায়।’

চাট্‌জ্যে উঠিয়া দরজা ও জানালায় উঁকি মারিয়া দেখিলেন। তারপর যথাস্থানে আসিয়া পুনরায় বলিলেন—‘হৃদ্য।’

বিনোদ। দেখাছিলেন কি?

চাটুজ্যে। দেখাছিলুম হরেন ঘোষালটা আবার হঠাৎ এসে না পড়ে। পদ্মিশের গোয়েন্দা, আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল।

বংশলোচন বই রাখিয়া কহিলেন—‘ওসব ব্যাপার নাই বা আলোচনা করলেন। হাকিমের বাড়ি ওরকম গল্প না হওয়াই ভাল।’

চাটুজ্যে বলিলেন—‘ঠিক কথা। আর, ব্যাপারটাও বড় অলৌকিক, শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। নাঃ, যাক ও কথা। তারপর, উদো, তোর বউ বাপের বাড়ি থেকে ফিরছে কবে?’

বিনোদ উদয়কে বাধা দিয়া বলিলেন—‘ব্যাপারটা শুনতেই বা দোষ কি। চলুন আমার বাসায়, সেখানে হাকিম নেই।’

বংশলোচন বলিলেন—‘আরে না না। এখানেই হ’ক। তবে চাটুজ্যেমশায়, বেশী সিঁড়িশস কথাগুলো বাদ দিয়ে বলবেন।’

চাটুজ্যেমশায় বলিলেন—‘মা ঠিকঃ। আমি খুব বাদসাদ দিয়েই বলছি—বেশী-দিনের কথা নয়, বকু দত্তর নাম শুনেনি বোধ হয়, আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের মেসো—’

বিনোদ। বকুলাল দত্ত? কপালীটোলায় যার মস্ত বাড়ি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ভাঙছে? তিনি তো গারা গেছেন, শুনেনি কাউনসিলে ঢুকতে পারেন নি বলে মনের দুঃখে।

চাটুজ্যে। ছাই শূন্যে। বকুবাবু আছেন, তবে এখন চেনা দুষ্কর। এক আনা খরচ করলেই দেখে আসতে পার, কেবল রবিবার বিকেলে এক টাকা।

বিনোদ। কি রকম?

চাটুজ্যে। বৃষ্টির দোষে বেচারী সব নষ্ট করলে—অমন মান, অমন ঐশ্বর্য। বাবার কৃপা হয়েছিল, কিন্তু শেষটায় বকুর মতিচ্ছন্ন হ’ল।

বিনোদ। কোন্ বাবা?

চাটুজ্যে। বাবা দক্ষিণরায়।

উদয় বলিল—‘আমার এক পিসশ্বশুরের নাম দক্ষিণামোহন রায়।’

চাটুজ্যে। উদো, তুই হাসালি, হাসালি। পিসশ্বশুর নয় রে উদো,—দেবতা, কাঁচা-থেকো দেবতা, বাঘের দেবতা।

চাটুজ্যে হাতজোড় করিয়া তিনবার কপালে ঠেকাইলেন। তারপর সদর করিয়া কহিতে লাগিলেন—

‘নমামি দক্ষিণরায় সৈদীরবনে বাস,  
হোগলা উল্লর খোপে থাকেন বারোমাস।  
দক্ষিণেতে কাকম্বীপ শাহাবাজপুর,  
উত্তরেতে ভাগীরথী বহে যত দূর,  
পশ্চিমে ঘাটাল পূবে বাকলা পরগণা—  
এই সীমানার মাঝে প্রভু দেন হানা।  
গোবাখা শাদুল চিতে লকড় হুড়ার  
গেছো-বাঘ কেলে-বাঘ বেলে-বাঘ আর  
ডোরা-কাটা ফেঁটা-কাটা বাঘ নানা জাতি—  
তিন শ তেরটি ঘর প্রভুর যে জ্যাতি।  
প্রতি অমাবস্যা হয় প্রভুর পূণ্যাহ,  
যত প্রজা ভেট দেয় মহিষ বরাহ।

ধুমধাম নৃত্য গীত হয় সারানিশ,  
গাঁক গাঁক হাঁক ডাকে কাঁপে দশদিশ  
কলাবৎ হয় বাঘ ছত্রিশ বাঘিনী  
ভাঁজেন তেঅটতালে হালদুস্ব রাগিণী।  
ডেলা ডেলা পেলা দেন শ্রীদক্ষিণ রায়,  
হরষিত হঞা সবে কামড়িয়া খায়।  
প্রভুর সেবায় হয় জীবহিংসা নিত্য,  
পহরে পহরে তাঁর জ্বলে উঠে পিত্ত।  
বড় বড় জন্তু প্রভু খান অতি জল্দি,  
হিংসার কারণে তাঁর বর্ণ হৈল হল্দি।  
ছাগল শূয়ার গরু হিন্দু মূছলমান,  
প্রভুর উদরে যাঞা সকলে সমান।  
পরম পণ্ডিত তেহ ভেদজ্ঞান ন্যাঞ,  
সকল জীবের প্রতি প্রভুর যে খ্যাঞ।  
দোহাই দক্ষিণরায় এই কর বাপা—  
অন্তিমেনা পাঞ যেন চরণের থাপা।

বিনোদ বলিলেন—‘ও পাঁচালি কোথেকে পেলেন?’

চাটুজ্যো। রায়মঙ্গল। আমার একটা পদার্থ আছে, তিন শ বছরের পুরনো। সেটা নেবার জন্যে চিমেশ মিস্ত্রির বুলোঝুলি। ছোকরা তার ওপর প্রবন্ধ লিখে ইউনিভার্সিটি থেকে ডাক্তার উপাধি পেতে চায়। দেড় শ অবধি দিতে চেয়েছিল, আমি রাজী হইনি। প্রবন্ধ লিখতে হয় আমিই লিখব। নাড়ীজ্ঞান আছে, ডাক্তার হতে পারলে বড়ো বয়সের একটা সম্বল হবে।

বিনোদ। ষাক, তার পর?

চাটুজ্যো। বকুলাবাবুর কথা বলছিলাম। পনের বৎসর পূর্বে তাঁর অবস্থা ভাল ছিল না। পরিবার দেশে থাকত, তিনি কলকাতায় একটা মেসে থেকে রামজাদু অ্যাটর্নি’র আপিসে আশি টাকা মাইনের চাকরি করতেন। রামজাদুবাবু তাঁর ক্লাস-ফ্রেন্ড, সেই সূত্রে চাকরি। এখন, বকুবাবুর একটু হাতটান ছিল। বিপক্ষের ঘুষ খেয়ে একটা সমন ধরাতে দেরি করিয়ে দেন। রামজাদুবাবু কড়া লোক, ছেলেবেলার বন্ধু বলে রেয়াত করলেন না। ব্যাপার জানতে পেরে বকুলালকে যাচ্ছেতাই অপমান করলেন। বকুবাবুও তেরিয়া হয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাসায় চলে এলেন। মন খারাপ, মেসের বামুনকে বললেন রাতে কিছু খাবেন না। তার পর হেদোর ধারে গেলেন মাথা ঠাণ্ডা করতে। রাগের মাথায় চাকরি ছাড়লেন, কিন্তু সংসার চলে কিসে? পদার্থ তো সামান্য। রামজাদুর ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ হ’ল। আরে উকিলবাড়ি অমন একটু-আমটু উপরি অনেকে নিয়ে থাকে, তা বলে কি পুরনো বন্ধুকে অপমান করতে হয়? আচ্ছা, এর শোধ একদিন বকুলাল নেবেনই।

রাত নটায় মেসে ফিরে এলেন। মেস খাঁ খাঁ, সেদিন শনিবার, সব মেসবার খিয়েটার দেখতে গেছে। বকুলাল নিঃশব্দে বাসায় ঢুকে দেখতে পেলেন রামাঘরের ভেতর—

নগেন বলিল—‘দক্ষিণরায়?’

চাটুজ্যো বলিলেন—‘রামাঘরের ভেতর মেসের ঝি বকুবাবুর পশমী আসনে—যেটা তাঁর গিন্নী বদনে দিয়েছিলেন—তাইতে বসে তারিই থালায় লুচি খাচ্ছে, মেসের ঠাকুর

তাকে বাতাস করছে। কি আশ হাত জিব কেটে দেড় হাত ঘোমটা টানলে। অন্য দিন হ'লে বকুবাবু, কুরক্ষের বাধাতেন, কিন্তু আজ দেখেও দেখলেন না। চুপটি ক'রে ওপরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

তার পর অগাধ চিন্তা। কি করা যায়? কোথেকে টাকা আসবে? তাঁর এক বিধবা পিসী হুগলীতে থাকেন, বিপুল সম্পত্তি, ওয়ারিস একটিমাত্র ছেলে ভুতো। ভুতোছোঁড়া অতি হতভাগা, অল্প বয়সেই অধঃপাতে গেছে। কিন্তু পিসী তাকে নিয়েই ব্যস্ত, অমন উপযুক্ত ভাইপো বকুলালের দিকে ফিরেও তাকান না। বড়দীর কাছে কোনও প্রত্যাশা নেই।

বকুলাল ভাবলেন, ভগবানের কি বিচার! লক্ষ্মীছাড়া ভুতো হ'ল দশ লাখের মালিক, আর তারই মামাতো ভাই বকুর অদ্যভক্ষ-ধনদুর্গণ। তাঁর ক্লাসফ্রেণ্ড—ঐ বজ্রাত রামজাদুটা—মক্কেল ঠিকিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করছে, আর তিনি একটি সামান্য চাকরির জন্যে লালায়িত! দৃষ্টান্ত ভগবান।

কিন্তু বকুলাল তাঁর এক ভক্ত বন্ধুর কাছে শুনিয়েছিলেন, ভগবানকে যদি একমনে ভক্তির ডাকা যায় তা হ'লে তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আচ্ছা, তাই একবার ক'রে দেখলে হয় না? যে কথা সেই কাজ। বকুলাল তড়াক করে উঠে পড়লেন, স্টোভ জ্বালালেন, চা ক'রে তিন পেয়ালা খেলেন। আজ তিনি ভরবাত ভগবানকে ডাকবেন।

বকুলাল আলো নিবিয়ে বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে তপস্যা শুরু করলেন।—‘হে ভক্তবৎসল হরি, হে রক্ষা, হে মহাদেব, দয়া কর। সেকালে তোমরা ভক্তের আবদার শুনতে, আজ কেন এই গরিবের প্রতি বিমুখ হবে? হে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, তোমাদের যে-কেউ ইচ্ছে করলে আমার একটা হিল্লো লাগিয়ে দিতে পার। বর দাও—বর দাও—বেশী নয়, মাত্র এক লাখ। উহু, এক লাখে কিছই হবে না,—গিন্নীই গয়না গাড়িয়ে অর্ধেক সাবাড় করবেন। রামজাদোটোর কিছ, কম হবে তো দশ লাখ আছে। আমার অন্তত পাঁচ লাখ চাই—না না, দশ লাখ। দোহাই দেবতারা, তোমাদের কাছে এক লাখও যা দশ লাখও তা, তাতে এই বিশ্বসংসারের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। অনেককে তো কোটি কোটি দিয়ে থাক, আমায় না হয় মাত্র দশ লাখ দিলে। লাখ টাকায় একটা বাড়ি, হাজার-পঞ্চাশ যাবে ফার্নিচার করতে, তারপর আরও পঞ্চাশ হাজার যাবে এটা-সেটায়। এই ধর একটা ভাল মোটরকার। উহু, একটায় হবে না, গিন্নীই সেটা আঁকড়ে ধরে থাকবেন, হরদম থিয়েটার আর গগান্দন। আচ্ছা তাঁর জন্যে না হয় একটা ফোর্ড গাড়ি মোতায়ন করে দেওয়া যাবে,—সেকেন্ডহ্যান্ড ফোর্ড,—মেয়ে-ছেলের বেশী বাড় ভাল নয়। আর ঐ রামজাদুটা—রাসকেলকে কেউ যদি বেঁধে নিয়ে আসে তো ফুটপাথের ওপর তার হামদো মুখখানা ঘষি। ঘষি আর দেখি, যতক্ষণ না চোখ মুখ খয়ে গিয়ে তেলপানা হয়ে যায়। হে বৃন্দদেব, বিশুদ্ধীকৃত, শ্রীচৈতন্য, আজকের মতন তোমরা আমার মাপ কর, তোমরা এসব পছন্দ কর না তা জানি। দোহাই বাবাসকল, আজ আমার এই তপস্যায় তোমরা বাগড়া দিও না। এর পর তোমাদের একদিন খুশী করে দেব। হে নারায়ণ, হে দর্পহারী কৃষ্ণ, হে পয়গম্বর, হে নামো রক্ষা, ইহুদীর যেহোভা, পার্সীর অহুর্, দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ, শয়তান—আঁ ! রামো রামো! তা শয়তানেই বা আপত্তি কি, না হয় শেষটায় নরকে যাব। যাক, অত গাছলে চলে না। হে তেরিশ কোটির যে-কেউ, দয়া কর—দয়া কর। আমি একাংকরণে ভক্তির ডাকছি—ধনং দৌহি, ধনং দৌহি।’



বিনোদবাবু বলিলেন—‘আচ্ছা চাটুজ্যেমাশায়, আপনি বকুবাবুর মনের কথা জানলেন কি ক’রে?’

চাটুজ্যে বলিলেন—‘সে তোমরা বুঝবে না। কলিকাল, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণ দু-চারটি এখনও আছেন। গরিব বাঁটি, কিন্তু কাশ্যপ গোত্র, পদ্মগর্ভ ঠাকুরের সন্তান। কেদার চাটুজ্যের এই বড়ো হাড়ে ঋষিদের গুঁড়ো বর্তমান। একটু চেষ্টা করলে লোকের হাঁড়ির খবর জানতে পারি, মনের কথা তো কোন্ ছার। তার পর বকুলাল-বাবু ঐ রকম একমুখে তপস্যা করতে লাগলেন। তাঁর দু চোখ বেয়ে ধারা বইতে লাগল, বাহ্যজ্ঞান নেই, কেবল ধনং দেহি। এমন সময় নীচে থেকে একটি আওয়াজ এল—টিংটিং। বকুলাল লাফিয়ে উঠে দেশলাই জ্বাললেন, বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঠেন আলো ফেলে দেখলেন—’

নগেন রোমাঞ্চিত হইয়া আবার বলিয়া ফেলিল—‘দক্ষিণরায়!’

চাটুজ্যেমাশায় মুখ খিঁচাইয়া ভেংচাইয়া বলিলেন—দ্যাক্ষিণরায়! তোমার ম্যাথা! গ্যালেপাটা তুমিই ব্যালো না, আমি আর বঁকে মরি কেন।’

উদয় খুশী হইয়া বলিল—‘নগেন-মামার ঐ মস্ত দোষ, মানুষকে কথা কইতে দেয় না। আমার শালীর পাকাদেখার দিন—’

চাটুজ্যে অস্থির হইয়া বলিলেন—‘আরে গ্যালো যা! একজন থামলেন তো আর একজন পৌঁ ধরলেন! যা—আমি আর বলব না।’

বিনোদবাবু বলিলেন—‘আহ কেন তোমরা রসভঙ্গ কর! ব্রাহ্মণকে বলতেই দাও না।’

চাটুজ্যে বলিতে লাগিলেন—‘বকুলালবাবু উঠেন দেখলেন—ব্রহ্মার হাঁস শিবের বাঁড় বিষ্ণুর গড়ুর কেউ-ই নেই, শুধু এক কোণে একটি লাল বাইসিকেল ঠেসানো রয়েছে। হেঁকে বললেন—কোন্ হয়্য? টেলিগ্রাফ পিয়ন সিঁড়ির দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়েছিল, এখন সামনে এসে বললে—তার হয়্য।

কিসের তার? বকুবাবুর বুক দুর্দুর্দুর্দু ক’রে উঠল। কই, তিনি তো লটারির টিকিট কেনেন নি। তবে কি গিন্নীর কি ছেলেপিলের অসুখ? আজ বিকেলেই তো চিঠি পেয়েছেন সব ভাল। বকুলাল হুড়মুড় করে নেমে এলেন।

তারের খবর—ভূতো হঠাৎ মারা গেছে, পিসীও এখন তখন, শীগ্গির চলে এস। বকুবাবু ইয়া আন্না বলে লাফিয়ে উঠলেন, তার পর মনিব্যাগটি পকেট থেকে বার করে পিয়নের হাতে উবুড় ক’রে দিলেন। পিয়ন বেচারী আসবার আগেই জেনে নিয়েছিল যে খারাপ খবর, বকশিশ চাওয়া চলবে না। এখন অব্যাহত তিন টাকা ছ আনা পেয়ে ভাবলে শোকে বাবুর মাথা কিগড়ে গেছে। সে সই নিয়েই পালাল।

ভূতো তা হলে মরেছে? সতিাই মরেছে? বা রে ভূতো, বেড়ে ছোকরা! নিশ্চয় মদ খেয়ে লিভার পচিয়েছিল। জাঁকিয়ে শ্রাস্থ করতে হবে। বকুবাবু সেই রাতেই হুগলী রওনা হলেন।

বকুবাবুর বরাত ফিরে গেল। তবে দশ লাখ নয়, মাত্র পাঁচ লাখ। টাকাটা কম হওয়ায় প্রথমটা একটু মন খুঁতখুঁত করেছিল, কিন্তু ক্রমে সয়ে গেল। বাড়ি হ’ল, গাড়ি হল, সব হল। বকুলাল নানারকম কারবার ফাঁদলেন। তারপর যুদ্ধ বাধল, বকুলাল একই মাল পাঁচবার চালান দিতে লাগলেন, ধুলো-মুঠো সোনা-মুঠো হতে লাগল। টাকার আর অবধি নেই, কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বকুর বৃদ্ধিটা মোটা হয়ে পড়ল। এই রকমে বছর চোদ্দ কেটে গেল।’...

এই পর্যন্ত বলিয়া চাটুজ্যোমশায় তামাক টানিয়া দম লইতে লাগিলেন। বিনোদ-বাবু বলিলেন—‘কই চাটুজ্যোমশায়, বাঘ কই?’

চাটুজ্যো বলিলেন—‘আসবে, আসবে; ব্যস্ত হইয়া না, সময় হলেই আসবে। বকুবাবু, যেদিন পঞ্চানন বৎসরে পড়লেন, সেই রাতে বঙ্গমাতা তাঁকে বললেন—বৎস বকু, বয়স তো ঢের হ’ল, টাকাও বিস্তর জমিয়েছ। কিন্তু দেশের কাজ কি করলে? বকুলাল জবাব দিলেন—মা, আমি অধম সন্তান, বক্তৃতা দেওয়া আশে না, ম্যালেরিয়ার ভয়ে দেশে যেতে পারি না, খন্দর আমার সয় না—সুখের শরীর—দেশী মিলের ধূতিতেই পেট কেটে যায়। আর—বোমা দূরে থাক,—একটা ভুই-পটকা ছোড়বার সাহসও আমার নেই। কি কর্তব্য, তুমিই বাতলে দাও। খাটুনির কাজ আর এ বয়সে পেরে উঠব না, সোজা যদি কিছু থাকে তাই ব’লে দাও মা। বঙ্গমাতা বললেন—কাউনিসিলে ঢুকে পড়।

মা তো ব’লে খালাস, কিন্তু ঢোকা যায় কি ক’রে? বকুলাল মহা ফাঁপরে পড়লেন। অনেক ভেবে-চিন্তে একজন মাতাম্বর সায়েবকে ধ’রে বললেন—তিন হাজার টাকা ভ্রংকেন সেলার্স হোমে দিতে রাজী আছেন যদি গবরনেন্ট তাঁকে কাউনিসিলে নিমিনেট করে। সায়েব বললেন—টাকা তিনি প্ল্যাডলি নেবেন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না, কারণ গবরনেন্ট যার-তার কাছে ঘূষ নেয় না। বকুবাবু মূখ চুন ক’রে ফিরে এলেন। তার পর একজন রাজনীতিক চাইকে বললেন—আমি ইলেকশনে দাঁড়াতে চাই, আমার দলে ভরতি ক’রে নিন, ক্রীড কি আছে দিন সই করে দিচ্ছি। চাইনশাই বললেন—দুগ্ধের ক্রীড, আগে লাখ টাকা বার করুন দেখি, আমাদের নির্মল-বঙ্গীয়-সর্পনাশক ফাণ্ডের জন্যে,—সাপ না মারলে পাড়াগাঁয়ের লোক সাপোর্ট করবে কেন? বকুবাবু বললেন—ছি ছি, দেশের কাজ করব তার জন্যে টাকা? ঘূষ আমি দিই না। ফিরে এসে স্থির করলেন, সব ব্যাটা চোর। খরচ যদি করতেই হয়, তিনি নিজে বুঝে-সুজে করবেন।

কলকাতায় সুবিধে করতে না পেরে বকুবাবু ঠিক করলেন, সাউথ-সুন্দরবন-কনস্টিটুয়েন্সি থেকে দাঁড়াবেন। সেখানে সম্প্রতি কিছু জমিদারি কিনেছিলেন, সেজন্য ভোট আদায় করা সোজা হবে। ইলেকশনের দু-তিন মাস আগে থেকেই তিনি উঠে-পড়ে লেগে গেলেন।

তারপর হঠাৎ একদিন খবর এল যে বকুলালের পুরনো শত্রু রামজাদবাবু রাতারাতি খন্দরের সুট বানিয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন। তিনিও ঐ সৌদরবন থেকে দাঁড়াবেন। বকুবাবুর ষষ্টিগুণ রোখ চেপে গেল—তিনি টেরিটিবাজার থেকে একটি তিন নম্বরের টিকি কিনে ফেললেন, দেউড়িতে গোটা-দুই বাড়ি বাঁধলেন, আর বাড়ির রেলিং এর ওপর ঘূটে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন।

খবরের কাগজে নানারকম কেছা বার হ’তে লাগল। বকুলাল দত্ত—সেটাকে কে চেনে? চান্দ বছর আগে কার কাছে চাকরি করত? সে চাকরি গেল কেন? কেদারনীর অত পরস্যা কি করে হ’ল? হে দেশবাসীগণ, বকুলাল অত সোডাওআটার কেনে কেন? কিসের সলো মিশিয়ে খায়? বকুর বাগানবাড়িতে রাতে আলো জ্বলে কেন? বকুলাল কালো, কিন্তু তার ছোট ছেলে ফরসা হ’ল কেন? সাবধান বকুলাল, তুমি প্রিয়তম রামজাদুর সঙ্গে পাল্লা দিতে যেয়ো না, তা হ’লে আরও অনেক কথা ফাঁস ক’রে দেবে। বকুবাবুও পাল্টা জবাব ছাপতে লাগলেন, কিন্তু তত জুতসই হ’ল না, কারণ তাঁর তরফে তেমন জোরালো সাহিত্যিক-গদ্য ছিল না।

বকুবাবু ক্রমে বুদ্ধলেন যে তিনি হটে যাচ্ছেন, ভোটররা সব বেঁকে দাঁড়াচ্ছে। একদিন তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন এমন সময় তাঁর মনে পড়ল যে চোন্দ্র বৎসর আগে দেবতার দয়ায় তাঁর অদৃষ্ট ফিরে যায়। এবারেও কি তা হবে না? বকুলাল ঠিক করলেন আর একবার তেমন ক'রে কায়মনোবাক্যে তিনি তেগ্রিশ কোটিকে ডাকবেন। শৃঙ্খ বঙ্গমাতার ওপর নির্ভর করা চলবে না, কারণ তিনি তো আর সত্যিকার দেবতা নন—বিক্ষম চাটুজোর হাতে গড়া। তাঁর কোনও যোগ্যতা নেই, কেবল লোককে খেঁপিয়ে দিতে পারেন।

রাত্রি দশটার সময় বকুবাবু তাঁর আপিস-ঘরে ঢুকে দরওয়ানকে ব'লে দিলেন যে তাঁর অনেক কাজ, কেউ যেন বিরক্ত না করে। এবার আর শোবার ঘরে নয়, কারণ গিন্নী থাকলে তপস্যার বিষয় হ'তে পারে। বকুলাল ইঞ্জিচেয়ারে শুয়ে এই মর্মে একটি প্রার্থনা রুজু করলেন—‘হে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দুর্গা কালী ইত্যাদি, পূর্বে তোমরা একবার আমার মান রেখেছিলে, আমিও তোমাদের যথাযোগ্য পূজা দিয়েছি। তার পর নানান ধান্দায় আমি ব্যস্ত, তোমাদের তেমন খেঁজখবর নিতে পারি নি—কিছু মনে ক'রো না বাবারা। কিন্তু গিন্নী বরাবরই তোমাদের কলাটা মুলোটা যুগিয়ে আসছেন, সোনা-রূপোও কিছু কিছু দিয়েছেন। ঐ যে তাঁর রূপোর তাম্র-কুণ্ড, কোষাকুঁষি, ঘণ্টা, পঞ্চপ্রদীপ, শালগ্রামের সোনার সিংহাসন, সে তো আমারই টাকায় আর তোমাদেরই জন্যে। আর আমিও দেখ, এখন একটু ফরসৎ পেয়েই ধম্ম-কম্ম মন দিয়েছি, টিকি রেখেছি, গো-সেবা করছি। এখন আমার এই নিবেদন, রামজাদু ব্যাটাকে ঘাল কর। ওকে ভোটে হারাবার কোনও আশা দেখছি না। দোহাই তেগ্রিশ কোটি দেবতা, ওটাকে বধ কর। কিন্তু এক্ষুনি নয়, নমিনেশন-পেপার দেবার দু-দিন পরে, নয়তো আর একটা ভুইফোড় দাঁড়াবে। কলেরা, বসন্ত, বেরিবারি, হার্টফেল, গাড়িচাপা যা হয়। আমি আর বেশী কি বলব, তোমরা তো হরের রকম জান। দাও বাবারা, বজ্রাত ব্যাটার ঘাড় মটকে দাও—রেমোর রক্ত দাও—রক্তং দেহি, রক্তং দেহি’...বকুলালবাবু নির্বিষ্ট হয়ে এই রকম সাধনা করছেন, এমন সময়ে সেই ঘরে টুপ ক'রে একটি শব্দ হ'ল।’

নগেনের ঠোঁট নড়িয়া উঠিল। আন্তে আন্তে বলিল—‘দ—’

চাটুজো গর্জন করিয়া বলিলেন—‘চোপরও। —বকুবাবুর আপিসের কড়িকাঠে একটি টিকিটিকি আটকে ছিল। সে যেমনি হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙবে অমনি খ'সে গিয়ে টুপ করে বকুলালের টেবিলে পড়ল। বকুলাল চমকে উঠে দেখলেন—টেবিলের ওপর একটি টিকিটিকি, আর তার নীচেই একখানা পোস্টকার্ড।

পোস্টকার্ডটি পূর্বে নজরে পড়ে নি। এখন বকুবাবু প'ড়ে দেখলেন তাতে লিখেছে—মহাশয়, শুনোছি আপনি ইলেকশনে সুবিধে করে উঠতে পারছেন না। যদি আমার সাহায্য নেন আর উপদেশ-মত চলেন তবে জয় অবশ্যম্ভাবী। কাল সম্ভাষ্য আপনার সঙ্গে দেখা করব। ইতি। শ্রীরামগিধড় শর্ম।

বকুলালবাবু উৎফুল্ল হয়ে বললেন—জয় মা কালী, জয় বাবা তারকনাথ ব্রহ্মা বিষ্ণু পীর পয়গম্বর। এই পোস্টকার্ডখানি তোমাদেরই লীলা, তা আমি বেশ বৃদ্ধিতে পারছি। কাল তোমাদের ঘটা ক'রে পূজা দেব, নিশ্চিন্ত থাক। তার পর খুব মনে মনে বললেন—যাতে দেবতারাত্তর টের না পান—উ'হু বিশ্বাস নেই, আগে কাজ উদ্ধার হ'ক তখন দেখা যাবে।

সমস্ত ঘাত, তারপর সমস্ত দিন বকুবাবু ছটফট করে কাটালেন। যথাকালে রামগিধড় শর্মা দেখা দিলেন। ছোট্ট মানুষটি, মেটেমেটে রং, ছুঁচলো মূখ, খাড়া-খাড়া কান। পরনে পাটকিলে রঙের ধূতি-মেরজাই গায়ের রঙের সঙ্গে বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কথা কন কখনও হিন্দী, কখনও বাংলা। বকুলাল খুব খাতির করে বললেন—বইঠিয়ে। আপনি আর্থসমাজী? রামগিধড় বললেন—নাহি নাহি। বকু জিজ্ঞাসা করলেন—মহাবীর দল? প্যান্টওয়াল? কৌশিল-তোড়? চরখা-বাজ? রামগিধড় ওসব কিছুই নন, তিনি একজন পলিটিক্যাল পরিব্রাজক। বকুবাবু ভীতভরে পায়ের ধুলো নিলেন। রামগিধড় বললেন—বস্ হুয়া হুয়া।

তার পর কাজের কথা শুরু হ'ল। রামগিধড় জানতে চাইলেন বকুবাবুর রাজ-নীতিক মতামত কি, তিনি স্বরাজ্যী, না অরাজ্যী, না নিমরাজ্যী, না গররাজ্যী? বকু বললেন, তিনি কোনওটাই নন, তবে দরকার হ'লে সবতাতেই রাজ্যী আছেন। তিনি চান দেশের একটু সেবা করতে, কিন্তু রামজাদু থাকতে তা হবার জো নেই। রামগিধড় বললেন কোনও চিন্তা নেই, তুমি ব্যাখ্যা পার্টিতে জয়েন কর।

বকুবাবু আঁতকে উঠলেন। রামগিধড় বললেন—আমি অতি গুরু কথা প্রকাশ করে বলছি শোন। এই পার্টির সভ্যসংখ্যা একেবারে গোনাগুনুনি তিন'শ তেরটি। আমি এর সেক্রেটারি। একটিমাত্র ভেকান্স আছে, তাতে ইচ্ছা করলে তুমি আসতে পার। কাউন্সিলের সমস্ত সীট আমরাই দখল করব।

বকু ভাবসা হ'ল না। বললেন—তা পেরে উঠবেন কি করে? শত্রু অতি প্রবল, চটতে পারবেন না। নিখিল এগায়-সপ্ননাশক ফান্ডের সমস্ত টাকা ওরা হাত করেছে।

রামগিধড় খাঁক খাঁক করে হেসে বললেন—আমরা সপ্ন নই। ফান্ড না থাক, দাঁত আছে, নখ আছে। বাবা দক্ষিণরায় আমাদের সহায়। তাঁর কুপায় সমস্ত শত্রু নিপাত হবে।

তিনি কে?

চেন না? তেরিশ কোটির মধ্যে তিনিই এখন জাগ্রত, আর সবাই ঘুমচ্ছেন। বাবা তোমার ডাক শুনতে পেয়েছেন। নাও, এখন ক্রীডে সই কর। অতি সোজা ক্রীড—কেবল বাবার নিত্যকার খোরাক যোগাতে হবে—তার বদলে পাবে শত্রু মারবার ক্ষমতা আর কাউন্সিলে অপ্রতিহত প্রতাপ।

কিন্তু গবরমেণ্ট?

গবরমেণ্টের মাংসও বাবা খেয়ে থাকেন—

এংশলোচন বাধা দিয়া বললেন—‘ওকি চাটুজ্যেমশায়!’

চাটুজ্যে কহিলেন—‘হাঁ হাঁ মনে আছে। আচ্ছা, খুব ইশারায় বলছি। রামগিধড় বুঝিয়ে দিলেন, একেবারে রামরাজ্য হবে। শত্রুর বংশ লোপাট, সবাই ভাই-ব্রাদার। দিব্যি ভাগ-বাটোয়ারা করে খাবে। সকলেই মন্ত্রী, সকলেই লাট।

কিন্তু ঐ রামজাদুটা টিট হবে তো?

টিট ব'লে চিট! একেবারে ঢ-য় দীর্ঘ-ঈ চীট! তাকে তুমি নিজেই বধ করো।

বকুবাবু মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল। এইবার তাঁর কৃত্রিম দম্ভে অকৃত্রিম হাসি ফুটে উঠল। ক্রীড সই করে দিয়ে বললেন—বাবা দক্ষিণরায় কি জয়!

রামগিধড় বললেন—হুয়া, হুয়া, আব সব ঠিক হুয়া।

এই স্থির হ'ল যে কাল ফাইভ-আপ-প্যাসেজারে বকুবাবু তাঁর সুন্দরবনের

জমিদারিতে রওনা হবেন। সেখানে পৌঁছলে রামগিষড় তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে বাবার আশীর্বাদ পাইয়ে দেবেন।

বকুবাবুর মাথা বিগড়ে গেল। সমস্ত রাত তিনি খেয়াল দেখলেন রামগিষড় হুয়া হুয়া করছে। রামরাজ্য, কাউন্সিলে অপ্রতিহত প্রতাপ, লাট, মন্ত্রী—এসব বড় বড় কথা তাঁর মনে ঠাঁই পায় নি। রামজাদু মরবে আর তিনি কাউন্সিলে ঢুকবেন—এইটেই আসল কথা। তার পর রামরাজ্যই হ'ক্ আর রাক্ষসরাজ্যই হ'ক্, দেশের লোক বাঁচুক বা বাবার পেটে যাক, তাতে তাঁর ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই।

তারপর সৌন্দর্যবনে গভীর অমাবস্যা রাত্রে বাবা তাঁকে দর্শন দিলেন।

বিনোদ বলিলেন—‘চাটুজ্যোমশায়, আপনি বড় ফাঁকি দিচ্ছেন। বাবার মূর্তিটা কি রকম তা বলুন?’

চাটুজ্যে। বলব না, ভয় পাবে। বিশেষ করে এই উদোটা।

উদয় বলিল—‘মোটেই না। হাজারিবাগে থাকতে কতবার আমি রাস্তিরে একলা উঠেছি। বউ বলত—’

চাটুজ্যে বলিলেন—‘বউ বলুক গে। বাবা প্রথমটা সৌম্য রাক্ষসের মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছিলেন। বকুলালকে বললেন—বৎস, আমি তোমার প্রার্থনায় খুশী হয়েছি। এখন বর কি নেবে বল।

বকুবাবু বললেন—বাবা, আগে রামজাদুটাকে মার, ও আমার চিরকালের শত্রু।

বাবা বললেন—দেশের হিত?

বকু উত্তর দিলেন—হিত-টিত এখন থাক বাবা। আগে রামজাদু।

বাবা বললেন—তাই হ'ক্। ক্রীড় সই করেছ, এখন তোমায় জাতে তুলে দি—

এতক কহিয়া প্রভু রায় মহাশয়  
ধরিলেন নিজ রূপ দেখে লাগে ভয়।  
পর্বতপ্রমাণ দেহ মধ্যে ক্ষীণ কাটি,  
দুই চক্ষু ঘোরে যেন জ্বলন্ত দেউটি।  
হলুদ বরন তনু তাহে কৃষ্ণ রেখা,  
সোনার নিকষে যেন নীলাঞ্জন লেখা।  
কড়া কড়া খড়া খড়া গোঁফ দুই গোছা,  
বাঁশঝাড় যেন দেয় আকাশেতে খোঁচা।  
মুখ যেন গিরিগহ্বা রক্তবর্ণ তালু,  
তাহে দন্ত সারি সারি যেন শাঁখ আলু।  
দু-চোয়াল বহি পাড়ে সাদা সাদা গেঞ্জ,  
আছাড়ি পাছাড়ি নাড়ে বিশ হাত লেঞ্জ।  
ছাড়েন হুক্কার প্রভু দন্ত কড়মড়ি,  
জীব জন্তু যে যেখানে ভাগে দড়বড়ি।  
ভয় পাঞা দেবগণ ইন্দ্রে দেয় ঠেলা,  
কহে—দেবরাজ হান বজ্র এইবেলা।  
ইন্দ্র বলে, ওরে বাপা কিবা বৃদ্ধি দিলে,  
রাহিবে পিতার নাম আপদনি বাঁচিলে।  
চক্ষু বান্ধ ফেটা বাপা কানে দাও রুই,  
কপাট ভেজাঞা সুখা খাও ফৌক দুই।

বাবা দক্ষিণরায় তাঁর ল্যাজটি চট্ ক'রে বকুবাবুর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে বকুলাল ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করলেন।

বাবা বললেন—যাও বৎস, এখন চ'রে থাও গো।

চাটুজো হুক'কায় মনোনিবেশ করিলেন। বিনোদবাবু বললেন—‘তার পর?’

‘তার পর আবার কি! বকুলাল কেঁদেই আকুল। ও বাবা, একি করলে? আমি ভাত খাব কি ক'রে? শোব কোথায়? সিন্ধের চোগা-চাপকান পরব কি ক'রে? গিন্নী যে আর চিনতে পারবে না গো!

বাবা অশ্রুধারা। রামগিঞ্চড় বললে—আবার ক'র হুয়া? গোল মত কর। এখন ভাগ্যে, শত্ৰু পকড় পকড়কে থাও গো। বকুলাল নড়েন না, কেবল ভেউ ভেউ কান্না। রামগিঞ্চড় খ্যাক ক'রে তাঁর পায়ে কামড়ে দিলে। বকুলাল ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পালালেন।

পরদিন সকালে কখন চায়া দেখতে পেলে একটি বৃক্ষ বাঘ পদ্যারের ভেতর দুল'কছে। চায়া চায়া তাঁর নিয়ে গেল ডেপুটিবাবুর বাড়ি। তিনি বললেন—এমন লাখ জো দোখ নি, আমার মত রং। আহা, শেয়ালে কামড়েছে, একটু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দি। একটু চায়া হোক, তারপর আলিপূর নিয়ে ঘেয়ো; বকশিশ মিলবে।

বকুবাবু এখন আলিপূরেই আছেন। আর দেখাসাক্ষাৎ করিলে—ভন্দরলোককে মাঝে লজ্জা দেওয়া।

বিনোদবাবু বললেন—‘আচ্ছা চাটুজোমশায়, বাবা দক্ষিণরায় কখনও গুলি খোঁয়োছেন?’

‘গুলি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।’

‘তিনি না খান, তাঁর ভক্তরা কেউ খান নি কি?’

‘দেখ বিনোদ, ঠাকুর-দেবতার কথা নিয়ে তামাশা ক'রো না, তাতে অপরাধ হয়। আচ্ছা ব'স তোমরা—আমি উঠি।’



চাংদোলা করে নিয়ে গেল



চাট্‌জ্যোমশায় পাঁজি দেখিয়া বলিলেন—‘রাত্রি ন-টা সাতান মিনিট গতে অশ্ববাচী নিবৃত্তি। তার আগে এই বৃষ্টি থামবে না। এখন তো সব সন্ধ্যা।’

বিনোদী উকিল বলিলেন—‘তাই তো, বাসায় ফেরা যায় কি ক’রে।’

গৃহস্বামী বংশলোচনবাবু বলিলেন—‘বৃষ্টি থামলে সে চিন্তা ক’রো। আপাতত এখানেই থাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হোক। উদো, ব’লে আয় তো বাড়ির ভেতর।’

চাট্‌জ্যো বলিলেন—‘মসুর ডালের খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা।’

বিনোদবাবু তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া বলিলেন—‘তা তো হ’ল, কিন্তু ততক্ষণ সময় কাটে কিসে। চাট্‌জ্যোমশায়, একটা গল্প বলুন।’

চাট্‌জ্যো ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—‘আর-বছর মৃগোরে থাকতে আমি এক বাঘিনীর পাঞ্জায় পড়েছিলাম।’

বিনোদবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—‘দোহাই চাট্‌জ্যোমশায়, বাঘের গল্প আর নয়।’

চাট্‌জ্যো একটু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—‘তবে কিসের কথা বলব, ভূতের না সাপের?’

—‘এই বর্ষায় বাঘ ভূত সাপ সমস্ত অচল, একটি মোলায়েম দেখে প্রেমের গল্প বলুন।’

—‘গল্প আমি বলি না। যা বলি, সমস্ত নিছক সত্য কথা।’

—‘বেশ তো একটি নিছক সত্য প্রেমের কথাই বলুন।’

নগেন বলিল—‘তবেই হয়েছে চাট্‌জ্যোমশায় প্রেমের কথা বলবেন! বয়স কত হ’ল চাট্‌জ্যোমশায়? আর কটা দাঁত বাকী আছে?’

—‘প্রেম কি চিবিয়ে খাবার জিনিস? ওরে গদ’ভ, দাঁতে প্রেম হয় না, প্রেম হয় মনে।’

নগেন বলিল—‘মন তো শূন্যে আমসি হয়ে গেছে। প্রেমের আপনি জানেন কি? সব ভুলে মেরে দিয়েছেন। প্রেমের কথা বলবে তরুণরা। কি বলিস উদো?’

—‘তরুণ কি রে বাপু? সোজা বাংলায় বল চ্যাংড়া। তিন কুড়ি বয়েস হ’ল, কেদার চাটুজ্যে প্রেমের কথা জানে না, জানে যত হ্যাংলা চ্যাংড়ার দল!’

বিনোদবাবু বলিলেন—‘আঃ হা, কেন ব্রাহ্মণকেও চটাও, শোনই না ব্যাপারটা।’

চাটুজ্যে বলিলেন—‘বর্ণের শ্রেষ্ঠ হলেন ব্রাহ্মণ। দর্শন বল, কাব্য বল, প্রেমতত্ত্ব বল, সমস্ত বোরিয়েছে ব্রাহ্মণের মাথা থেকে। আবার ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ হলেন চাটুজ্যে। যথা বর্ণিকম চাটুজ্যে, শরণ চাটুজ্যে—’

—‘আর?’

—‘আর এই ক্যাদার চাটুজ্যে। কেন বলব না? তোমাদের ভয় করব নাকি?’

—‘যাক যাক, আপনি আরম্ভ করুন।’

চাটুজ্যেমাশায় আরম্ভ করিলেন—‘আর বছরের ঘটনা। আমি এক অপরূপ সুন্দরী নারীর পাল্লায় পড়েছিলাম।’

নাগো, গিলগ ‘এই যে বলছিলেন বাঘিনীর পাল্লায়?’

বিনোদ বলিলেন ‘একই কথা।’

চাটুজ্যে বলিলেন—‘ওয়ে মদুখু, বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিলুম মদুংগেরে, আর এই নারীর ব্যাপার ঘটেছিল পঞ্জাব মেলে, টুন্ডলার এদিকে। যাক, ঘটনাটা শোন।—

গৌল বছর মাঘ মাসে চরণ ঘোষ বললে তার ছোট মেয়েটিকে টুন্ডলায় রেখে আসতে, জামাই সেখানেই কর্ম করে কিনা। সুবিধেই হ’ল, পরের পরসায় সেকেন্ড ক্লাসে ভ্রমণ, আবার ফেরবার পথে একদিন কাশীবাসও হবে। মেয়েটাকে তো নির্বিঘ্নে পেঁচিয়ে দিলুম। ফেরবার সময় টুন্ডলা স্টেশনে দেখি গাড়িতে তিলাধী আয়গা নেই, আগ্রার ফেরত এক পাল মার্কিন ভবঘুরে সমস্ত ফাস্ট সেকেন্ড ক্লাসের বেণ্ডি দখল করে আছে। ভাগ্যিস জামাই রেলের ডাক্তার, তাই গাড়িকে ব’লে ক’য়ে আমায় একটা ফাস্ট ক্লাসে ঠেলে তুলে দিলে। গাড়িও তখনই ছাড়ল।

তখন সকাল সাতটা হবে, কিন্তু কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন, গাড়ির মধ্যে সমস্ত শ্বাসপাস। কিছুক্ষণ ধাঁধা লেগে চুপটি ক’রে দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপর ক্রমে ক্রমে কামরার ভেতরটা ফুটে উঠল।

দেখেই চক্ষু স্থির। ওধারের বোর্ডিংয়ে একটা অসুস্থের মতন আখাম্বা ঢাঙা সায়েব চাওপাত হ’য়ে চোখ বুঁজে হাঁ করে শুয়ে আছে, আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় ক’রে নিঃশ্বাস ছেড়ে। দু-বোর্ডিংর মাঝে মেঝের ওপর আর একটা বেঁটে মোটা সায়েব মদুখ গুঁজে ঘুমচ্ছে, তার মাথার কাছে একটা খালি বোতল গড়গড়ি যাচ্ছে। ওধারের বেণ্ডিতে কেউ নেই, কিন্তু তাতে দামী বিছানা পাতা, তার ওপর একটা অশুভ পোশাক—বোধ হয় ভাল্লুকের চামড়ার,—আর নানা রকম জিনিসপত্র ছড়ানো রয়েছে। গাড়ি চলছে, পালার উপায় নেই। বোর্ডিংর শেষদিকে একটা চোয়ারের মতন জায়গা ছিল, তাইতে ব’সে দুর্গানাম জপতে লাগলুম। কোনও গতিকে সময় কাটতে লাগল, সায়েব দুটো শুয়েই রইল, আমারও একটু একটু ক’রে মনে সাহস এল।

ঠাণ্ডা বাতরুন্মের দরজা খুলে বোরিয়ে এল এক অপরূপ মূর্তি। দূর থেকে নিম্নের মেমসায়েব দেখেছি, কিন্তু এমন সামনাসামনি দেখবার সুযোগ কখনও ঘটে না। মদুখানি চীনে করমচা, ঠোঁট দুটি পাকা লঙ্কা, মারবেলে কোঁদা আজানুলম্বিত



দুই বাহু। চোপ্ত ঘাড়-ছাঁটা, কেবল কানের কাছে শগের মতন দু'গাছি চুল কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। পরনে একটি দেড়হাতী গামছা—'

বিনোদবাবু বলিলেন—'গামছা নয় চাটুজ্যোমশায়, ওকে বলে স্কার্ট'।

—'কাঠ-ফাট জানি নে বাবা। পণ্ট দেখলুম বাঁদিপোতার গামছা খাটো ক'রে পরা, তার নীচে নেমে এসেছে গোলাপী কলাগাছের মতন দুই পা, মোজা আছে কি নেই বুঝতে পারলুম না। দেহযণ্টি কথটা এতদিন ছাপার হরফেই পড়েছি, এখন স্বচক্ষে দেখলুম—হাঁ, যণ্টি বটে, মাথা থেকে বুক-কোমর অবধি একদম চাঁচাছোলা, কোথাও একটু উঁচু-নীচু টক্কর নেই। সগরিণী পল্লবিনী লতেব নয়, একবার জ্বলন্ত হাউই-এর কাঠি। দেখে বড়ই ভক্তি হ'ল। কপালে হাত ঠেকিয়ে বললুম—সেলাম মেমসাহেব।

ফিক ক'রে হাসলেন। পাকা লঙ্কার ফাঁক দিয়ে গুটিকতক কাঁচা ভুট্টার দানা দেখা গেল। ঘাড় নেড়ে বললেন—ঘুৎ মনিং।



দূর থেকে বিস্তর মেমসাহেব দেখেছি

মেম নৃত্যপরা আপসরার মতন চণ্ডল ভঙ্গীতে এসে বেঞ্চে বসলেন। আমি কাঁচু-মাচু হ'য়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লুম। মেম বললেন—সিট ডাউন বাবু, ডরো মং।

দেবীর এক হাতে বরাভয়, অপর হাতে সিগারেট। বুঝলুম প্রসন্ন হয়েছেন, আর আমায় মারে কে। ইংরিজী ভাল জানি না, হিন্দী ইংরিজী মিশিয়ে নিবেদন করলুম—নিতান্ত স্থান না পেয়েই এই অনধিকারপ্রবেশ করেছি, অবশ্য গাড়ের হুকুম নিয়ে ;

মেমসাহেব যেন কসদুর মাফ করেন। মেম আবার অভয় দিলেন, আমিও ফের ব'সে পড়লুম।

কিন্তু নিস্তার নেই। মেমসাহেব আমার পাশে ব'সে একটু দাঁত বার ক'রে আমাকে একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

এই কৈদার চাটুজ্যকে সাপে তাড়া করেছে, বাঘে পেছা নিয়েছে, ভূতে ভয় দেখিয়েছে, হনুমানের দাঁত খিঁচিয়েছে, পদলিসকোটের উকিল জেরা করেছে, কিন্তু



কিন্তু এমন সামনাসামনি—

এমন দুরবস্থা কখনও ঘটে নি। বাট বছর বয়েস, রংটি উজ্জ্বল শ্যাম বলা চলে না, পাঁচ দিন স্কোরি হয় নি, মূখ যেন কদম ফুল,—কিন্তু এই সমস্ত বাধা ভেদ ক'রে লজ্জা এসে আমার আকর্ষণ বেগনী ক'রে দিলে। থাকতে না পেরে বললুম—মেমসাহেব, কেয়া দেখতা?

মেম হু-হু ক'রে হেসে বললেন—কুছ নেই, নো অফেন্স। তুম কোন্ হায় গাহু?

আমার আত্মমর্যাদায় ঘা পড়ল। আমি কি সঙ না চিড়িয়াখানার জন্তু? বদক চাঁতয়ে মাথা খাড়া ক'রে বললুম—আই কৈদার চাটুজ্যে, নো জু-গার্ডেন।

মেম আবার হু-হু করে হেসে বললেন—বেঙ্গলী?

আমি সগর্বে উত্তর দিলুম—ইয়েস সার, হাই কাস্ট বেঙ্গালী ব্রান্সিন। পইতেটা টেনে বার ক'রে বললুম—সী? আপ কোন হ্যায় ম্যাডাম?

বিনোদবাবু বললেন—'ছি চাটুজোমশায়, মেয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন! ওটা যে এটিকেটে বারণ!'

'কেন করব না? মেম যখন আমার পরিচয় নিলে তখন আমিই বা ছাড়ব কেন? মেম মোটেই রাগ করলেন না, জানালেন তাঁর নাম জোন জিলটোর, নিবাস আমেরিকা, এদেশে এর পূর্বেও ক-বার এসেছিলেন, ইন্ডিয়া বড় আশ্চর্য জায়গা।

আমি সাহস পেয়ে সায়েব দুটোকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—এ'রা কারা?

মেমটি বড়ই সরলা। বৌগির উপরের ঢাঙা সায়েবের দিকে কড়ে আঙুল বাড়িয়ে বললেন—দ্যাট চ্যাপি হচ্ছেন টিমথি টোপার, নিবাস কালিফোর্নিয়া, আমাকে বিবাহ করতে চান। ইনি দশ কোটির মালিক। আর যিনি গড়গাড়ি যাচ্ছেন, উনি হচ্ছেন ক্রিস্টফার কলম্বস রটো, ইনিও আমাকে বিবাহ করতে চান, এরও দশ কোটি ডলার আছে।

আমি গম্ভীরভাবে বললুম—কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন।

মেম বললেন—সে অন্য লোক। এ'রা আমেরিকায় থেকেও কিছু আবিষ্কার করতে পারেন নি। দেশটা একদম শূন্য হয়ে গেছে, মেথিলেটেড স্পিরিট ছাড়া কিছুই মেলে না। তাই এ'রা দেশত্যাগী হয়ে খাঁটি জিনিসের সম্বন্ধে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম—এ'রা বুঝি মস্ত স্পিরিচুয়ালিস্ট?

মেম বললেন—ভেরি!

এমন সময় ঢাঙা সায়েবটা চোখ মেলে কটমট ক'রে চেয়ে আমার দিকে ঘুরি তুলে বললে—ইউ-ইউ গেট আউট কুইক। বে'টেটাও হঠাৎ হাত-পা ছুড়তে শব্দ করলে।

আমি আমার লাঠিটা বাগিয়ে ধ'রে ঠক ঠক ক'রে ঠুকতে লাগলুম। মেমসায়েব বিছানা থেকে তাঁর পালকমোড়া চটিজুতো তুলে নিয়ে ঢাঙার দুই গালে পিটিয়ে আদর ক'রে বললেন—ইউ পগ্, ইউ পগ্। বে'টেটাকে লাথি মেরে বললেন—ইউ পিগ্, ইউ পিগ্। দুটোই তখনই আবার হাঁ ক'রে ঘুমিয়ে পড়ল। মেম তাদের বকের ওপর এক-এক পাটি চটি রেখে দিয়ে স্বস্থানে ফিরে এসে বললেন—ভয় নেই বাবু।

ভরসাই বা কই? আরব্য উপন্যাসে পড়েছিলুম একটা দৈত্য এক রাজকন্যাকে সিন্দূরকে পুরে মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াত। দৈত্যটা ঘুমুলে রাজকন্যা তার বকের ওপর একটা ঢিল রেখে দিয়ে যত রাজ্যের রাজপুত্রের জুড়ি নিয়ে আংটি আদায় করতেন। ভাবলুম এইবার সেরেছে রে! এই মেমসায়েব দু-দুটো দৈত্যের ঘাড় চড়ে বেড়াচ্ছে, এখনই নিরানন্দই আংটির মালা বার করবে।

যা শুয় করছিলুম ঠিক তাই। আমার হাতে একটা রূপো আর তামার তারে জড়ানো পলা-বসানো আংটি ছিল। মেম হঠাৎ সেটাকে দেখে বললেন—হাউ লভ্জি! দেখি বাবু কি রকম আংটি।

আমি ভয়ে ভয়ে হাতটি এগিয়ে দিলুম, যেন আঙুলহাড়া অস্তর করছি। মেম ফস্ করে আংটিটি খুলে নিয়ে নিজের আঙুলে পরিয়ে বললেন—বিউটিফুল!

হরে রাম! এ যে আমার হিন্দুস্থান জপ করার আংটি,—হায় হায়, এই স্নেহ মাগী সেটাকে অপবিত্র করে দিলে! আমার চোখ ছিলছিল করে উঠল, কিন্তু কৌতূহলও খুব হল। বললুম—মেমসাহেব, আপনাকে আর কয়টো আংটি হায়? নাইন্টনাইন?

মেম বোম্বের তলা থেকে একটি তোরঙ্গ টেনে এনে তা থেকে একটি অদ্ভুত বাস খুলে আমাদের দেখালেন। চোখ ঝলসে গেল। দেবাজের পর দেবাজ, কোনওটার গলার হার, কোনওটার কানের দুল, কোনওটার আর কিছূ। একটা আংটির ট্রে—তাতে কুড়ি-পঁচিশটা হবে—আমার সামনে ধরে বললেন—যেটা খুশি নাও বাবু!

আমি বললুম—সে কি কথা। আমার আংটির দাম মোটে ন-সিকে। আমি, ওটা আপনাকে প্রেজেন্ট করলুম, সাবধানে রাখবেন, ভেঁরি হোলি আংটি।

মেম বললেন—ইউ ওল্ড ডিয়ার! কিন্তু তোমার উপহার যদি আমি নিই, আমার উপহারও তোমার ফেরত দেওয়া উচিত নয়। এই বলে একটা চুনির আংটি আমার আঙুলে পরিয়ে দিলেন। বললুম—থ্যাংক ইউ মেমসাহেব, আমি আপনার গোলাম, ফরগেট মি নট! মনে মনে বললুম—ভয় নেই ব্রাহ্মণী, এ আংটি তোমার জন্যেই রইল।

টেন এটাওয়া এসে পৌঁছল। কেলনারের খানসামা চা রুটি মাখন নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—টি হুজুর? মেম ট্রে রাখলেন। তারপর আমার লাঠিটা নিয়ে চ্যাঙা আর বোটেকে একটু গুঁতো দিয়ে বললেন—গেট আপ টিমি, গেট আপ ব্রটো। তারা বুনো শূয়োরের মতন ঘোঁত ঘোঁত করে কি বললে শুনতে পেলুম না। আন্দাজে বুঝলুম তাদের ওঠবার অবস্থা হয় নি। মেম আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন—চ্যাটার্জি, তুমি খাবে? আপত্তি নেই তো?

মহা ফাঁপরে পড়া গেল। স্নেহ নারীর স্বহস্তে মিশ্রিত, কিন্তু ভুরভুর খোশবায়, শীতটাও খুব পড়ছে। শাস্তি চা খেতে বারণ কোথাও নেই। তা ছাড়া রেলগাড়ির মতন বহু কাপ্টে বঁসে শীত নিবারণের জন্যে ঔষধার্থে যদি চা পান করা যায় তবে নিশ্চয়ই দোষ নাস্তি। বললুম—ম্যাদাম লক্ষ্মী, তুমি যখন নিজ হাতে চা দিচ্ছ, তখন কেন খাব না। তবে রুটিটা থাক।

চায়ে মনের কপাট খুলে যায়, খেতে খেতে অনেক বেকাস কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। অশ্বখামা যেমন দুধের অভাবে পিটুর্লিগোলা খেয়ে আহুদে নৃত্য করতেন, নিরীহ বাঙালী ভৈরব চায়েতেই মদের নেশা জমায়। বাক্সম চাটুজ্যে তারিফ করে চা খেতে শেখেন নি, সর্দি-টর্দি হ'লে আদা-নুন দিয়ে খেতেন,—তাতেই লিখতে পেয়েছেন—বন্দী আমার প্রাপ্তবর। আজকাল চায়ের কল্যাণে বাংলা দেশে ভাবের বন্যা এসেছে,—ঘরে ঘরে চা, ঘরে ঘরে প্রেম। সেকালের কবিদের বিস্তর বায়নাঙ্ক ছিল,—উপবন রে, চাঁদ রে, মলয় রে, কোকিল রে। তবে পঞ্চশর ছুটবে। এখন কোনও কথা নেই,—চাই শব্দ দুটো হাতল-ভাঙা বাঁটি, একটু ছোঁড়া অয়েল ক্রথ, একটা ফেরোসিন কাঠের টেবিল, দু'ধারে দুই তরুণ-তরুণী, আর মধ্যখানে ধূমায়মান কুতলি। ভাগ্যিস বয়েসটা ষাট, তাই বেঁচে গিয়েছিলুম।

মেমকে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা মেমসাহেব, এই যে দুই হুজুর গড়াগড়ি যাচ্ছেন, এরা দুজনেই তো আপনার পাণিপ্রার্থী। আপনি কোন ভাগ্যবানটিকে বরণ করবেন?

মেম বললেন—সে একটি সমস্যা। আমি এখনও মনস্থির করতে পারি নি। কখনও মনে হয় টিমিই উপযুক্ত পাঠ, বেশ লম্বা সুন্দরদুধ, আমাকে ভালও বাসে খুব। কিন্তু মদ খেলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আর ঐ রটো, যদিও বেটে মোটা, আর একটু বয়স হয়েছে, কিন্তু আমার অত্যন্ত বাধা আর নরম মন। একটু মদ খেলেই কেঁদে ফেলে। বড় মশাকিলে পড়েছি, দুজনেই নাছোড়বান্দা। যা হক এখনও ক-ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে, হাওড়া পৌঁছবার আগেই স্থির ক'রে ফেলব। আচ্ছা চ্যাটার্জি, তুমিই বল না—এদের মধ্যে কাকে বিয়ে করা উচিত।

বললুম—মেমসাহেব, আপনি এদের স্বভাবচরিত্র যে প্রকার বর্ণনা করলেন তাতে বোধ হয় দুটিই অতি সুপাঠ। তবে কি না এরা ষেরকম বেহুশ হয়ে আছেন—

মেম বললেন—ও কিছু নয়। একটু পরেই দুজনে চাঙ্গা হ'য়ে উঠবে।

আমি বললুম—আপনার নিজের যদি কোনওটির ওপর বেশী ঝোঁক না থাকে, তবে আপনার বাপ-মার ওপর স্থির করার ভার দিন না?

মেম বললেন—আমার বাপ-মা কেউ নেই, নিজেই নিজের অভিভাবক। দেখ চ্যাটার্জি, তোমার ওপরেই ভার দিলুম। তুমি বেশ ক'রে দুটোকে ঠাউরে দেখ। মোগলসরইএ নেমে যাবার আগেই তোমার মত আমাকে জানাবে। ভেবেছিলুম একটা টাকা ছুপড়ে চিত-উবুড় করে দেখে মনস্থির করব, কিন্তু তুমি যখন রয়েছ তখন আর দরকার নেই।

বাবস্থা মন্দ নয়। আত্মীয়-বন্ধুদের জন্যে এ পর্যন্ত বিনতর বর-কনে ঠিক ক'রে দিয়েছি, কিন্তু এমন অশুভত পাঠ দেখার ভার কখনও পাই নি। দুজনেই ক্রোরপতি, দুটোই পাড়মাতাল। একটা লম্বায় বড়, আর একটা ওজনে পুষ্টিয়ে নিয়েছে। বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় এ যাবৎ যা পেয়েছি তা শুধু ঘোঁত ঘোঁত। চুলোয় যাক, মেমের যখন আপত্তি নেই তখন যেটার হয় নাম বলব। আর যদি বুঝি যে মেম আমার কথা রাখবে, তবে বলব—মা লক্ষ্মী, গাথা যখন আগেই মূর্খিয়েছ তখন বাকী কাজ-টুকুও সেরে ফেল।—এই দু-বাটা ভাবী স্বামীকে কোঁটিয়ে নরকস্থ কর।

গল্প করতে করতে বেলা প্রায় সাড়ে নটা হ'য়ে এল। এর পরেই একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি থামবে, সেই অবসরে সায়েব-মেমরা হাজির খেতে খানা-কামরায় যাবে। এতক্ষণ ঠাণ্ডা হয় নি, এখন দেখতে পেলুম চা খেয়ে মেমের ঠোঁট ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বুদ্ধলুম রফিট কাঁচা। মেম একটি সোনার কোটো খুললেন, তা থেকে বেরুল একটি ছোট আরশি, একটি লাল বাতি, একটি পাউডারের পুন্টিলি। লালবাতি ঠোঁটে ঘষে নাকে একটু পাউডার লাগিয়ে মুখখানি মেরামত ক'রে নিলেন।

গাড়ি থামল। মেম বললেন—চ্যাটার্জি, আমি ব্রেকফাস্ট খেতে চললুম। টিমি আর রটো রইল, এদের দিকে একটু নজর রেখো, যেন জেগে উঠে মারামারি না করে। যদি সামলাতে না পার তবে শেকল টেনো।

আহা, কি সোজা কাজই দিয়ে গেলেন! প্রায় আধ ঘণ্টা পরে কানপুরে গাড়ি থামবে, তখন মেম আবার এই কামরায় ফিরে আসবেন। ততক্ষণ মরি আর কি! লাঠিটা বাগিয়ে নিয়ে ফের দুর্গানাম জপ করতে লাগলুম।

চ্যাঙা সায়েবটা উঠে বসেছে। হাই তুললে, চোখ রগড়ালে, আঙুল মটকালে। আমার দিকে একবার কটমট ক'রে চাইলে, কিন্তু কিছু বললে না। টলতে টলতে বাথরুমে গেল।



ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল

তখন বেঁচেটা তড়াং করে উঠে কোলা ব্যাঙের মতন থপ করে আমার পাশে এসে বসল। আমি ভয়ে চেঁচাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তার আগেই সে আমার হাতটা নেড়ে দিয়ে বললে—গুড মর্নিং সার, আমি হচ্ছি ক্রিস্টফার কলম্বস রটো।

আমি সাহস পেয়ে বললুম—সেনাম হুজুর।

—আমার দশ কোটি ডলার আছে। প্রতি মিনিটে আমার আয়—

—হুজুর দুনিয়ার মালিক তা আমি জানি।

রটো আমার বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বললে—লুকু হিয়ার বাবু, আমি তোমাকে পাঁচ টাকা বকশিশ দেবো।

—কেন হুজুর।

—মিস জিলটারকে তোমার রাজী করাতেই হবে। আমি তোমাদের সমস্ত কথা শুনোছি। তোমারই ওপর সমস্ত ভার, তুমিই কন্যাকর্তা। ঐ টিমথি টোপার—ও

অতি পাজী লোক, ওর সমস্ত সম্পত্তি আমার কাছে বাঁধা আছে। ও একটা পাড়-মাতাল, পপার, ওর সঙ্গে বিয়ে হ'লে মিস জিল্টার মনের দুরখে মারা যাবেন।

এই বলে রটো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। একটা বোতলে একটু তলানি পড়ে ছিল, সেটুকু খেয়ে ফেলে বললে—বাবু, তুমি জন্মান্তর মান?

—মানি বইকি।

—আমি আর জন্মে ছিলাম একটি তৃষিত চাতক পক্ষী, আর এই মেম ছিল একটি রূপসী পানকোড়ি। আমরা দুটিতে—

এমন সময় বাথরুমের দরজা নড়ে উঠল। রটো তাড়াতাড়ি আমাকে পাঁচ আঙুল দেখিয়ে ইশারা ক'রেই ফের নিজের জায়গায় শূয়ে নাক ডাকাতে লাগল।

ঢাঙা সায়েব—মেম থাকে টিমি বলে—ফিরে এসে নিজের বেঞ্চে গ্যাঁট হয়ে বসল। তখন রটো জেগে ওঠার ভান ক'রে হাই তুললে, চোখ রগড়ালে, আমার দিকে একবার করুণ নয়নে চেয়ে বাথরুমে ঢুকল।

এবার টিমির পালা। রটো স'রে যেতেই সে কাছে এসে আমার হাতটা চেপে ধরলে। আমি আগে থাকতেই বললুম—গুড মর্নিং সার।

টিমি আমার হাতটায় ভীষণ মোচড় দিলে।

বললুম—উঃ!

টিমি বললে—তোমার হাড় গুঁড়ো ক'রে দেব।

ভয়ে ভয়ে বললুম—ইয়েস সার।

—তোমায় থে'তলে জেলি বানাব।

—ইয়েস সার।

—মিস জোন জিল্টারকে আমি বিয়ে করবই! আমি সমস্ত শুনছি। যদি আমার হয়ে তাকে না বল তবে তোমাকে বাঁচতে হবে না।

—ইয়েস সার।

—আমার অগাধ সম্পত্তি। পাঁচটা হোটেল, দশটা জাহাজ কোম্পানি, পঁচিশটা শূটকী শূওরের কারখানা। রটোর কি আছে? একটা মদের চোরা ভাঁটি, তাও আমার টাকার। রটো একটা হতভাগা মাতাল বে'টে বজ্জাত—

রটো বোধ হয় আড়ি পেতে সমস্ত শুনছিল। হঠাৎ কামরায় ছুটে ফিরে এসে ঘুরি তুলে বললে, কে হতভাগা, কে মাতাল, কে বে'টে বজ্জাত?

সকলেরই বিশ্বাস যে গান আর গালাগালি হিন্দীতেই ভাল রকম জমে। হিন্দী গালাগালের প্রসাদগুণ খুব বেশী তা স্বীকার করি। কিন্তু যদি নিছক আওয়াজ আর দাপট চাও তবে বিলিভী গাল শুনো—বিশেষ করে মার্কিনী গাল। এক-একটি লব্জ যেন তোপ, কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশে। ইংরিজী আমি ভাল জানি না, সব গালাগালির অর্থ বুঝতে পারি নি, কিন্তু তাতে রসগ্রহণের কিছু মাত্র বাধা হয় নি।

দেখলুম এক বিষয়ে সায়েবরা আমাদের চেয়ে দুর্বল—তারা বাগ্‌যুদ্ধ বেশীক্ষণ চালাতে পারে না। দু-মিনিট যেতে না যেতেই হাতাহাতি আরম্ভ হ'ল। আমি হতভম্ব হয়ে দেখতে লাগলুম, গাড়ি কখন কানপুরে এসে থামল, তা টের পাই নি।

হনহন ক'রে মেমসাহেব এসে পড়ল। এই গজ-কচ্ছপের লড়াই থামানো কি তার কাজ? বললে—টিমি ডিয়ার, ডোন্ট—রটো ভারি লিং, ডোন্ট—প্লিজ প্লিজ ডোন্ট। কিছুই ফল হ'ল না। আমি বেগতিক দেখে গাড়ি থেকে নেমে ছুটলুম।

ফাস্ট সেকেন্ড ক্লাস সমস্ত খালি। ডাইনিং কারে সকলে তখনও থানা আছে। কাকে বলি? ওই যে—একটা সাদা ফ্রান্সের পেন্টুলুন-পরা সায়েব প্লাটফর্মে পাই-চারি ক'রে শিস দিচ্ছে। হস্তদন্ত হ'য়ে তাকে বললুম—বাম্ সার, লেডির মহা বিপদ। সায়েব হুশ করে একটি জোর শিস দিয়ে আমার সঙ্গে ছুটল।



হাতাহাতি আরম্ভ হ'ল

মেম তখন আমার লাঠিটা নিয়ে অপক্ষপাতে দু-ব্যাটাকেই পিটিছিলেন। কিন্তু তাদের ড্রফ্কেপ নেই, সমানে বটোপুটি করছে। আগন্তুক সায়েবটি মেমকে জিজ্ঞাসা করলে—হেলো জোন, ব্যাপার কি? মেম তাড়াতাড়ি ব্যাপার বুদ্ধিয়ে দিলেন। সাহেব টির্ম আর রটোকে থামাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তারা তাকেই মারতে এল। নতুন সায়েবের তখন হাত ছুটল।

বাপ, কি ঘৃষির বহর? টির্ম ঠিকরে গিয়ে দরজায় মাথা ঠুকে প'ড়ে চতুর্দশ ঘণ্টা অন্ধকার দেখতে লাগল। রটো কোঁক ক'রে বেণ্ডের তলায় চিতপাত হ'য়ে পড়ল। বিলকুল ঠান্ডা।

একটু জিরিয়ে নিয়ে মেম আমার সঙ্গে নতুন সায়েবটির পরিচয় করিয়ে দিলেন। হান নিখ্যাত মিস্টার বিল বাউন্ডার, খুব ভাল ঘৃষি লড়তে পারেন। আর ইনি মিস্টার চ্যাটার্জি, ভেরি ডিম্বার ওল্ড ফ্রেন্ড।



সারেব আমার মুখখানা দেখে বললে—সাম্ বিয়াড!

মেম বললেন—থাকুক দাড়ি। ইনি অতি জ্ঞানী লোক।

সারেব আমার হাতটা খুব করে নেড়ে দিয়ে বললে—হা-ডু-ডু? বেশ শীত পড়েছে নয়?

খাঁ করে আমার মাথায় একটা মতলব এল। মেমসারেবকে চুপি চুপি বললুম—দেখুন মিস জেন, অত গোলমালে কাজ কি? টিমি আর রটো দুজনেই তো কাবু হ'য়ে পড়েছে। আমি বলি কি—আপনি এই বিল সারেবকে বিয়ে করুন। খাসা লোক

মেম বললেন—রাইটো। আমার একথা এতক্ষণ মনেই পড়ে নি। আই সে বিল, আমার বিয়ে করবে?

বিল বললে—রাদার। কে বলে আমি করব না?...

রাধামাধব! সারেব জাতটা ভারী বেহায়া। বিলকে বাধা দিয়ে বললুম—রোসো সারেব, একুদনি ও সব কেন। আমি হচ্ছি রাইডমাস্টার—কন্যাকর্তা। তোমার কুলশীল আগে জেনে নি, তার পর আমি মত দেব।



‘টোটার সি‘দর অক্ষয় হোক’

বিল বললে—আমার ঠাকুরদা ছিলেন মদুচি। আমার বাপও ছেলেবেলায় জুতো সেলাই করতেন।

আমি বললুম—তাতে কুলমর্ষাদা কমে না। তোমার আয় কত?

বিল একটু হিসেব করে বললে—মিনিটে দশ হাজার, ঘন্টায় ছ লাখ। কিন্তু চিন্তা করবেন না, আমার মাসী মারা গেলে আয় আর একটু বাড়বে। তাঁর পঁচিশটা বড় বড় পুকুর আছে, নোনা জলে ভরতি, তাতে তিমি মাছ কিলবিল করছে।

বললুম—থাক, আর বলতে হবে না, আমি মত দিলুম। এগিয়ে এস, আমি আশীর্বাদ করব, রিয়াল হিন্দু স্টাইল।

কিন্তু ধান-দুগ্ধো কই? জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললুম—এই কুলী, জলদি খোড়া ঘাস ছিঁড়কে লাও, পরসা মিলেগা।

ইংরাজী আশীর্বাদ তো জানি না। বললুম—যদি আপত্তি না থাকে তবে বাংলাতেই বলি।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

সাহেবের মাথায় এক মটো ঘাস দিয়ে বললুম—বেঁচে থাক। ধন তো যথেষ্ট আছে, পুত্রও হবে, লক্ষ্মী এই সপে দিলুম। কিন্তু খবরদার ব্যাটা, বেশী মদ-টদ খেয়ে না, তা হ'লে ব্রহ্মশাপ লাগবে। সাহেব আর একবার আমার হাতে কাঁকুনি দিয়ে নড়া ছিঁড়ে দিলে।

মেমকে বললুম—মা লক্ষ্মী, তোমার ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হ'ক। বীরপ্রসবিনী হ'য়ে কাজ নেই মা—ও আশীর্বাদটা আমাদের অবলাদের জন্যেই তোলা থাক। তুমি আর গরিব কালা-আদমীদের দুঃখের নিমিত্ত হয়ো না,—গুরুত্বপূর্ণ শান্তিশিষ্ট কাচা-বাচ্চা নিয়ে ঘরকন্না কর।

মেম হঠাৎ তার মদুখানা উঁচু করে আমার সেই পাঁচ দিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ির ওপর—

বিনোদবাবু বললেন—‘আ ছি ছি ছি।’

চাট্‌জ্যোমশায় বললেন—‘হু, দেবীকোথুরানীতে ঐ রকম লিখেছে বটে।’

‘আচ্ছা চাট্‌জ্যোমশায়, পাকা লজ্জার আশ্বাদটা কি রকম লাগল?’

‘তাতে ঝাল নেই। আরে, ঐ হ'ল ওদের রেওয়াজ, ঐ রকম ক'রেই ভক্তিপ্রস্ফা আনায়, তাতে লজ্জা পাবার কি আছে।’

চাট্‌জ্যোমশায় বলিতে লাগিলেন—‘তারপর দেখি ঢ্যাঙা আর বেঁটে মদু চুন ক'রে নেমে যাচ্ছে, জন-দুই কুলী তাদের মালপত্র নামাচ্ছে।

গাড়ি ছাড়ল। বিল আর জোন হাত ধরাধরি ক'রে নাচ শুরু ক'রে দিলে। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখতে লাগলুম।

জোন বললে—চ্যাটার্জি, এই আনন্দের দিনে তুমি অমন গ্লান্ন হ'য়ে বসে থেকে না। আমাদের নাচে যোগ দাও।

এললুম—মাদার লক্ষ্মী, আমার কোমরে খাত। নাচতে কবিরাজের বারণ আছে।

—তবে তুমি গান গাও, আমরাই নাচি!

কি আর করা যায়, পড়েছি যবনের হাতে। একটা রামপ্রসাদী ধরলুম।

সমস্ত পথটা এই রকম চলল, অবশেষে মোগলসরাই এল। মেম বললে, কলকাতায় গিয়েই তাদের বিয়ে হবে, আমি যেন তিন দিন পরে গ্রান্ড হোটেলে অতি অবশ্য তাদের সঙ্গে দেখা করি। বিস্তর শেকহ্যান্ড, বিস্তর অনুরোধ, তারপর নেমে কাশীর গাড়ি ধরলুম।... পরদিন আবার কলকাতা যাত্রা।



নাচ শুরু ক'রে দিল

বিনোদবাবু বললেন—‘আচ্ছা চাটুজ্যোমশায়, গিন্নী সব কথা শুনছেন?’

‘কেন শুনবেন না। সতীলক্ষ্মী, তায় পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে। তোমাদের নবীনাদের মতন অবদূর নন যে অভিমানে চোঁচির হবেন। আমি বাড়ি ফিরে এসেই তাঁকে সমস্ত বলেছি।’

‘চাটুজ্যোমশায় শুনেন কি বললেন?’

‘তক্ষুনি একটা উড়ে নাপিত ডেকে বললেন—‘দে তো রে, বড়োর মদুখানা আচ্ছা ক’রে চে’চে, স্নেচ্ছ মাগী উচ্ছান্টি ক’রে দিয়েছে।’ তারপর সেই চুনির আংটিটা কেড়ে নিয়ে গঙ্গাজলে ধুয়ে নিজের আঙুলে পরলেন।’

‘বউভাতের ভোজটা কি রকম খেলেন?’

‘সে দূঃখের কথা আর না-ই শুনলে। গ্রান্ড হোটেলে গিয়ে জানলুম ওরা কেউ নেই। একটা খানসামা বললে—বিয়ের পরদিনই বেটী পালিয়েছে। সায়েব তাকে খুঁজতে গেছে।’



আলিপুরের সংবাদ—সাগর আইল্যান্ডে বায়ুমণ্ডলে যে গর্ত হইয়াছিল সেটা সম্প্রতি পাকারকম ভরাট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আর বৃষ্টি হইবে না। চৌরঙ্গিতে তিনটা সবুজ পোকার অগ্রদূত ধরা পড়িয়াছে। ঘোলা আকাশ ছিঁড়িয়া ক্রমশঃ নীল রং বাহির হইতেছে। রোদ্রে কাঁসার রং ধরিয়াছে, গৃহিণী নিভয়ে লেপ-কাঁথা শুকাইতেছেন। শেষরায়ে একটু ঘনীভূত হইয়া শূইতে হয়। টাকায় এক গন্ডা রোগা-রোগা ফুলকাঁপির বাচ্ছা বিকাইতেছে। পটোল চড়িতেছে, আলু নামিতেছে। স্থলে জলে মরুৎ-ব্যোমে দেহে মনে শরৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সেকালে রাজারা এই সময়ে দিগ্বিজয়ে যাইতেন।

আদালত বন্ধ, আমার গৃহ মজেলহীন। সাকুলার রোডে ধাপা-মলের বার্ষিক পোর্ট করিয়া বাজিল—চমকিত হইয়া দেখিলাম বড় ছেলেটা জিওমেট্রির ত্যাগ করিয়া রেলের টাইম-টেবুল অধ্যয়ন করিতেছে। ছোট ছেলেটার ঘাড়ে এঞ্জিনের ভূত চাপিয়াছে, সে ক্রমাগত দূ-হাতের কনুই ঘুরাইয়া ছুঁচার মতন মদ্য করিয়া বলিতেছে—ঝুক ঝুক ঝুক ঝুক। মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এবার কোথা যাওয়া যায়? দূ-একজন মহাপ্রাণ বন্ধু বলিলেন—পূজার ছুটিতে দেশে যাও, পল্লীসংস্কার কর। কিন্তু অতীব লজ্জার সাহিত স্বীকার করিতেছি যে বহু বহু সংস্কারের ন্যায় এটিও আমার দ্বারা হইবার নয়। জানামি ধর্ম—অন্ততঃ মোটামুটি জানি, কিন্তু ন চ মে প্রবৃত্তি। ভ্রমণের নেশা আমার মাথা বাইয়াছে।

পদব্রজ, গোয়ান, মোটর, নৌকা, জাহাজ—এসব মাঝে মাঝে মদ্য বদলাইবার জন্য মন্দ নয়। কিন্তু যানের রাজা রেলগাড়ি, রেলগাড়ির রাজা ই. আই. আর। বন্ধু বলেন—ইংরেজের জিনিসে তোমার অত উৎসাহ ভাল দেখায় না। আচ্ছা, রেল না-হয় ইংরেজ করিয়াছে কিন্তু খরচটা কে ষোগাইতেছে? আজ না-হয় আমরা ইংরেজকে সাহিংস বাহবা দিতেছি, কিন্তু এমন দিন ছিল যখন সেও আমাদের কীর্তি অবাচ্ হইয়া দেখিত। আবার পাশা উল্টাইবে, দূ-শ বৎসর সবদুর কর। তখন তারায় তারায় মেল চালাইব, ইংরেজ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখিবে, সঙ্গে লইব না,—পায়সা দিলেও না।

বাংলার নদ-নদী, কোপ-ঝাড়, পল্লীকুটারের ঘুংটের সৃষ্টিত ধোঁয়া, পানাপুকুর হঠতে উঠিত জুই ফুলের গন্ধ—এসব আতি স্নিগ্ধ জিনিস। কিন্তু এই দারুণ শরৎকালে মন চায় ধরিহীর বুক বিদীর্ণ করিয়া সগর্জনে ছুটিয়া যাইতে। পঞ্জাব-মেল সন্ সন্ ছুটিতেছে, বড় বড় মাঠ, সারি সারি তালগাছ, ছোট ছোট পাহাড়,

নিমেষে নিমেষে পট-পরিবর্তন। মাঝে মাঝে বিরাম, পান-বিড়ি-সিগ্রেট, চা-গ্রাম, পুরী-কচোড়ি, রোটি-কাবাব, dinner sir at Shikohabad ? তারপর আবার প্রবল বেগ, টেলিগ্রাফের খুঁটি ছুটিয়া পলাইতেছে, দু-পাশে আখের খেত প্রোতের মত বাঁহিয়া বাইতেছে, ছোট ছোট নদী কুন্ডলী পাকাইয়া অদৃশ্য হইতেছে, দু-প্রকাণ্ড প্রান্তর অতিদূরের শ্যামায়মান অরণ্যানীকে ধীরে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ, হঠাৎ জানালা দিয়া এক বলক উগ্রমধুর ছাতিম ফুলের গন্ধ। তার পর সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। ওদিকের বেগে স্থলোদর লালাজী এর মধ্যেই নাক ডাকাইতেছেন। মাথার উপর ফিরিঙ্গীটা বোতল হইতে কি খাইতেছে। এদিকের বেগে দুই কন্বল পাতা, তার উপর আরও দুই কন্বল, তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে ভর-পেট ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রী—তা ছাড়া বেতের বাস্ত্রে আরও অনেক আছে। গাড়ির অঙ্গে অঙ্গে লোহালকড়ে চাকর ঠোকরে জিজিরডান্ডার ঝঞ্জনায় মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিতেছে—আমি চিতপাত হইয়া তান্ডব নাচিতেছি। হম্মীন অস্ত, ওআ হম্মীন অস্ত!

এই পার্শ্বিক পরিকল্পনা—এই অহেতুকী রেলওয়েপ্রীতি—ইহার পশ্চাতে মন-স্তব্ধের কোন্ দৃষ্ট সর্প লুকাইয়া আছে? গিরীন বোসকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। চট্ করিয়া স্থির করিয়া ফেলিলাম—ডালহাউস যাইব, আমার এক পঞ্জাবী বন্ধুর নিমন্ত্রণে। একাই যাইব, গৃহিণীকে একটা মোটা রকম ঘৃষ এবং অজস্র থিয়েটার দেখার অনুমতি দিয়া ঠান্ডা করিয়া রাখিব। কিন্তু man proposes woman disposes।



আমার বড় সন্টকেসটা ঝাড়িতেছি—

আমার বড় স্টুকেসট ঝাড়িতেছি, হঠাৎ বিদ্যুৎজ্বলিত মত ছুটিয়া আসিয়া গৃহিণী বলিলেন—‘হোআট-হোআট-হোআট?’

এইখানে একটা কথা চুপি চুপি বলিয়া রাখি। গৃহিণীর ইংরেজী বিদ্যা ফাস্ট বুক পর্যন্ত। কিন্তু তিনি আমার ফাজিল শ্যালকবৃন্দের কল্যাণে গুটিকতক মৃৎখরোচক ইংরেজী শব্দ শিখিয়াছেন এবং সুযোগ পাইলেই সেগুনি প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

আমি আমতা আমতা করিয়া বলিলাম—‘এই মনে করছি ছুটির ক-দিন একটু পাহাড়ে কাটিয়ে আসি, শরীরটা একটু ইয়ে কিনা।’

গৃহিণী বলিলেন—‘হোআট ইয়ে? হু, একাই যাবার মতলব দেখছি—আমি বৃদ্ধি একটা মস্ত ভারী বোঝা হয়ে পড়েছি? পাহাড়ে গিয়ে তপস্যা হবে নাকি?’

সভয়ে দেখিলাম শ্রীমদ্রু ধুমায়মান, বৃদ্ধিলাম পর্বতো বহিমান্। ধাঁ করিয়া মতলব বদলাইয়া ফেলিয়া বলিলাম—‘রাম বল, একা কখনও তপস্যা হয়? আমি হব না হব না হব না তাপস যদি না মিলে তপস্বিনী।’

মন্ত্রবলে স্মোক নুইসান্স কাটিয়া গেল, গৃহিণী সহাস্যে বলিলেন—‘হোআট পাহাড়?’



‘হোআট-হোআট-হোআট’

আমি। ডালহাউস। অনেক দূর।

গৃহণী। হ্যাং ডালহাউস। দার্জিলিং চল। আমার গ্রিশ ছড়া পাথরের মালা না কিনলেই নয়, আর চার ডজন কাঁটা। আর অত দাম দিয়ে গলায় দেবার শূয়ো-পোকা কেনা হ'ল—সেই যে বোআ না কি বলে—আর হীরে-বসানো চরকা-ব্লোচ—তা তো এ পর্যন্ত পরতেই পেলুম না। তোমার সেই ডালকুত্তো পাহাড়ে সৈসব দেখবে কে? দার্জিলিং-এ বরঞ্চ কত চেনাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হবে। টুর্নি-দিদি, তার ননদ, এরা সব সেখানে আছে। সরোজিনীরা, সুকু-মাসী, এরাও গেছে। মংকি মিস্ত্রের বউ তার তেরোটা এপিজর্গাড়ি ছানাপোনা নিয়ে গেছে।

যুক্তি অকাটা, সুতরাং দার্জিলিং যাওয়াই স্থির হইল।

দার্জিলিং-এ গিয়া দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দশদিক আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরের মধ্যে থাকিতে আরও অনিচ্ছা জন্মে। প্রাতঃকালের আহাৰ সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বুট এবং আগাদমস্তক ম্যাকিন্টশ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি।...জনশূন্য ক্যালকাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম—অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর তো ভাল লাগে না...এমন সময় অনতিদূরে—



নকুড়-মামা

এই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সহিত আশ্চর্য রকম মিল আছে। কিন্তু আমার অদৃষ্ট অনাপ্রকার,—বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। দেখা হইল ডুমুরাওনের মোস্তার নকুড় চৌধুরীর সঙ্গে, যিনি সম্পর্কনির্বিশেষে আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেরই সরকারী মামা।

নকুড়-মামা পথের পার্শ্বস্থিত খাদের ধারে একটা বেণে বসিয়া আছেন। তাঁর মাথায় ছাতা, গলার কম্বল, গায়ে ওভারকোট, চক্ষুতে দ্রুটি, মূখে বিরক্তি। আমাকে দেখিয়া কহিলেন—‘ব্রজেন নাকি?’

বলিলাম—‘আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর, আপনি হঠাৎ দার্জিলিং-এ? বাড়ির সব ভাল তো? কেঁটার খবর কি—বেনারসেই আছে নাকি? কি করছে সে আজকাল?’—কেণ্ট নকুড়-মামার আপন ভাগিনেয়, বেনারসের বিখ্যাত যাদব ডাক্তারের একমাত্র পুত্র, পিতৃমাতৃহীন, বরস চাক্ষুশ-পাঁচশ। সে একটু পাগলাটে লোক, নকুড়-মামাকে বড়-একটা গ্রাহ্যই করে না, তবে আমাকে কিছু খাতির করে।

নকুড়-মামা কহিলেন—‘সব বলছি। তুমি আগে আমার একটা কথার জবাব দাও দিকি। এই দার্জিলিং-এ লোকে আসে কি করতে হয়? ঠান্ডা চাই? কলকাতায় তো আজকাল টাকায় এক মন বরফ মেলে, তারই গোটাকতক টালির ওপর অয়েলকুখ পেতে শুলেই চুকে যায়, সম্ভ্রান্ত শীতভোগ হয়। উঁচু চাই—তা না হ’লে শৌখিন বাবুদের বেড়ানো হয় না? কেন রে বাপু, দু-বেলা তালগাছে চড়লেই তো হয়। যত-সব হতভাগা—।’

এই পৃথিবীটা যখন কাঁচা ছিল তখন বিশ্বকর্মা তাহাকে লইয়া একবার আচ্ছা করিয়া ময়দা-ঠাসা করিয়াছিলেন। তাঁর দশ আঙুলের গট্টার ছাপ এখনও রহিয়া গিয়া স্থানে স্থানে পর্বত উপত্যকা নদী জলধি সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্বকর্মার একটি বিরাট চিমটির ফল এই হিমালয় পর্বত। নাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে,—ভগবানের আশকারা পাইয়া মানুষ হিমালয়ের বৃকে চড়িয়া দার্জিলিং-এ বাসা বাঁধিয়াছে। নকুড়-মামা ধর্মভীরু লোক, অতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না।

আমি বলিলাম—‘কি জানেন নকুড়-মামা, কেণ্ট পাবার ধৈর্য আনন্দ, তাই লোকে আজকাল পয়সা খরচ করে কেনে। অমৃত বোস লিখেছে—

ভাগ্যিস আছিল নদী জগৎ সংসারে

তাই লোকে যেতে পারে পয়সা দিয়ে ওপারে।

দার্জিলিং আছে তাই লোকের পয়সা খরচ করে পাহাড় ডিঙেবার বদখেয়াল হয়েছে। ওঁর এইটুকু আশার কথা—এখানে মাঝে মাঝে খস নাবে।’

সম্রাট হইয়া খাদের কিনারা হইতে সরিয়া রাস্তার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ প্রান্তে আর্মিয়া বলিলেন—‘উচ্ছন্ন যাবে। এটা কি ভদ্র লোকের থাকবার দেশ? যখন-তখন বন্টি, বাসা থেকে বেরুলে তো দশ তলার ধাক্কা, দু-পা হাঁটো আর দম নাও। ওও সিঁড়ি নেই, হোটেল খেলে তো হাড়গোড় চুর্ণ। চললে হাঁপানি, খামলে কাঁপানি—কেন রে বাপু?’

নকুড়-মামা চারিদিকে একবার ভীষণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। সময়টা যদি সত্যি হতো অথবা বাপের যুগ হইত এবং মামা যদি মুন-খাষি বা ভ্রমলোচন হইতেন: তবে এতদূরে সমস্ত দার্জিলিং শহর সাহারা মরুভূমি অথবা ছাইগাদা হইয়া যাইত। আমি গমগাম—‘তবে এলেন কেন?’

নকুড়। আরে এসেছি কি সাথে। কেঁটার স্বভাব জানো তো? লেখাপড়া শিখি, বে-থা কর, বিষয়-আশয় দেখ—রোজগার তো আর করতে হবে না। সে সব নয়। দিনকতক খেয়াল হ’ল, ছবি আঁকিলে। তার পর আমসত্ত্বর কল করে কিছু টাকা ওড়ালে। তার পর কলকাতায় গিয়ে কতকগুলো ছোঁড়ার সর্দার হ’য়ে



একটা সমিতি করলে। তার পর বসে গেল, সেখান থেকে আমাকে এক অর্জেন্ট টেলিগ্রাম। কি হুকুম? না এক্ষুনি দার্জিলিং যাও, মুন-শাইন ভিলায় গুঠ, আমিও যাচ্ছি, বিবাহ করতে চাই। কি করি, বড়লোক ভাগনে, সকল আবদার শুনতে হয়। এসে দেখি—মুন-শাইন ভিলায় নরক গুলজার। বরযাত্রীর দল আগে থেকে এসে বসে আছে। সেই কচি-সংসদ,—কেস্টা যার প্রেসিডেন্ট।

আমি। পাত্রী ঠিক হয়েছে?

নকুড়। আরে কোথায় পাত্রী! এখানে এসে হয়তো একটা লেপচানী কি ভুটানী বিয়ে করবে।

আমি। কচি-সংসদের সদস্যরা কিছ্ জানে না?

নকুড়। কিছ্ না। আর জানলেই বা কি, তাদের কথাবার্তা আমি মোটেই বুঝতে পারি না, সব যেন হেঁয়ালি। তবে তারা খায়-দায় ভাল, আমার সঙ্গে তাদের



এটুকুই সম্ভব। কেষ্টবাবাজী আজ বিকেলে পৌঁছবেন। সম্ভাব্যবেলা যদি এস, তবে সবই টের পাবে, সংসদের সঙেদের সঙেও আলাপ-পরিচয় হবে।

কচি-সংসদের কথা পূর্বে শুনিয়েছি। এদের সেক্রেটারি পেলব রায় আমাদের পাড়ার ছেলে, তার পিতৃদত্ত নাম পেলারাম। বি. এ- পাস করিয়া ছোকরার কচি এবং মোলায়েম হইবার বাসনা হইল। সে গোর্ফ কামাইল, চুল বাড়াইল এবং লেডি-টাইপিস্টের খোঁপার মতন মাথার দূ-পাশ ফাঁপাইয়া দিল। তারপর মদুগার পাঞ্জাবি গরদের চাদর, সবুজ নাগরা ও লাল ফাউন্টেন পেন পরিয়া মধুপুরে গিয়া আশু মধুজ্যেকে ধরিল—ইউনিভার্সিটির খাতাপত্রে পেলারাম রায় কাটিয়া যেন পেলব রায় করা হয়। সার আশুতোষ এক ভলুম এন-সাইক্লোপিডিয়া লইয়া তাড়া করিলেন। পেলারাম পলাইয়া আসিল এবং বি. এ- ডিগ্রীমা বাস্তবে বন্ধ করিয়া নিরুপাধিক পেলব রায় হইল। তারই উদ্যমে কচি-সংসদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তবে যতদূর জানি কেষ্টই সমস্ত খরচপত্র যোগায়। এই কচি-সংসদের উদ্দেশ্য কি আমার ঠিক জানা নাই। শুনিয়েছি এরা যাকে তাকে মেম্বার করে না এবং নতুন মেম্বারের দীক্ষাপ্রণালীও এক ভয়াবহ ব্যাপার। গভীর পূর্ণিমা নিশীথে সমবেত সদস্যমণ্ডলীর করস্পর্শ করিয়া দীক্ষার্থী বোলটি ভীষণ শপথ গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে বোল টিন সিগারেট পোড়ে এবং এনতার চা খরচ হয়।

অনেক বেলা হইয়াছে, মেঘও কাটিয়া গিয়াছে। সম্ম্যার সময় নিশ্চয়ই মুন-শাইন ভিলায় যাইব বলিয়া নকুড়-মামার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

গৃহিণী তিন ছড়া পাঁচ সিকা দামের চুনি-পান্নার মালা উপহৃতপরি গলার পরিয়া বলিলেন—‘দেখ তো, কেমন মানাচ্ছে।’

আমি বলিলাম—‘চমৎকার। যেন পরম্ভী।’

গৃহিণী। তুমি একটি ক্যাড। পরম্ভী না হ'লে বুঝি মনে ধরে না?

আমি। আরে চট কেন। পরকীয়াতত্ত্ব অতি উঁচুদরের জিনিস। তার মহিমা বোঝা যার তার কম নয়, তবে যে নিজের স্ত্রীকে পরম্ভীর মতন নিত্য-নতুন—ধরি ধরি ধরিতে না পারি—দেখে, সে অনেকটা এগিয়েছে। রাধাকৃষ্ণই হচ্ছেন মডেল প্রেমিক। হয়েড বলেছেন—

গৃহিণী। ড্যাম ফরড—অ্যান্ড রাধাকৃষ্ণ মাথায় থাকুন। আমাদের মতন মধুখু লোকের সীতারামই ভাল।

আমি। কিন্তু রাম যে সীতাকে দূ-দূবার পোড়াতে চাইলেন তার কি?

গৃহিণী। সে ত লোকনিন্দের বাধ্য হ'য়ে। দ্রোণাশ্রমের লোকগুলো ছিল কুচুণ্ড রাসকেল।

আমি। তা—তিনি ভারতকে রাজ্য দিয়ে সীতাকে নিয়ে আবার বনে গেলেই পাগতেন।

গৃহিণী। সেই আহ্বাদে প্রজারা যে রামকে ছাড়তে চাইলে না।

আমি। বাঃ, তুমি আমার চাইতে ঢের বড় উকিল। আমি তে.মাকে রামচন্দ্রের তরফ থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু ভাগ্যস তিনি সীতার মতন বউ পেয়েছিলেন তাই

নিম্নতর পেয়ে গেলেন। তোমার পাল্লায় পড়লে অবোধা শহরটাকেই ফাঁস দিতে হ'ত।  
গৃহিণী। কেন, আমি কি শূর্ণনখা না তাড়কা রাক্ষসী?

আমি। সীতা ছিলেন গোবেচারী লক্ষ্মীময়ে। তোমার মতন আবেদনে নয়।

গৃহিণী। সোনার হরিণ কে চেয়েছিল মশায়? কত ওজন তার খেঁজি রাখ? যদি ফাঁপা হয় তবু পাঁচ হাজার ভার।

আমি। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমারই জিত। আর শূনেছ, কেউ যে এখানে বিয়ে করতে আসছে। সেই কাশীর কেউ।

গৃহিণী। হুরে! ভাগ্যিস খানকতক গহনা এনোঁছ। কিন্তু আশ্বিন মাসে লগ্ন কই?

আমি। প্রেমের তেজ থাকলে লগ্নে কি আসে যায়। তবে পাত্রীট কে তা কেউ জানে না। হয়তো এখনও পাত্রীই স্থির হয় নি, যদিও বরষাত্রীর দল হাজির।

গৃহিণী। গ্যাড! শূনেছিলুম কেউটার বাপের ইচ্ছে ছিল টুনি-দিদির ননদের সঙ্গে কেউটার বিয়ে দিতে। সে মেয়ে তো এখানেই আছে, আর বড়-সড়ও হয়েছে। তারও বাপ-মা নেই, তার দাদা—টুনি-দির বর ভুবনবাবু—তিনিই এখন অভিভাবক।

আমি। তা বলতে পারি না। কেউটার মতিগতি বোঝা শিবের অসাধ্য। যাই হ'ক, সন্ধ্যার সময় একবার কেউটার বাসায় যাব।

মনোহারিণী সন্ধ্যা। জনবিরল পথ দিয়া চলিয়াছি। শহরের সর্বত্র—উপরে, আরও উপরে, নীচে, আরও নীচে—স্তরে স্তরে অগণিত দীপমালা ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাস্তার দু-ধারে ঘোপে জগলে পাহাড়ী ঝিঝির অলৌকিক মুছনা ষড়ঙ্গ হইতে নিম্নে লাফাইয়া উঠিতেছে। পরিষ্কার আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, কুয়াশার চিহ্নমাত্র নাই। ঐ মুন-শাইন ভিলা।

কিসের শব্দ? দার্জিলিং শহরে পূর্বে শিয়াল ছিল না। বর্ধমানের মহারাজা যে-কটা আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তারা কি মুন-শাইন ভিলায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে? না, শিয়াল নয়, কাঁচ-সংসদ গান গাইতেছে। গানের কথা ঠিক বোঝা যাইতেছে না, তবে আন্দাজে উপলব্ধি করিলাম, এক অচেনা অজানা অচিন্ত্যনীয় অরক্ষণীয় বিশ্ব-তরুণীর উদ্দেশে কাঁচ-গণ হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন করিতেছে। হা নকুড়-মামা, তোমার কপালে এই ছিল?

আমাকে দেখিয়া সংসদ গান বন্ধ করিল। মামা ও কেউকে দেখিলাম না। কেউ আজ বিকালে পেঁচিয়াছে, কিন্তু কোথায় উঠিয়াছে কেহ জানে না। শীঘ্রই সে মুন-শাইন ভিলায় আসিবে এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পেলব রায় আমাকে খাতির করিয়া বসাইল এবং সংসদের অন্যান্য সভ্যগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল, যথা—

শিহরন সেন  
বিগলিত ব্যানার্জি  
অকিঞ্চৎ কর

## কচি-সংসদ

হুতাশ হালদার

দোদুল দে

লালিমা পাল (পদ)

এদের নাম কি অল্পপ্রাশনলব্ধ না সজ্ঞানে স্বনির্বাচিত? ভাবিলাম জিজ্ঞাস্য করি; কিন্তু চক্ষু লজ্জা বাধা দিল। লালিমা পাল মেয়ে নয়। নাম শুনিলে অনেকে ভুল করে, সেজন্য সে আজকাল নামের পর ‘পদ’ লিখিয়া থাকে।

হঠাৎ দরজা ঠেলিয়া নকুড়-মামা ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁর পিছনে ও কে? এই কি কেণ্ট? আমি একাই চমকিত হই নাই, সমগ্র কচি-সংসদ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। হুতাশ বেচারি নিতান্ত ছেলেমানুষ, সবে সিগারেট খাইতে শিখিয়াছে,—সে আঁতকাইয়া উঠিল।

কেণ্টর আপাদমস্তক বাঙালীর আধুনিক বেশবিন্যাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। তার মাথার চুল কদম্বকেশরের মতন ছাটা, গৌফ নাই কিন্তু ঠোঁটের নীচে ছোট একগোছা দাড়ি আছে, গায়ে সবুজ রঙের খাটো জামা—তাতে বড় বড় সাদা ছিট, কোমরে বেল্ট, মালকোঁচা-মারা বেগুনী রঙের ধুতি, পায়ে পটি ও বুট, হাতে একটি মোটা লাঠি বা কোঁতকা, পিঠে ক্যান্সিসের ন্যাপস্যাক স্ট্রাপ দিয়া বাধা।

আমিই প্রথমে কথা কহিলাম—‘কেণ্ট, একি বিভীষিকা?’

কেণ্ট বলিল—‘প্রথমটা তাই মনে হবে, কিন্তু যখন বুঝিয়ে দেব তখন বলবেন হাঁ কেণ্ট ঠিক করেছে। রঞ্জন-দা, জীবনটা ছেলেখেলা নয়, আর্ট অ্যান্ড এফিশেন্সি।’ আমি। কিন্তু চেহারাটা অমন করলে কেন?

কেণ্ট। শুনুন। মানুষের চুলটা অনাবশ্যক, শীততাপ নিবারণের জন্যে যেটুকু দরকার ঠিক ততটুকু রেখেছি। এই যে দেখছেন দাড়ি, এক বলে ইম্পিরিয়াল এর উদ্দেশ্য নাকটা ব্যালান্স করা। আপনারা সাদা ধূতির ওপর ঘোর রঙের জামা পরেন—অ-ফুল। তাতে চেহারাটা টপ-হেভি দেখায়। আমার পোশাক দেখুন—‘স্লাম ডায়ালেক্ট অ্যান্ড সেজ-গ্রীন, হোয়াইট স্পটস—কলার কনট্রাস্ট অ্যান্ড হারমনি। এইবার পাছাপাড় হাফপ্যান্ট ফরমাল দিয়েছি, তাতে ওয়েস্ট-লাইন আরও ইমপ্রুভ করবে। এই যে দেখছেন লাঠি, এতে বাঘ মারা যায়। এই যে দেখছেন পিঠের ওপর কোঁতকা, এতে পাবেন না এমন জিনিস নেই। আমি স্বেচ্ছাশ্রী, স্বয়ংসিদ্ধ, বেপরোয়া।

এই পর্যন্ত বলিয়া কেণ্ট দুই পকেট হইতে দুই প্রকার সিগারেট বাহির করিল এবং যুগপৎ টানিতে টানিতে বলিল—‘পারেন এ রকম? একটা ভার্জিনিয়া একটা টার্কিশ। মদুখে গিয়ে রেন্ড হচ্ছে।’

নকুড়-মামা চক্ষু মদুয়া অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষবৎ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অভ্যন্তরে বিস্ময় ও ক্রোধ দ্বিধাধিক জ্বলিতেছে।

পেলব রায় বলিল—‘কেণ্টবাবু, আপনি না কচি-সংসদের সভাপতি? আপনি শেষটায় এমন হলেন?’

কেণ্ট। কচি ছিলুম বটে, কিন্তু এখন পাকবার সময় হয়েছে।

আমি। নিশ্চয়ই, নইলে দরকচা মেয়ে যাবে। যাক ওসব কথা,—কেণ্ট, তুমি ন্যাক বে করবে?’

কেণ্ট। সেই পরামর্শ করতেই তো আসা। আপনিও এসেছেন, খুব ভালই হয়েছে। প্রথমে আমি প্রেম সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে চাই।

আমি। নকুড়-মামো, আপনি ওপরে গিয়ে লেপ মর্দি দিয়ে শুয়ে পড়ুন—আর ঠান্ডা লাগবেন না। যা স্থির হয় পরে জানাব এখন। তর পর কেণ্ট, প্রেম কি প্রকার?—একটু চা হ'লে যে হ'ত।

পেলব হাঁকিল—‘বোদা—বোদা—।’ বোদা বলিল—‘জু।’

বোদা কেণ্টর চাকর, নেপালী ক্ষত্রিয়। তাহার মুখ দেখিলেই বোকা যায় যে সে চন্দ্রবংশাবতঃস। পেলব তাহাকে দশ পেয়ালা চা আনিতে বলিল।



এই কি কেণ্ট?

কেণ্ট বলিতে লাগিল—‘প্রেম সম্বন্ধে লোকের অনেক বড় বড় ধারণা আছে। চণ্ডীদাস বলেছেন—নিম্নে দুখ দিয়া একত্র করিয়া এখন কান্দুর প্রেম। রাশিয়ান কবি ভড্কাউইস্কি বলেন—প্রেম একটা নিকুণ্ট নেশা। মোটস্কফ বলেন—প্রেমে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ঘোল আরও উপকারী। মাদাম দে সেইয়া বলেন—প্রেমই নারীর একমাত্র অস্ত্র যার দ্বারা পুরুষের যথাসর্বস্ব কেড়ে নেওয়া যায়। ওমর খায়য়াম লিখেছেন—প্রেম চাঁদের শরবত, কিন্তু তাতে একটু শিরাজী মিশ্রিতে হয়। হেনরি-দি-এইট্‌খ বলেছিলেন—প্রেম অবিনশ্বর, একটি প্রেমপাত্রী বধ করলে পর পর আর দশটি এসে জোটে। জয়েড বলেন—প্রেম হচ্ছে পশু-ধর্মের ওপর সভ্যতার পলেক্সারা। হ্যাডেলক এলিস বলেন—’

আমি। চের হয়েছে। তুমি নিজে কি বল তাই শুনতে চাই।

কেণ্ট। আমি বলি—প্রেম একটা ধাপ্পাবাজি, যার দ্বারা স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে ঠকায়।

কচি-সংসদ একটা অক্ষুট আত্নাদ করিল! হুতাশ বৃকে হাত দিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল—‘ব্যথা, ব্যথা।’

কেণ্ট বলিল—‘হুতো, অমন করছিঁস কেন রে? বেশী সিগারেট খেয়েছিঁস বুঝি? আর খাস নি?’



সমগ্র কচি-সংসদ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল

লালিমা পালের গলা হইতে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ নির্গত হইল—জাপানী ঘড়ি বাজিবার পূর্বে যে-রকম করে সেই প্রকার। তার গলাটা স্বভাবতঃ একটু শ্লেষ্মা-জড়িত। কলিকাতায় থাকিতে সে কোকিলের ডিমের সঙ্গে মকরধ্বজ নাড়িয়া খাইত, কিন্তু এখানে অনুপান অভাবে ঔষধ বন্ধ আছে। কেণ্ট তাহাকে উৎসাহিত করিয়া বলিল—‘নেলো, তোর যদি প্রেম সম্বন্ধে কিছু বলবার থাকে তো বল না।’

লালিমা বলিল—‘আমার মতে প্রেম হচ্ছে একটা—একটা—একটা—’

আমি সজেষ্ট করিলাম—‘ভূমিকম্প।’

কেণ্ট। এগ্‌স্টার্লি। প্রেম একটা ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝাবাত, নায়াগ্রা প্রপাত, আকস্মিক নিপদ—যাতে বৃদ্ধিশৃঙ্খল লোপ পায়।

লালিমা আর একবার বাজিবার উপক্রম করিল, কিন্তু তার প্রতিবাদ নিঃশব্দ জানিয়া অবশেষে নিরস্ত হইল।

আমি বলিলাম—‘তবে তুমি বিয়ে করতে চাও কেন? কত টাকা পাবে হে?’

কেট। এক পরসাত্ত নেব না। আমি বিবাহ করতে চাই জগতকে একটা আদর্শ দেখাবার জন্যে। জগতে দু-রকম বিবাহ চলিত আছে। এক হচ্ছে—আগে বিবাহ তার পরে প্রেম, যেমন সেকলে হিঁদুর। আর এক রকম হচ্ছে—আগে প্রেম, তার পর বিবাহ, অর্থাৎ কোর্টশিপের পর বিবাহ। আমি বলি—দুই ভুল। আগে বিবাহ হ’লে পরে যদি বিনিবনা না হয়, তখন কোথা থেকে প্রেম আসবে? আর—আগে প্রেম, পরে বিবাহ, এও সমান খারাপ, কারণ কোর্টশিপের সময় দু-পক্ষই প্রেমের লোভে নিজের দোষ ঢেকে রাখে। তার পর বিবাহ হ’লে গেলে যখন গলদ বোরিয়ে পড়ে তখন টু লেট।

আমি। ওসব তো পুরনো কথা বলছ। তুমি কি ব্যবস্থা করতে চাও তাই বল!

কেট। আমার সিস্টেম হচ্ছে—প্রেমকে একদম বাদ দিয়ে কোর্টশিপ চালাতে হবে, কারণ প্রেমের গন্ধ থাকলেই লুকেচুরি আসবে। চাই—দু-জন নির্লিপ্ত সু-শিক্ষিত নরনারী, আর একজন বিচক্ষণ ভুক্তভোগী মধ্যস্থ ব্যক্তি—যিনি নানা বিষয়ে উভয় পক্ষের মতামত বেশ করে মিলিয়ে দেখবেন। আমি একটা লিস্ট করেছি। এতে আছে—বেশভূষা, আহাৰ্য, শয্যা, পাঠ্য, কলাচর্চা, বন্ধু-নির্বাচন, অমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি তিরেনস্বইটি অত্যন্ত দরকারী বিষয়, যা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর হরদম মতভেদ হয়ে থাকে। প্রথমেই যদি এইসব মোকাবেলা হ’লে যায় এবং অধিকাংশ বিষয়ে দু-পক্ষের এক মত হয়, আর বাকী অস্পন্দবস্তু বিষয়ে একটা রফা করা চলে, তা হ’লে পরে গোলযোগের ভয় থাকবে না। কিন্তু খবরদার, গোড়াতেই প্রেম এসে না জোটে, তা হ’লেই সব ভণ্ডুল হবে। শেষে যত খুশি প্রেম হ’ক তাতে আপত্তি নেই। এতদিন চলছিল—কোর্টশিপ, আর আমার সিস্টেম হচ্ছে—হাইকোর্টশিপ।

আমি। কোর্ট-মার্শাল বললে আরও ঠিক হয়। সিস্টেম তো বুদ্ধলব্ধ, কিন্তু এমন পাত্রী কে আছে যে তোমার এই এক্সপেরিমেন্টে রাজী হবে? তবে তুমি যে প্রেমের ভয় করছ সেটা মিথ্যা। তোমার ঐ মূর্তি দেখলে প্রেম বাপ বাপ ক’রে পালাবে।

কেট। পাত্রী আমি আজ ঠিক ক’রে এসেছি।

আমি। কে সেই হতভাগিনী?

কেট। ভুবন বোসের ভগ্নী, পশ্চিমবঙ্গ বোস।

আমি। আরে! আমাদের টুনি-দিদির নন্দ? তাই বল। গিন্নী তা হ’লে ঠিক আন্দাজ করেছিলেন। কিন্তু শূন্যলব্ধ তোমাদের বিয়ের কথা নাকি আগেই একবার হয়েছিল। এতে কেস প্রেজুডিস্‌ড হবে না?

কেট। মোটেই না। আমরা দু-পক্ষই নির্বিকার। ব্রজেন-দা, আপনাকেই মধ্যস্থ হ’তে হবে কিন্তু। আপনার লিগাল ম্যাট্রিমনিয়াল দু-রকম অভিজ্ঞতাই আছে, ভাল ক’রে জেরা করতে পারবেন।

আমি। রাজী আছি, কিন্তু মেয়েটা আমার ওপর না চটে।

কেট। কোন ভয় নেই, পক্ষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক।

আমি। লোকটি তো বুদ্ধিমান, কিন্তু মেয়েটি কেমন?

কেস্ট। মজবুত ব'লেই তো বোধ হয়। সাত মাইল হাঁটতে পারে, দু-ঘণ্টা টেনিস খেলতে পারে, মাস্কুলার ইনডেক্স খুব হাই, ফেটিগ-কোরোফিশেন্ট বেশ লো। সেলাই জানে, রান্না জানে, লজিক জানে, বাজে তর্ক করে না, ইকনমিক্স জানে, গান গাইবার সময় বেশী চেঁচায় না। তা হ'লে কাল সন্ধ্যাবেলা ভুবনবাবুর বাড়ি ঠিক যাবেন—লাভলক রোড, মডার্ন কটেজ।

আমি প্রতিশ্রুতি দিয়া গৃহাভিমুখ হইলাম। মুন-শাইন ভিলার গেট পার হইতেই একটা কোলাহল কানে আসিল। আন্দাজে বুঝিলাম কচি-সংসদের রুদ্ধ বেদনা মূর্খারিত হইয়া কেস্টকে গজনা দিতেছে। আমি আর দাঁড়াইলাম না।

সমস্ত শুনিয়া গৃহিণী মত প্রকাশ করিলেন—‘রিপিং! পারসী থিয়েটারের চাইতেও ভাল। আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। যদি পাঁচ টাকা দিয়ে টিকিট কিনতে হয় তাতেও রাজী আছি।’

আমি বলিলাম—‘কিন্তু তোমাকে তো শুনতে দেবে না। হাইকোর্টশিপ গোপনে হয়, ওইটুকুই সাধারণ কোর্টশিপের সঙ্গে মেলে। ঘরে থাকব শুধু আমি, কেস্ট আর পদ্ম।’

গৃহিণী। আতি পাতব।

আমি। তার দরকার হবে না। সব কথাই পরে শুনতে পাবে। আমার যে কান তাহা তোমার হউক।

গৃহিণী। যাই হ'ক আমিও যাব।

আমি। কিন্তু পরের ব্যাপারে তোমার ওরকম কৌরুল তো ভাল নয়। ফ্রেড এর কি ব্যাখ্যা করেন জান?

গৃহিণী। খবদার, ও মুখপোড়ার নাম ক'রো না বলছি।

অগত্যা দুজনেই টুনি-দিদির বাসায় চলিলাম।

ভুবনবাবু ও টুনি-দিদি—এ'রা যেন সাংবাদ্যশ্রমের পুরুষ-প্রকৃতি। কতটি কুড়ির সন্ন্যাসী, সমস্তকণ ড্রেসিং গাউন পরিয়া ইঞ্জিচেরারে বাসিয়া বই পড়েন ও চুরটে ফোঁকেন। গিলাটি ঠিক উল্টা, অসীমশক্তিময়ী, অঘটনঘটনপট্যসী, মাছ-কোটা হইতে গাড়ি রিজার্ভ করা পর্যন্ত সব কাজ নিজেই করিয়া থাকেন, কথা কহিবার ফুরসত নাই। তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা শেষ করিয়াই অতিথিসংস্কারের বিপুল অয়োজন করিতে রান্নাঘরে ছুটিলেন। পদ্ম আসিয়া প্রণাম করিল।

খাসা ফ্রেয়ে। কেস্টা হতভাগা বলে কিনা মজবুত! এ'কি হাতুড়ি না হামান-দিশ্রা? কচি-সংসদের মধ্যে বাস্তবিক যদি কেউ নিরেট কচি থাকে, তবে সে কেস্ট - যতই প্রেমের বকৃতা দিক। ঘম্মাশৃঙ্গের একটা শিং ছিল, কেস্টের দুটো শিং। কিন্তু এট সূত্রী বুদ্ধিমতী সপ্রতিভ মেয়েটি কেন এই গর্দভের খেয়ালে রাজী হইল? শ্রীজাতি বান্দর-নাচ দেখিতে ভালবাসে। পদ্মর উদ্দেশ্য কি শুধু তাই? শ্রীচরিত্র গোমা শস্ত। না; মনস্তত্ত্বের বইগুলো ভাল করিয়া পড়িতে হইবে।

হাইকোর্টশিপ আরম্ভ হইল। ঘরের পর্দা ভেদ করিয়া সমুদ্র রান্নাঘর হইতে



টুনি-দিদি ও আমার গৃহিণীর উচ্চ হাসি এবং কার্টলেট-ভাজার গম্বু আসিতেছে।  
আমি যথাসাধ্য গাম্ভীর্য সঞ্চয় করিয়া শূভকার্য আরম্ভ করিলুম—

‘এই মকদ্দমায় বাদী, প্রতিবাদী, অনুবাদী, সংবাদী, বিসংবাদী কে কে তা এখনও স্থির হয় নি। কিন্তু সেজন্য বিচার আটকাবে না, কারণ দুই সাক্ষী হাজির,—শ্রীমান্ কেপ্ট ও শ্রীমতী পদ্ম—’

কেপ্ট বালিল—‘রঞ্জন-দা, আপনি এই গুরু বিষয় নিয়ে আর তামাশা করবেন না—কাজ শুরুর করুন।’

আমি। বাস্তব হও কেন—, আগে যথারীতি সত্যপাঠ করাই।—শ্রীমান্ কেপ্ট, তুমি শপথ ক’রে বল যে তোমার মধ্যে পূর্বরাগের কোন কমপ্লেক্স নেই। যদি থাকে তবে মকদ্দমা এখনই ডিসমিস হবে।

কেপ্ট। একদম নেই। পদ্ম যখন পাঁচ বছরের আর আমি যখন দশ বছরের, তখন ওকে যে-রকম দেখতুম এখনও ঠিত তাই দেখি। তবে আগে ওকে ঠেঙাতুম, এখন আর ঠেঙাই না।

আমি। শ্রীমতী পদ্ম, কেপ্টের প্রতি তোমার মনোভাব কি রকম তা জিজ্ঞেস ক’রে তোমার অপমান করতে চাই না। কেপ্টের মতিই হচ্ছে পূর্বরাগের অ্যান্টি-ডোট। কেপ্ট এইবার তোমার সেই ফিরিস্তিটা দাও। বাপ! তিরেনস্‌বইটা আইটেম! বেশভূষা—আহার—শয্যা—পাঠ্য—এ তো দেখছি পাক্সা পনের দিন লাগবে। দেখ, আজ বরষ আমি গোটা কতক বাছা বাছা প্রশ্ন করি, যদি অবস্থা আশাজনক বোধ হয় তবে কাল থেকে সিস্টেম্যাটিক টেস্ট শুরুর হবে। আচ্ছা, প্রথমে আহাৰ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি—কারণ ওইটেই সবচেয়ে দরকারী, ফ্রয়েড যা-ই বলুন। কেপ্ট তুমি লক্ষ্য খাও?

কেপ্ট। বাল আমার মোটেই সহ্য হয় না।

আমি। পদ্ম কি বল?

পদ্ম। লক্ষ্য না হ’লে আমি খেতেই পারি না।

আমি। ব্যাড। প্রথমেই ঢেরা পড়ল। স্বামী-স্ত্রীর তো ভিন্ন হে’শেল হ’তে পারে না। রফা করা চলে কিনা পরে স্থির করা যাবে। জলে লক্ষ্য সেন্থ ক’রে দুজনকে খাইয়ে দেখে এমন একটা পাসে’টেজ ঠিক করতে হবে যা দু-পক্ষেরই বরদাস্ত হয়। আচ্ছা—তোমরা চায়ে কে ক চামচ চিনি খাও?

কেপ্ট। এক।

পদ্ম। সাত।

আমি। ভেরি ব্যাড। আবার ঢেরা পড়ল।

কেপ্ট। আমি মেরে কেটে তিন চামচ অবধি উঠতে পারি। পদ্ম, তুমি একটু নাঝো না।

আমি। খবরদার, সাক্ষী ভাঙবার চেষ্টা ক’রো না। যা জিজ্ঞাসা করবার আমিই করব। আচ্ছা—কেপ্ট, তুমি কি-রকম বিছানা পছন্দ কর? নরম না শক্ত?

কেপ্ট। একটু শক্ত রকম, ধরুন দু-ইঞ্চি গদি। বেশী নরম হ’লে আমার ঘুমই হয় না।

পদ্ম। আমি চাই তুলতুলে।

আমি। ভেরি ভেরি ব্যাড। এই ফের ঢেরা দিলুম। আচ্ছা—কেপ্ট, পদ্মর চেহারাটা তোমার কি-রকম পছন্দ হয়?

কেষ্ট। তা মন্দ কি।

আমি সাক্ষীবিহীনকারী ধমক দিয়া বলিলাম—‘ওসব ভাসা ভাসা জবাব চলবে না, ভাল ক’রে দেখ তার পর বল।’

পদ্ম লাল হইল। কেষ্ট অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া একটু বোকা-হাসি হাসিয়া বলিল—‘খাখ্-খাসা চেহারা। এঃ, পদ্ম আর সে পদ্ম নেই, এক্কেবারে—’

আমি। বস্ বস্—বাজে কথা ব’লো না। পদ্ম, এবারে তুমি কেষ্টকে দেখে বল।

পদ্ম ভ্রুকুণ্ঠিত করিয়া কেষ্টের প্রতি চকিত দৃষ্টি হানিয়া বলিল—‘যেন একটি সঙ !’

কেষ্ট। তা—তা আমি না-হয় মাথার চুলটা এক ইঞ্চি বাড়িয়ে ফেলব, আর দাড়িটাও না-হয় ফেলে দেব। আচ্ছা, এই হাত দিয়ে দাড়িটা চেপে রাখলাম—এইবার দেখ তো পদ্ম।

পদ্ম হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।



‘এইবার দেখতো’

আমি বলিলাম—‘হোপলেস। আপত্তির প্রতিকার হ’তে পারে, কিন্তু বিদ্বেষের ওষুধ নেই।’

কেষ্ট একটু গরম হইয়া বলিল—‘আপনিই তো যা-তা রিমার্ক ক’রে সব গদলিয়ে দিচ্ছেন।’

আমি। আচ্ছা বাপু, তুমি নিজেই না-হয় জেরা কর।

কেষ্ট প্রত্যালীড়পদে বসিয়া আস্তিত গদুটাইয়া বলিল—‘পদ্ম, এই দেখ আমার হাত। একে বলে বইসেম্প—এই দেখ ট্রাইসেম্প। এইরকম জবরদস্ত গড়ন তোমার পছন্দ হয়, না ব্রজেন-দার মতন গোলগাল নাদুস-নুদুস চাও? তোমার মতামত জানতে পারলে আমি না-হয় আমার আদর্শ সম্বন্ধে ফের বিবেচনা করব।’

পদ্ম। তোমার চেহারা তুমি বুঝবে—আমার তাতে কি। আমি তো আর তোমার দণ্ডায়ান রাখছি না।

কেষ্ট। আচ্ছা, তোমার হাতটা দেখি একবার—কি রকম পাজার জোর—

কেণ্ট খপ করিয়া পশ্মর পশ্মহস্ত ধরিল। আমি বলিলাম—‘হাঁ হাঁ—ও কি! সাক্ষীর ওপর হামলা! ওসব চলবে না—আমার ওপর যখন বিচারের ভার তখন যা করবার আমিই করব! তুমি ওই ওখানে গিয়ে বস!’

কেণ্ট অপ্রতিভ হইয়া বলিল—‘বেশ তো, আপনিই ফের কোশচেন করুন।’

আমি। আর দরকার নেই। তোমাদের মোটেই মতে মিলবে না, রফা করাও চলবে না। আমি এই হুকুম লিখলুম—napoo, nothing doing। কেস এখন মূলতবী রইল। এক বৎসর নিজের নিজের মতামত বেশ করে রিভাইজ কর, তার পর আবার অত্র আদালতে হাজির হইবা।

কেণ্ট এবার চটিয়া উঠিল। বলিল—‘আপনি আমার সিস্টেম কিছু বুঝতে পারেন নি। আপনি যা করলেন সে কি একটা টেস্ট হ’ল?—শুদ্ধ ইয়রকি। আপনাকে মধ্যস্থত মানাই বকমারি হয়েছে।’

আমিও থাপ্পা হইয়া বলিলাম—‘দেখ কেণ্ট, বেশী চালাকি ক’রো না। আমি একজন ঝিকল, বার বৎসর প্র্যাকটিস করেছি, পনের বৎসর হ’ল বিবাহ করেছি, ঝাড়া একটি মাস সাইকলজি পড়েছি। কার সঙ্গে কার মতে মেলে তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আর—তুমি তো নির্বিকার, তোমার অত রাগ কেন? দেখ দিকি, পশ্ম কেমন লক্ষ্মীমেয়ে, চুপটি ক’রে বসে আছে।’

কেণ্ট গজগজ করিতে লাগিল। এই সময় হঠাৎ ঘরের পর্দা ঠেলিয়া টুনি দ্বিদির ছোট খুকী প্রবেশ করিল।

আমি গম্ভীর স্বরে বলিলাম—‘নারী, তুমি কি চাও?’

খুকীর নারীত্বের দাবি অতি মহৎ এবং সমস্ত নারীসমাজের অনুধাবনযোগ্য। বলিল—‘খাবেন চলুন, লুচি জুড়িয়ে যাচ্ছে।’

কেণ্ট কাহারও সহিত আর বাক্যালাপ করিল না, ভাল করিয়া খাইলও না। আহরান্তে আমি একাই নিজের বাসায় ফিরিলাম। গৃহিণী আজ এখনেই রাত্রি শাপন করিবেন।

পূর্নদিন বেলা দশটার সময় গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া আপাদমস্তক মূড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। সভয়ে দেখিলাম তিনি কম্বলের ভিতরে ক্ষণে ক্ষণে নড়িয়া উঠিতেছেন এবং অস্ফুট শব্দ করিতেছেন।

বলিলাম—‘ফিক বাধাটা আবার ধরেছে বুঝি? ডাক্তার দাসকে ডাকব?’

গৃহিণী অতি কণ্ঠে বলিলেন—‘না, কিছু দরকার নেই, ও আপনিই সেরে যাবে। হঃ হঃ হিঃ।’

হিস্টিরিয়া নাকি? ও উৎপাত তো ছিল না, নিশ্চয় বেচারি কল্যাকার ব্যাপারে গ্নঃক্ষ্ম হইয়াছে। আমার মতলব তো জানে না। মেয়েরা চায় রাতারাতি বিবাহটা স্থির হইয়া যাক। আরে অত বাস্ত হইলে কি চলে! কেণ্ট সবে ব’ড়শি গিলিয়াছে, এখন তাকে আরও দিনকতক খেলাইতে হইবে।

বৈকালে মুন-শাইন ভিলায় বাইলাম—উদ্দেশ্য কেণ্টকে একটু ঠান্ডা করা। কিন্তু কেণ্টর দেখা পাইলাম না, মমাও নাই। কচি-সংসদের সভাগণ নিজ নিজ খাতে শুইয়া আছে, ডাকিলে সাড়া দিল না। তাহাদের দৃষ্টি উদাস,—নিশ্চয় একটা বড়-রকম ব্যথা পাইয়াছে।

বোদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—‘বাবু কাঁহা?’  
বোদার বদনচক্রে দর্শন, নিঃশ্বাস ও বাক্যনিঃসরণের জন্য যে কয়টি ছোট ছোট  
ছিদ্র আছে তাহা বিস্ফারিত হইল। বলিল—‘বাবু বাগা।’  
আঁ? কেঁটবাবু ভাগা! কাঁহা ভাগা? নিশ্চয় ভুবনবাবুর বাড়িতে গিয়া হোগা।



‘বাবু বাগ গিয়া’

‘ভুবনবাবু বাগ গিয়া! উর্নাক বিবি বাগ গিয়া। উর্নাক কোকী বাগ গিয়া।  
কোকীকা গোড়া বাগ গিয়া। গোরে-স মিসিবাবা যো থি সো বি বাগ গিয়া।’  
কেঁট পালাইয়াছে। ভুবনবাবু, তাঁহার বিবি, তাঁহার খুকী, খুকীর বোড়া এবং  
ফরসা-মতন মিসিবাবা—অর্থাৎ পদ্ম—সকলেই পালাইয়াছে। নকুড়-মামা বোধ হয়  
খোঁজে বাহির হইয়াছেন। কাঁচ-সংসদ কিছুই জানে না, জিজ্ঞাসা করা বৃথা।

গৃহিণীর কান্ড মনে পড়িল। লক্ষ্যক ব্যথাও নয় হিষ্টিরিয়াও নয়—শুধু হাসি  
চাপিবাব চেষ্টা। তৎক্ষণাৎ বাসায় ফিরিলাম।

বলিলাম—‘তুমিই যত নষ্টের গোড়া।’

গৃহিণী। ‘আহ, কি আমার কাজের লোক! নিজে কিছুই করতে পারসেন  
না, এখন আমার দোষ।’

আমি। তার পর ব্যাপারটা কি বল দিকি ?

গৃহিণী প্রথমে একটোট হাসিয়া গড়ইয়া লইলেন। শেষে বলিলেন—‘তুমি তো রাত সাড়ে দশটায় ফিরে গেলে। টুনি-দিদি আর আমি গল্প করতে লাগলুম—সে কত সুখ-দুঃখের কথা। রাত বারটার সময় দেখি—কেষ্ট টিপিটিপি আসছে। তার মুখ কাঁদো-কাঁদো, চাউনি পাগলের মতন। টুনি-দি বললে—কেষ্ট, কি হয়েছে ? কেষ্ট বললে, পশুর সঙ্গে বে না হ’লে সে আর এ প্রাণ রাখবে না, তার আর তর মইছে না, হয় পশু—নয় কি একটা অ্যাসিড। আমি বললুম—তার আর চিন্তা কি, অ্যাসিড ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়, আর পশু তো মজুতই আছে। আগে সকাল হ’ক তারপর যা-হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। কেষ্ট বললে—সে একটুনি তার সঙের সাজ ফেলে দিয়ে ভন্দর লোক সাজবে, কিন্তু অত লাফালাফির পর পাঁচ জনের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে ? টুনি-দি বললে—কুছ পরোয়া নেই, কালকের মেলেই কলকাতায় পাঠিয়ে চল, গিয়েই বে দেব। পশু বিগড়ে বসল। টুনি-দি বললে নে. নেঃ—নেকী। টুনি-দিকে জান তো, তার অসাম্য কাজ নেই। সেই রাত্রেই মশাই মোট বাঁধা হ’য়ে গেল—এক-শ তেরটিটা লাগেজ। তারপর আজ সকালে তাদের টেনে তুলে দিয়ে এখনে চ’লে এলুম।’

বিবাহের পর দেড় মাস কেষ্ট আমার সঙ্গে লজ্জায় দেখা করে নাই—সবে কাল আসিয়া ক্ষমা চাহিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে সর্বান্তঃকরণে মার্জনা করিয়াছি এবং মনস্তত্ত্ব হইতে নিজের দেখাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে তাহার লজ্জিত হইবার কোনও কারণ নাই। কেষ্টের মনের আড়ালে যে আর একটা উপদ্রব এতদিন ছাই-চাপা ছিল তাহারই ভূমিকম্পের ফলে সে বাঁদর নাচিয়াছে।

কচি-সংসদ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। কেষ্ট আবার একটা নূতন ক্লাব স্থাপন করিয়াছে—হৈহয় সংঘ। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হৈহয় ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহার মেম্বার—সম্প্রদায়িক আমি ও কেষ্ট। এই বড়দিনের বন্ধে আমরা হাওড়া হইতে পেশাওআর পর্যন্ত হইহই করিতে যাইব।





রিচমন্ড বঙ্গ-ইঙ্গীয় পাঠশালা। মিস্টার ক্রাম (পণ্ডিত মহাশয়)

এবং ডিক টম হ্যারি প্রভৃতি বালকগণ

ক্রাম। চটপট নাও, চারটে বাজে। ডিক, ইতিহাসের শেষটুকু পড়ে ফেল।

ডিক। 'ইওরোপের দুঃখের দিন অবসান হইয়াছে। জাতিতে জাতিতে ঘেঁষা হিংসা বিবাদ দূর হইয়াছে। প্রবলপরাক্রান্ত ভারত-সরকারের দৌর্দশাসনের সূশীতল ছায়ায়'—দৌর্দশ মান্নে কি পণ্ডিত মহাশয়?

ক্রাম। দৌর্দশ জান না? The big rod. Under the soothing influence of the big rod.

ডিক। 'সূশীতল ছায়ায় আগ্রয়লাভ করিয়া সমস্ত ইওরোপ ধনা হইয়াছে। আয়ার-ল্যান্ড হইতে রাশিয়া, ল্যাপল্যান্ড হইতে সিসিলি, সর্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। ফ্রান্স এখন আর জার্মানির গলা কাটিতে চায় না, ইংলন্ড আর জাতিতে জাতিতে বিবাদ বাধাইতে পারে না, অস্ট্রিয়া ও ইটালিতে আর মেতিপুকুরের দখল লইয়া মারামারি করে না।' মেতিপুকুর কোনটা পণ্ডিতমহাশয়?

ক্রাম। ঐ সামনে মানচিত্র রয়েছে দেখ না। ইটালির কাছে যে সমুদ্র সেইটে। একালে নাম ছিল মেডিটের্রেনিয়ান। ইন্ডিয়ানরা উচ্চারণ করিতে পারে না বলে নাম দিয়েছে মেতিপুকুর। সেইরকম আলস্টারকে বলে বেলেন্স্টারা, সুইটসারল্যান্ডকে বলে ছুয়রাবাদ, বোর্দোকে বলে ভাঁটিখানা, ম্যাগেণ্টারকে বলে নিম্ভে। তার পর পড়ে যাও।

ডিক। 'ইওরোপীয়গণের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হইতেছে। তাহাদের লোভ কমিয়াছে, অসভ্য বিলাসিতা দূর হইতেছে, ইহকালের উপর আস্থা কমিয়া গিয়াছে, পরকালের উপর নির্ভরতা বাড়িতেছে। ভারত-সন্তানগণ সাত-সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এই পাণ্ডববর্জিতদেশে আসিয়া নিঃস্বার্থভাবে শান্তি শৃঙ্খলা ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।' আচ্ছা পণ্ডিতমহাশয়, এসব কি সত্য?

ক্রাম। ছাপার অক্ষরে যখন লিখেছে আর সরকারের হুকুমে যখন পড়াতে হচ্ছে তখন সত্য বইকি।

ডিক। কিন্তু বাবা বলেন সব bosh।

ক্রাম। তোমার বাবার আর বলতে বাধা কি। তিনি হলেন উকিল, আমার মতন তো আর সরকারের মাইনেয় নির্ভর করতে হয় না।

ডিক। 'হে সুবোধ ইংরেজীশব্দগণ, তোমরা সর্বদা মনে রাখিও যে ভারত সরকার তোমাদের দেশের অশেষ উপকার করিয়াছেন। তোমরা বড় হইয়া যাহাতে শান্ত বাধ্য রাজভক্ত প্রজা হইতে পার তাহার জন্য এখন হইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাও।'

টম। ব্দ—হু হু হু—

ক্র্যাম। ও কি রে, শীত করছে বুঝি? আবার তুই ধূতি-পাঞ্জাবি প'রে এসে-ছিস! বাঙালীর নকল করতে গিয়ে শেষে দেখছি নিউমোনিয়ায় মরবি।

টম। বাবার হুকুম পান্ডিত মশায়। আজ পাঠশালার ফেরত খাঁসাহেব গবসন টোড়ির পার্টিতে যেতে হবে। তিনি নতুন খেতাব পেয়েছেন কিনা। সেখানে বিস্তর ইন্ডিয়ান চন্দ্রলোক আসবেন, তাই বাবা বললেন, দেশী পোশাক পরা চলবে না।

ক্র্যাম। তা বাঙালী সাজতে গেলি কেন? ইজের-চাপকান পরলেই পারতিস।

টম। আজ্ঞে, বাবা বললেন, বাঙালীই সবচেয়ে সভ্য তাই—ব্র, ব্র, ব্র—

ক্র্যাম। যা যা শীগগির বাড়ি যা, অন্তত একটা শাল মুড়ি দিগে যা। ও কি, হোঁচট খেলি নাকি?

হ্যারি। দেখুন দেখুন, টম কি রকম কাছা দিয়েছে, যেন স্কিপিং রোপ!

ধর্মযাজকগণের মুখপত্র 'দি কিংডম কাম'

হইতে উদ্ধৃত।

সর্বনাশের আয়োজন হইতেছে। ভারতসরকার আমাদের ধনপ্রাণ হস্তগত করিয়াছেন—আমরা নিরীহ ধর্মযাজক-সম্প্রদায় তাহাতে কোনও উচ্চবাচ্য করি নাই, কারণ ইহলোকের পাউরুটি ও মাছের উপর আমাদের লোভ নাই এবং সীজারের প্রাপ্য সীজারকে দেওয়াই শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু আজ এ কি শুনিতোছি? আমাদের ধর্মের উপর হস্তারোপ! ঘোড়দোড় বন্ধ করার জন্য আইন হইতেছে। অ্যাসকট, এপসম প্রভৃতি মহাতীর্থ কি শেষে শ্মশানে পরিণত হইবে? বিশপ স্টোনিব্রোক নাকি গভর্নমেন্টকে জানাইয়াছেন যে ধর্মশাস্ত্রে ঘোড়দোড়ের উল্লেখ নাই, অতএব রেস বন্ধ করিলে খ্রীষ্টীয় ধর্মের হানি হইবে না। হা, একজন ধর্মযাজকের মুখে এই কথা শুনিতে হইল! বিশপ কি জানেন না যে, রেস খেলা ব্রিটিশ-জাতির সনাতন ধর্ম এবং লোকাচার বাইবেলেরও উপর? আরও ভয়ানক সংবাদ—শীঘ্রই নাকি মদ্যপান রোধ করার উদ্দেশ্যে আইন হইবে। আমাদের শাস্ত্রসম্মত সনাতন পানীয় বন্ধ করিয়া ভারতসরকার কি ভারতীয় চায়ের কাটতি বাড়াইতে চান?

'রান্ধ্রবিং'—যাহার সঙ্গে সংযুক্ত আছে 'ইঙ্গবন্দ'

হইতে উদ্ধৃত

আমরা খাঁসাহেব গবসন টোডিকে সাদরে অভিনন্দন করিতোছি। তিনি অতি উপযুক্ত ব্যক্তি, তাহাকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত দেখিয়া আমরা প্রকৃতই আনন্দিত হইয়াছি। দেশী লোকের ভাগ্যে এত বড় উপাধি এই প্রথম মিলিল। আমরা কিন্তু সরকারকে সাবধান করিতোছি—এই সকল উচ্চ উপাধি যেন বেশী সন্তা করা না হয়, তাহা হইলে ভারতীয় রায়সাহেব খাঁবাহাদুর প্রভৃতি ক্ষুব্ধ হইবেন এবং তাহাতে ইংরোপের উন্নতি পিছাইয়া যাইবে। নাইট, ব্যারন, মার্কুইস, ডিউক প্রভৃতি দেশী উপাধিই সাহেবদের পক্ষে যথেষ্ট। যাহা হউক, মিস্টার টোডি যখন নিতান্তই খাঁসাহেব টোডি হইয়া

গিয়াছেন, তখন তাঁহার অতি সন্তপণে সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া চলা উচিত। আশা করি, তিনি রাজদ্রোহী লিবার্টি-লীগের ছায়া মাড়াইবেন না।

গবসন টোডির অন্তরমহল। মিসেস টোডি, তাঁহার দুই কন্যা  
ফ্রিফ ও ফ্ল্যাপি এবং তাহাদের শিক্ষয়িত্রী জোছনা-দি

জোছনা। ফ্ল্যাপি, তোমায় নিয়ে আর পেরে উঠি নে বাছা। ওই রকম করে  
দুধি চুল বাঁধে? আহা কি ছিরিই হয়েছে! কান দুটো যে সবটাই বোরের রয়েছে।  
এতখানি বয়স হ'ল কিছুই শিখলে না। দেখ দিকি, তোমার দিদি কি সুন্দর খোঁপা  
বেঁধেছে!

ফ্ল্যাপি। Let her। কানের ওপর চুল পড়লে আমি কিছু শুনতে পাই না।  
আমি ঘাড় ছাঁটবো, ও-বাড়ির মিস ল্যাংকি গসলিং-এর মতন।

জোছনা। হ্যাঁ ঘাড় ছাঁটবে, নাড়া হবে, ভুরু কামাবে, রূপ একেবারে উথলে  
উঠবে। দেখাবে যেন হাড়গিলেটি। পড়তে শাস্ত্রীর পাল্লায়—  
ফ্ল্যাপি।

Little Pussy Friskers  
Shaved off her whiskers ;  
And sharpening her paw  
Scratched her mum-in-law.

জোছনা। কি বেহায়া মেয়ে। মিসেস টোডি, আপনার ছোট মেয়েকে দরাস্ত  
করা আমার সাধ্য নয়।

মিসেস টোডি। ছি ফ্ল্যাপি, তুমি দিন দিন ভারী বেয়াড়া হচ্ছে। জোছনা-দি  
তোমাদের শিক্ষার জন্য কত মেহনত করেন তা বোঝ?

ফ্ল্যাপি। আমি শিখতে চাই না। উনি ফ্রিফকে শেখান না।

জোছনা। আবার 'ফ্রিফ'! দিদি বলতে কি হয়? আঁ ও কি—ফের তুমি  
পেনসিল চুষছ! ছি ছি, কি নোংরা! আচ্ছা, এখন তুমি ও-ঘরে গিয়ে সেই উদ্দ  
গজলটা অভ্যাস কর।

মিসেস টোডি। জোছনা-দি, আপনার ডিবে থেকে একটা পান নেব? থ্যাংক ইউ।

জোছনা। দেখুন মিসেস টোডি, কথায় কথায় থ্যাংক ইউ—প্লীজ—সরি এগুলো  
বলবেন না। ভারী বদ অভ্যাস এর জন্যেই আপনাদের জাতের উন্নতি হচ্ছে না।  
একম তুচ্ছ কারণে কৃতজ্ঞতা বা দ্বেষ জানানো আমরা ভণ্ডামি ব'লে মনে করি।  
নিম্ন একটু দোস্তা খান।

মিসেস টোডি। নো, থ্যাংক্‌স্,—থুড্। দোস্তা খেলেই আমার মাথা ঘোরে।  
এগে একটা সিগারেট খাই।

জোছনা। মেয়েদের সিগারেট খাওয়া অত্যন্ত খারাপ। আপনি একটু চেষ্টা  
ক'রে দোস্তা ধরুন।

মিসেস টোডি। কিন্তু দু-ই তো হল তামাক?

জোছনা। তা বললে কি হয়। একটা হ'ল ধোঁয়া আর একটা হ'ল ছিবড়ে।  
দোস্তা পুরুষের জন্যে, আর ছিবড়ে মেয়েদের জন্যে। ফ্রিফ, তোমার সেই বাংলা  
উপন্যাসখানা শেষ হয়েছে?



ফ্রিফ। বড় শক্ত, মোটেই বুঝতে পারছি না।

জোছনা। বোঝবার বিশেষ দরকার নেই, কেবল বাছা বাছা জায়গা মন্থন করে ফেলবে। লোককে জানানো চাই যে বাংলা ভাল ভাল বইয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে। কিন্তু তোমার উচ্চারণটা বড় খারাপ। সভাসমাজে মিশতে গেলে চোমত বাংলা উচ্চারণ আগে দরকার, আর গোটাকতক উদ্‌ গান। আচ্ছা, তুমি বাংলায় এক দুই তিন চার বলে যাও দিকি।

ফ্রিফ। এক দুই তিন শাড়—

জোছনা। শাড় নয়, চার।

ফ্রিফ। চার পাইচ—

জোছনা। পাইচ নয়, পাঁচ।

ফ্রিফ। পাইশ—

জোছনা। পাঁ—চ।

ফ্রিফ। ফ্যাঁচ—

জোছনা। মাটি করলে। মিসেস টোডি, ফ্রিফকে বেশী চাকোলেট খেতে দেবেন না, ছেলাভাজার ব্যবস্থা করুন, নইলে জিবের জড়তা ভাঙবে না। দেখ ফ্রিফ, আর এক কাজ কর। বার বার আওড়াও দিকি—রিশড়ের আড়পার খড়দার ডান ধার—ছাঁদন, তলায় হোঁতকা হোঁদল।

নেপথ্যে গবসন টোডি। ডিয়ারি—

মিসেস টোডি। কু! কোথায় তুমি?

গবসন টোডি। বাথরুমে। আরও গোটাকতক আম দিয়ে যাও।

জোছনা। বাথরুমে অম?

মিসেস টোডি। তা ভিন্ন আর উপায় কি। গবি বলে, আম যদি খেতে হয় তবে ভারতীয় পদ্ধতিতেই খাওয়া উচিত। অথচ আপনাদের মতন হাত দূরস্ত নয়—পোশাক কাপেট টেবিল-রুখে রস ফেলে একাকার করে। তাই গবিকে বলেছি বাথরুমে গিয়ে আম খাওয়া অভ্যাস করতে। সেখানে দু-হাতে আঁটি ধরে চুষছে আর চোয়াল দিয়ে রস গড়াচ্ছে। Horrid!

জোছনা। ঠিক ব্যবস্থাই করেছেন। দেখুন মিসেস টোডি, আপনি যে স্বামীকে 'গবি' বলছেন, ওটা সভ্যতার বিরুদ্ধে। আড়ালে গবি হাবি যা খুঁশি বলুন, কিন্তু অপরের কাছে নাম করবেন না। দরকার হ'লে বলবেন—'উনি'। আর যদি অতটা খ্যাতির না করতে চান, তবে বলবেন—'ও'।

মিসেস টোডি। তাই ন্যাক? আচ্ছা, আপনি রসুন একটু। আমি ওকে আম দিয়ে আসছি।

'রাষ্ট্রবিং'-এর বিজ্ঞাপনসম্বন্ধ হইতে।

বিশুদ্ধ আনন্দনাড়ু। চরিত্রমিশ্রিত ইংরেজী বিস্কুট খাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের আনন্দনাড়ু খান। দাঁত শক্ত হইবে। কেবল চালের গুড়া ও গুড়া যন্ত্রদ্বারা স্পর্শিত নহে। বাঙালী মেয়ের নিজ হাতে গড়া। এক ঠোঙা পাঁচ শিলিং। সর্বত্র পাওয়া যায়। নির্মিতা—রসময় দাস, টিকিটিকি বাজার, কলিকাতা।

অম্বরীষী বরুণ। মেমগণের দৃষ্ট এইবার দূর হইল। এই আশ্চর্য গুড়া মুখে মাখিলে ফ্যাকাশে রং দূর হইয়া ঠিক বাঙালী মেয়ের মতন রং হইবে। যদি আর

একটু বেশী ঘোর করিতে চান, তবে ইহার সঙ্গে একটু বৈদগ্ধীন মিশাইয়া লইবেন। রামচন্দ্রজী উহা মাখিতেন। দাম প্রতি পুরিয়া পাঁচ শিলিং। বিক্রেতা—শেখ অজহর লেডেনহল স্ট্রীট, ইন্ডিয়া হাউস, লন্ডন।

‘দি লন্ডন ফগ’ হইতে উদ্ধৃত

আগামী আশ্বিন মাসে এই লন্ডন নগরে বিরাট রাজসূয় যজ্ঞ বাসবে। স্বয়ং মহা-কৃষ্ণপ ভারতসরকারের প্রতিনিধিরূপে এই যজ্ঞের যজমান হইবেন। হোতা, ঋত্বিক মোল্লা, মণ্ডলানা প্রভৃতি ভারত হইতে আসিবেন। দুই মাস ব্যাপিয়া দীর্ঘতাৎ ভূজ্যাত্যাং চলিবে, খরচ জোগাইবে অবশ্য এই গরীব ইওরোপবাসী।

সমস্ত ইওরোপের শোষণকার্য অবিরাম গতিতে চলিতেছে, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি নাই। ভারতমাতা তাহার খরজহুনা লকলক করিয়া বলিতেছেন—হে সপত্নীপুত্রগণ, জানন্দ কর, আর একবার ভাল করিয়া তোমাদের হাড় চাটব।

ঠিক ঐ সময়েই হাগ-নগরে প্যান-ইওরোপিয়ান লিবার্টি-লীগের অধিবেশন হইবে। হে ব্রিটন, জন-অ-গ্রেটস হইতে ল্যান্ডস-এন্ড পর্যন্ত যে যেখানে আছে, দলে দলে সর্বরাষ্ট্রীয় মহাসম্মেলনে যোগ দাও। যদি তোমার বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান থাকে তবে রাজসূয় যজ্ঞের ত্রিসীমায় যাইও না। একবার ভাবিয়া দেখ তোমার এই মেরি ইংল্যান্ড—যেখানে একদা দুঃখ ও মধুর স্রোত বহিত—তাহার কি দশা হইয়াছে। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বাঁফ নাই, মাখন নাই, পনির নাই—এইবার বিয়ারও বন্ধ হইবে। বিদেশ হইতে গম আসে তবে তোমার রুটি প্রস্তুত হয়। তোমার ভেড়ার লোম ছাঁটামাত্রই পজাবে যাইতেছে এবং তথা হইতে বনাত কম্বলরূপে ফিরিয়া আসিয়া তোমার অঙ্গে উঠিতেছে। ভারতের কাপাসবস্ত্র তোমার বিখ্যাত লিনেন শিল্প নষ্ট করিয়ছে। ছায়, তুমি কাহার বসন পরিয়াছ? তোমার নশনতা ঘুচিয়াছে কিন্তু লজ্জা ঢাকে নাই, শীত নিবারণিত হইয়াছে কিন্তু তুমি অন্তরে অন্তরে কাঁপিতেছে। তোমার ভাল ভাল গো-বংশ ভারতে নিবাসিত হইয়াছে, সেখানকার হিন্দু-মুসলমান ক্ষীর-ছানা ঘি খাইয়া নিঃস্বপ্নে মোটা হইতেছে। বিয়ার হুইস্কির আশ্বাদ তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, ভারতের গাঁজা আফিম তোমার মস্তিষ্কে শর্নে শর্নে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তোমার সর্বনাশের উপরে ভারত তাহার ভোগবিলাসের বিরাট মন্দির খাড়া করিয়াছে। তুমি ডিসেম্বরের শীতে পর্যাপ্ত কয়লার অভাবে হিঁহি করিয়া শিহরিতেছ, ওদিকে তোমারই অর্থে শেভিয়ার্ট হিলে লক্ষ লক্ষ টন কয়লা পুড়াইয়া কৃত্রিম আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করা হইয়াছে; কারণ, ভারতীয় আমলাগণ শীতকালে সেখানে অঁপিস করিবেন—লন্ডনের শীত তাহাদের বরদাস্ত হয় না।

হে বহুধাবিভক্ত আত্মকলহপরায়ণ ইওরোপীয়গণ, এখনও কি তোমরা তুচ্ছ সাম্প্র-দায়িক স্বার্থ ত্যাগ করিবে না? এখনও কি অ্যাংলো-সেল্টিক স্প্ল, জাংকো-জার্মান স্প্ল, ধনিক-শ্রমিকের স্প্ল, স্ত্রী-পুরুষের স্প্ল বন্ধ হইবে না?

হাইড পাক। বজা—সার ট্রিক্সি টানকোট।

শ্রোতা—তিন চার হাজার লোক।

টানকোট। মাই কান্ট্রিমেন, তোমরা আজ আমাকে যে দু-চার কথা বলবার সুযোগ দিয়াছ তার জন্য বহু ধন্যবাদ। তোমাদের কি বলে সম্বোধন করব খুঁজে পাচ্ছি না,

কারণ আমার হৃদয় পূর্ণ হয়েছে। হে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠদেশবাসী ভগবানের নির্বাচিত মানবগণ, হে ব্রিটন-স্যাকসন-ডেন-নর্মান বংশোদ্ভব ইংরেজ জাতি—।

ম্যাকডুডল। ইংরেজ নয়, বলুন ব্রিটিশ জাতি। স্কটরা কি ভেসে এসেছে নাকি?

টান্‌কোট। আচ্ছা, আচ্ছা। হে ব্রিটিশ জাতি, একবার তোমাদের সেই প্রাচীন ইতিহাস স্মরণ কর। হে হেস্টিংস-ক্রেসি-এজিনকোর্টের বীরগণ, যাদের বিজয়পতাকা একদিন ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স—

ম্যাকডুডল। মিথ্যে কথা। স্কটল্যান্ডে তোমাদের বিজয়পতাকা কোনও কালে ওড়ে নি।

টান্‌কোট। আচ্ছা, আচ্ছা, স্কটল্যান্ড বাদ দিলুম। যাদের বিজয়পতাকা একদিন আয়ারল্যান্ড ফ্রান্স—

ও'হুলিগান। Oireland ! Say it again !

টান্‌কোট। আচ্ছা, আচ্ছা। বিজয়পতাকা কোথাও ওড়ে নি। হে ইংলিশ-স্কট-আইরিশ-মিশ্রিত-ব্রিটিশ জাতি—

ও'হুলিগান। Begorrah ! আমরা ব্রিটিশ নই—সেলটিক।

টান্‌কোট। আচ্ছা, আচ্ছা। হে ব্রিটিশ ও সেলটিক ভাইসকল আজ তোমরা কেন সমবেত হয়েছ?

ও'হুলিগান। Sure, Oi don't know।

টান্‌কোট। কেন এখানে সমবেত হয়েছ তাও কি বলে দিতে হবে? হে হতভাগ্যগণ, তোমাদের এই পৈতৃক দেশের বৃকের ওপর কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে তার খবর রাখ? রাজসূয় যজ্ঞ। ভারতসরকার মহা আড়ম্বর করে তাঁর ক্রৈবর্য এবং পরাক্রমের পসরা খুলে বসবেন, আর সমস্ত ইওরোপের গণ্যমান্য ব্যক্তি এসে মহাক্ষতপকে কুর্নিশ করে বলাবেন—ভারতসরকার কি জয়! এই আউট্‌ল্যান্ডিশ কান্ড এই স্যাট্রিজ—

(লর্ড রান্নির বেগে প্রবেশ)

লর্ড রান্নি জনান্তিকে। আরে তুমি কি বলছ সার ট্রিক্সিস! নিজের সর্বনাশ করছ? আমি কত করে ক্ষতপকে বলে-ক'য়ে এসেছি যেন Children Hundreds-এর দেওয়ানিটা তোমাকেই দেওয়া হয়। কি আরামের চাকরি, একেবারে sine cure। ক্ষতপের ইচ্ছে চাকরিটা টোডিকে দেন, কিন্তু আমার একান্ত মিনতি শূন্য বলেছেন বিবেচনা করে দেখবেন। এখনই খবর আসবে, আর এদিকে তুমি রাজদ্রোহ প্রচার করছ!

টান্‌কোট। বটে বটে? আচ্ছা, আমি সামলে নিচ্ছি।

জনতা হইতে। Go on Tricksy, go on।

টান্‌কোট। হ্যাঁ, তার পর কি বলছিলুম—হে আমার দেশবাসীগণ, এই ঘোর দুর্দিনে তোমাদের কর্তব্য কি? তোমরা কি এই যজ্ঞে এই বিরাত ত্যাগায় যোগ দেবে?

জনতা হইতে। Never, never।

বিল স্নুক্স। Say gov'nor will they stand treat? মদক পিপে আসবে?

টান্'কোট। এক ফোঁটাও নয়। কেবল বাতাসা বিলি হবে। হে বন্ধুগণ, এই মহাযজ্ঞে তোমাদের স্থান কোথায়?

লর্ড রান্নি। আঃ, কি বলছ টান্'কোট!

টান্'কোট। ঘাবড়ান কেন, শুনুন না। হে বন্ধুগণ, এই বিরাট যজ্ঞে কি তোমরা যাবে?

জনতা হইতে। বরং শয়তানের কাছে যাব।

টান্'কোট। না, না, সেটা ভালো দেখাবে না। তোমাদের যেতেই হবে—না গিয়ে উপায় নেই, কারণ ভারতসরকার স্বয়ং তোমাদের আহ্বান করেছেন।

লর্ড রান্নি। হিয়ার, হিয়ার।

জনতা হইতে। মিয়াও, মিয়াও।

টান্'কোট। দোহাই তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। মনে রেখো ভারতের সহানুভূতি না পেলে আমাদের গতি নেই—আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সরকারের দয়ার উপর—(পচা ডিম)—এঃ, চোখটা খুব বেঁচে গেছে। হে বন্ধুগণ, আমি কত ব্যাপালনে ভয় খাই না, যা সত্য বলে বিশ্বাস করি তাই অকপটে বলব।

লর্ড রান্নি। বাঃ, ঠিক হচ্ছে। ঐ যে টেলিগ্রাম নিয়ে আসছে। ব্রেভো সার ট্রিক্সি, নিশ্চয় ক্ষরপ তোমাকেই মনোনীত করেছেন। আমি পড়ে দেখছি, তুমি থেমে না, বক্তৃতা চলুক।

টান্'কোট। হে ভাই-সকল, আমি যা বলছি তা তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য। এতে আমার নিজের কোনও স্বার্থ নেই।—রান্নি, খবর কি হে?—হে প্রিয় বন্ধুগণ, দেশের মঙ্গলের জন্য আমি সকল রকম লাজনা ভোগ করতে প্রস্তুত। তোমাদের ঐ বেরালডাক আমারই জয়ধ্বনি। তোমাদের এই পচা ডিম আমি মাখা পেতে নিলুম। যদি তোমাদের তুণীরে আরও কিছু নিগ্রহের অস্ত্র থাকে—(বাধকপি)—নাঃ, আর পার যায় না। রান্নি বল না হে, কি লিখেছে?

রান্নি। পড়ের ট্রিক্সি! শেষটার টোডি ব্যাটাই চাকরি পেলে। নেভার মাইন্ড, তুমি হতাশ হয়ে না। আবার একটা সুবিধা পেলেই তোমার জন্য চেষ্টা করব। ক্ষরপটা অতি গাম্ভীর্য। এটা বুঝলে না যে টোডি তো পোষ মেনেই আছে। আর তুমি হ'লে এত বড় একটা ডিমাগগ—তোমাকে হাত করবার এমন সুযোগটা ছেড়ে দিলে! ছি ছি!

টান্'কোট। ড্যাম টোডি ড্যান্ড ড্যাম ক্ষরপ। হে আমার স্বদেশবাসীগণ—

জনতা হইতে। Shut up! kick him—lynch the traitor!

টান্'কোট। না, না, আগে আমাকে বলতেই দাও। এই রাজসূয় যজ্ঞে তোমাদের যেতেই হবে। কেন যেতে হবে? বাতাসা খেতে? সেলাম করতে? ভারতসরকারের জয়জয়কার করতে? নেভার। সেখানে যাবে যজ্ঞ পণ্ড করতে, লণ্ডভণ্ড করতে—ভারতসরকার যেন বুঝতে পারে যে তোমাশা দেখিয়ে আর বাতাসা খাইয়ে তোমাদের আর ভুলিয়ে রাখা যাবে না।

জনতা হইতে। Long live Tricksy! Turncoat for ever!

নারীজাতির মূখপত্র 'দি শিমান' হইতে উদ্ধৃত।

কাল বৈকালে ঠিক তিনটার সময় নিখিল-ব্রিটিশ-নারী-বাহিনীর শোভাযাত্রা বাহির হইবে। রিজেন্ট পার্ক হইতে আরম্ভ করিয়া পোর্টল্যান্ড স্ট্রেস, রিজেন্ট স্ট্রীট,

পিকার্ডিল সার্কাস, ট্রাফালগার স্কোয়ার হইয়া এই বিরাট প্রসেশন পার্লামেন্ট হাউসে পৌঁছাবে।

হাজার হাজার বৎসর হইতে পুরুষজাতি নারীর উপর কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছে, কিন্তু আর তাহাদের চালাকি চলিবে না। আমরা সবলে নিজের প্রাপ্য আদায় করিয়া লইব। আমরা ভোটের অধিকার যাহা পাইয়াছি তাহা একেবারে তুয়া। জুয়াচোর পুরুষগণ ছলে বলে কৌশলে ভোট যোগাড় করিয়া রাষ্ট্রীয়-পরিষৎ প্রায় একচেটে করিয়াছে। এ ব্যবস্থা চলিবে না। ব্রিটেনের লোকসংখ্যার শতকরা ষাটজন নারী। আমরা এই অনুপাতেই নারীসদস্য চাই। সরকারী চাকরিতেও আমরা শতকরা ষাটজন নারী চাই। পুরুষের চেয়ে কিসে আমরা কম? আমরা ডিভাইডেড স্কার্ট পরি, ঘাড় ছাঁটি, সিগারেট খাই, ককটেল টানি। এর পর দরকার হয় তো মূখে কবিরাজি কেশ-তৈল মাখিয়া গোফ-দাড়ি গজাইব। পুরুষের সহিত কোনও কারবার রাখিব না, কারণ ওরূপ কুটিল স্বার্থপর জাতি পৃথিবীতে আর নাই। তারা মনে করে এই জগতটা পুরুষের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। তাদের ভগবান পর্যন্ত পুংলিঙ্গ। আমরা হি-গড মানিব না। আইসিস, ডায়না, কালী অথবা শূর্ণগথা—এদের ম্বারাই আমাদের কাজ চলিবে।

হে নারী, তুমি আর অবলা সরলা niminy piminy গৃহিণী নহ। তুমি দাঁত নখ শ্যনাইয়া এস, ভয়ংকরী মূর্তিতে এই মহাবাহিনীতে যোগ দিয়া পার্লামেন্ট আক্রমণ কর। অকর্মণ্য পুরুষদের তাড়াইয়া দিয়া সরকারের নিকট হইতে আপন অধিকার আদায় করিয়া লও।

পুরুষজাতির মূখপাত্র 'দি মিয়ার ম্যান' হইতে উদ্ধৃত।

সরকার কি নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমাইতেছেন? কাল এই লন্ডন শহরের উপর যে পৈশাচিক কান্ড হইয়া গেল তাহাতে বোধ হয় যেন দেশে অরাজকতা উপস্থিত। দূর্বৃত্তা নারীগণ প্রকাশ্য দিবালোকে বিধম অত্যাচার করিয়াছে, দোকান-পাট ভাঙিয়া তছনছ করিয়াছে, নিরীহ পুরুষগণকে খামচাইয়া কামড়াইয়া জর্জরিত করিয়াছে, কিন্তু সরকারের পেরারের উড়িয়া-পুলিস তখন কি করিতেছিল? তারা একগাল পান মূখে পুরিয়া দন্ত বিকাশ করিয়া হাসিতেছিল এবং নারীগণকে অধিকতর ক্ষিপ্ত করিবার জন্য হাততালি দিয়া বলিতেছিল—‘হী-হ-হ-হ-হ-’। খাসাহেব গবসন টৌড সার ট্রিকসি টানকোট প্রভৃতি মাননীয় দেশনেতৃগণ দাঙ্গানিবারণের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, কিন্তু উড়িয়া সার্জেন্টরা তাঁদের অপমান করিয়া, বলিয়াছে—‘এ সাহেবও, ওপক্ষে যিব তো ডান্ডা খিব।’

সরকার নিশ্চয় এই ব্যাপারে মনে মনে খুশী হইয়াছেন, কারণ দেশে আশ্বকলহ যত হয় ততই সরকারের বলিবার ছুতা হয় যে আমরা স্বায়ত্তশাসনের অযোগ্য।

‘রান্ডারিং’ হইতে উদ্ধৃত।

ইংরেজগণের মধ্যে যদি কেহ বুদ্ধিমান থাকেন তবে এইবার বুঝিবেন যে তাহাদের স্বাধীনতার আশা সুদূরপরাহত। লিবার্টি লীগ, অ্যাংলো-সেস্টিক ইউনিয়ন, হেটেরো-সেক্সুয়াল প্যাক্ট—এ সব শুনিতে বেশ। কিন্তু এই ঠান্ডা দেশের রক্ত যখন শ্বেব-হিমায় গরম হইয়া উঠে তখন আর তত্ত্বাধায় চলে না। যখন দাঙ্গা বাধে তখন একমাত্র ভরসা ভারতসরকারের দণ্ডনীতি এবং দুর্দান্ত উড়িয়া-পুলিস।

কেবলই শুনতে পাই—স্বায়ত্তশাসনে ব্রিটিশ জাতির জন্মগত অধিকার। কিন্তু ১৫ ব্রিটন, তোমাদের ইতিহাস কি সাক্ষ্য দেয়? স্বাধীনতা কাকে বলে তোমরা কখনই জানিতে না। প্রথমে রোমানগণের, তারপর অ্যাংগল, স্যাক্সন, ডেন, নরম্যান প্রভৃতি দস্যুজাতির অধীনতায় তোমাদের দিন কাটিয়াছে। বাহারা বিজেতারূপে তোমাদের দেশে আসিয়াছে, পরে তাহারাই আবার অন্য জাতি কর্তৃক বিজিত হইয়াছে। আজ কে বিজেতা কে বিজিত বৃদ্ধিবার উপায় নাই—তোমরা কেহই নিজের স্বাভাবিক রক্ষা করিতে পার নাই। তোমাদের জাতির স্থিরতা নাই, দেশ নিজের নয়, ধর্ম পর্যন্ত নিজের নয়। একতা তোমাদের মধ্যে কোন কালেই নাই। সামাজিক আর্থিক কতরকম দলদলি তোমাদের আছে তার ইয়ত্তা নাই। ক্ষুদ্র ব্রিটেনের যখন এই অবস্থা, তখন সমস্ত ইওরোপের কথা না তোলাই ভাল! নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্ম ইওরোপকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। একমাত্র ভারতসরকারের শাসনেই এই মহাদেশ ঠাণ্ডা হইয়াছে। তোমরা আগে একটু সভা হও, তার পর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিও। তোমরা মদে ও জুয়ায় ডুবিয়া আছ, বর্বরের মত তোমরা এখনও নাচিয়া থাক। স্নান করিতে ভয় খাও, আহারের পর কুলকুচা কর না। এখন কিছুকাল শান্ত শিশু হইয়া সর্ববিষয়ে ভারতের অনুগত হইয়া চল, তার পর যথাসময়ে তোমাদের অধিকার দেওয়া-না-দেওয়া সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে।

ভোমস্টাট প্রাসাদ। প্রিন্স ভোম, ঠানক পথটক ল্যাং প্যাং

এবং প্রিন্সের খানসামা কোবল্ট।

প্রিন্স ভোম। আচ্ছা হের প্যাং, আপনি তো নানা দেশ বেড়িয়েছেন—আমাদের এই রাজ্যটা আপনার কেমন লাগছে?

ল্যাং প্যাং। মন্দ নয়। মাঠ আছে, জল আছে, রুটি আছে, ঘাস আছে, শূওর ভেড়া আছে। কিন্তু দেশের লোক যেন সব ঝিমিয়ে রয়েছে। কেন বলুন তো?

প্রিন্স। ঐ তো মজা। সমস্ত ইওরোপে যে অসন্তোষ আর চাঞ্চল্য দেখেছেন, এখানে তার কিছুই পাবেন না। ভারতসরকার বলেন—আমাদের খাস রাজ্যে আমরা ইচ্ছামত প্রজাদের একটু আশকারা দেব, আবার রাশ টেনে ধরব। কিন্তু তুমি নাবালক, গুরুত্ব করতে যেও না, মারা যাবে। তোমার রাজ্যে গোলযোগ দেখলেই তোমার কান ধরে বার করে দেব। তাই রাজ্যসুন্দর মোতামতের ব্যবস্থা করে দিয়েছি—সব ভোম হয়ে আছে। কোবল্ট, এক গুলি দে বাবা, তিনটে বাজে, হাই উঠছে। আহা, কি জিনিসই আপনাদের পূর্বপুরুষেরা আবিষ্কার করেছিলেন হের প্যাং!

ল্যাং প্যাং। কিন্তু এখন আর আমাদের দেশে জন্মায় না। যা খাচ্ছেন তা ভাঙতের, আপনাদের জন্যই উৎপন্ন হয়।

(প্রিন্সের মন্ত্রী ব্যারন ফন বিবলারের প্রবেশ)

বিবলার। মহারাজ, ইংল্যান্ড থেকে সার ট্রিক্সি টান্‌কোট দেখা করতে এসেছেন।

প্রিন্স। আঃ জ্বালালে। একটু যে শূয়ে শূয়ে আরাম করব তার জো নেই। মিয়ে এস ডেকে। বাবা কোবল্ট, আমার বাঁ পাশে ফিরিয়ে দে তো।

ল্যাং প্যাং। আমি তা হ'লে এখন উঠি—

প্রিন্স। না, না, বসুন। আমি ভারতীয় কায়দায় লোকজনের সঙ্গে মোলাকাত

করি, একে একে অডিয়েন্স দেওয়া আমার পোষায় না, একসঙ্গেই পাঁচ-সাত জনের দরবার শুন। তাতে মেহনত কম হয়, গম্প-গুজবও ভাল জমে।

(টান্‌কোটের প্রবেশ)

প্রিন্স। হা-ডু-ডু সার ট্রিক্সি?—বসুন ঐ চেয়ারটায়। তার পর খবর কি বলুন।  
টান্‌কোট। প্রিন্স, আপনাকে হাগ যেতে হবে, প্যান ইওরোপিয়ান লিবার্টি-  
লীগের সভাপতিরূপে।

প্রিন্স। মাইন গট! এ বলে কি? কোবস্ট, আর এক গুলি দে বাবা।

টান্‌কোট। আচ্ছা সভাপতি হ'তে আপতি থাকে, না হয় অর্মানই যাবেন। না  
গেলে আমরা ছাড়ছি না।

প্রিন্স। হাগ যাব? খেপেছেন নাকি?

টান্‌কোট। কেন, তাতে বাধা কি? এই তো ভাইকাউন্ট প্যাফ, কাউন্টস  
প্রিমালকিন, গ্রান্ডডিউক প্যাজানড্রাম—এরা সব যাবেন।

প্রিন্স। আরে তাদের সঙ্গে আমার তুলনা! তারা হ'ল নগণ্য ভারতীয় প্রজা,  
ইচ্ছা করলে জাহান্নমে যেতে পারে। আর আমি হলুম একজন স্বাধীন সামন্ত নরপতি,  
যাব বললেই কি যাওয়া যায়? যদি মহাক্ষত্রপের হুকুম নিতে যাই তো বলবেন—  
ব্যটা একুনি রাজ্য ছেড়ে বনবাসে যাও।

টান্‌কোট। তবে কথা দিন রাজসূয় যজ্ঞেও যাবেন না।

প্রিন্স। গট ইন হিস্ট্রল! আপনার দেখাছি মাথা বিগড়ে গেছে। রাজসূয় যজ্ঞে  
যাবার জন্যে ছ-মাস ধরে আয়োজন করছি, কোটিখানেক টাকা খরচ হবে—আর আপনা-  
দের আবদার শুনে সব এখন ভেসে দিই! হাঁ—ভাল কথা—ব্যারন, জগবম্প সব  
কটা ঠিক আছে তো? সতরটা গুনে দেখেছ?

বিবলার। আজ্ঞে হাঁ। আমি সব-কটা রন্দুরে দিয়ে টনটনে ক'রে রেখেছি।

প্রিন্স। ঠিক সতরটা?

বিবলার। ঠিক সতর।

ল্যাং প্যাং। জগবম্প কি হবে প্রিন্স?

প্রিন্স। বাজবে। যখন আমি যাত্রা করব, সঙ্গে সঙ্গে সতরটা জগবম্পই বাজবে।

প্রিন্স ড্রুংকেনডফের মোটে তেরটা। আমার সতর।

ল্যাং প্যাং। আপনার অভাব কি, আপনি মনে করলে তো সতরের জয়গায়  
সাত-শ জগবম্প, জয়ঢাক, চড়বড়ে, কাঁসি, ভেঁপু, রামাশঙে যা খাশি বাজাতে পারেন।

প্রিন্স। হেঁ হেঁ, জগবম্প হ'লেই হয় না। সরকার যে-কটি বরাদ্দ ক'রে দিয়ে-  
ছেন ঠিক সেই কটি বাজানো চাই। বেশী যদি বাজাই তবে বিলকুল বাতিল হবে।  
বাবা কোবস্ট, আমার নাকের ডগায় একটু সুড়সুড়ি দিয়ে দে তো।

টান্‌কোট। তা হ'লে আপনি আমার কোনও অনুরোধই রাখেন না?

প্রিন্স। অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু আপনাদের উদ্যমে আমার সম্পূর্ণ সহানু-  
ভূতি আছে জানবেন। ব্যারন বিবলার, আপনি একটু ও-ঘরে যান তো। হ্যাঁ—দেখুন  
সার ট্রিক্সি, আপনাদের সঙ্গে দেশ উদ্ধার করতে গিয়ে আমার এই পৈতৃক রাজ্য  
আর পৈতৃক প্রাণটি খোয়াতে পারব না। তবে যদি বোঁচে থাকি, আর আপনাদের  
কার্যসিদ্ধি হয়, আর ইওরোপের জন্য একজন জবরদস্ত এম্পারার কি কাইজার কি  
ডিকটেটার দরকার হয়, তখন আমার কাছে আসবেন। ঐ কাজটা আমাদের বংশগত

কিনা, বেশ সড়গড় আছে। তার পর সার ট্রিক্সি, একগুঁল খেয়ে দেখবেন নাকি? মাথা ঠান্ডা হবে। অভ্যাস নেই? আচ্ছা, তবে এক গ্লাস শ্যাম্প্‌ খান।

‘দি লন্ডন ফগ’ হইতে উদ্ধৃত

দুইমাসব্যাপী হরতালের মধ্যে রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। ইউরোপের জনসাধারণ এই অনুষ্ঠান বর্জন করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছে—অবশ্য জনকতক ধর্মো-ধরা ছাড়া। আমরা যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম না, সুতরাং আর কোনও খবর জানি না।

‘রাষ্ট্রবিৎ’ হইতে উদ্ধৃত

রাজসূয় যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। তথাকথিত দেশনায়কগণকে রম্ভা প্রদর্শন করিয়া ইউরোপের জনসাধারণ এই বিরাট উৎসবে যোগ দিয়া অশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছে।

যজ্ঞ উপলক্ষে বাঁহারা সরকারকে নানাপ্রকার সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সার ট্রিক্সি টান কোর্টের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুনিতোছি ব্রিটিশ মেঘবংশের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সরকার যে কমিশন বসাইয়াছেন, সার ট্রিক্সি তার প্রেসিডেন্টরূপে শীঘ্রই কামরূপ যাত্রা করিবেন।





**Downloaded  
From**

[/http://boirboi.blogspot.com](http://boirboi.blogspot.com)

*This Book Is Scanned By*



*ARKA- THE JOKER*

## দাঁড়াও পাঠকবর,জন্ম যদি তব এই বঙ্গে

এসেছে নতুন বছর,২০১১ সালের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছি আমরা। অনেক আশা নিয়ে অত্যন্ত সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে এই লাইব্রেরিটি গড়ে তোলার প্রয়াস,আজ বর্ষশেষের পরিক্রমায় বলতেই হবে যে লক্ষ্য অনেকাংশেই সফল। দেশে বিদেশে আজ শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাদেও সক্রিয়তাই আমাকে নিত্যনতুন বাধাবিঘ্ন পার হয়েও সাইটটিতে নতুন নতুন বই আপডেট করায় নিয়োজিত রেখেছে।

যারা এ্যাড ব্রাউজ করে আমাকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করছেন,তাদের প্রতি আবারো কৃতজ্ঞতা রইল। আবারও বলছি,যারা বাংলাদেশে থাকেন,তাদের এই কাজে অংশ নেওয়ার দরকার নেই। যারা প্রবাসী,তাদের কাছে অনুরোধ রইল আর একটু বেশী সময় ধরে ব্রাউজ করতে। সম্ভব হলে ভিন্ন আইপি থেকে ব্রাউজ করতে পারেন।

আপনাদের পছন্দের বইটি পেতে চাইলে চ্যাট বক্সে বা আমাকে সরাসরি মেইল করতে পারেন [ayan.00.84@gmail.com](mailto:ayan.00.84@gmail.com) এ। আমার শহরে বইয়ের প্রাপ্তি সাপেক্ষে আপনাদের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করব। আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে যারা এ সাইটের কথা জানেন না,তাদেরকে রেফার করতে পারেন। এছাড়া শীঘ্রই ফেসবুকে একটি পেজ খোলার চিন্তা করছি,যেখানে আপনারা সংযুক্ত থাকতে পারবেন।

মূলত এখনও পর্যন্ত ওয়েবে অপ্রাপ্য বইগুলিই এখানে দেওয়ার চিন্তা আছে,তাই কোন বই আপনি সাজেস্ট করার আগে বিভিন্ন ফোরাম ঘুরে দেখে নিন সেখানে বইটি আছে কিনা।

বর্তমানে মূলত ভারতীয় লেখকদের লেখাই প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে,পরবর্তীতে বাংলাদেশী লেখকদের লেখাও আনা হবে।

এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে লেখক,প্রকাশকদের কোনওভাবে ক্ষতি হোক তা আমরা চাই না,তাই কোন বই আপনার ভাল লাগলে তার হার্ডকপিটা বাজার থেকে কেনার চেষ্টা করুন,প্রিয়জনকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বই উপহার দিন। আর বেশী বেশী করে বাংলা বই পড়ুন। আপনাদের জীবন বইয়ের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠুক,এই কামনায় নতুন বছরের শুভেচ্ছা আরও একবার জানিয়ে শেষ করলাম।

মোবাইলঃ ৪৪০১৭৩৪৫৫৫৫৪১

৪৪০১৯২০৩৯৩৯০০